প্রেমের গল্প

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়



আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
ক লি কা তা - ৯

প্রকাশক : শ্রীঅশোককুমার সরকার
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৫, চিন্তামণি দাস লেন
কলিকাতা - ৯

মুদ্রক :
শ্রীননীমোহন সাহা
রূপশ্রী প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড
৯, এন্টনি বাগান লেন
কলিকাতা - ৯

বেঁধেছেন :
জি. রায় এন্ড কোং
২২, বুদ্ধু ওস্তাগর লেন
কলিকাতা - ৯

প্রচ্ছদপট অঙ্কন : শ্রীপূর্ণেন্দু পত্রী

ব্লক প্রস্তুতকারক ও মুদ্রণ : ইম্পিরিয়াল আর্ট কটেজ

প্রথম সংস্করণ : ভাদ্র, ১৩৬৬

মূল্য : চার টাকা

বে দে নী

শম্ভু বাজিকর এ মেলায় প্রতি বৎসর আসে। তাহার বসিবার স্থানটা মা-কঙ্কালীর এস্টেটের খাতায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মতো কায়েমী হইয়া গিয়াছে। লোকে বলে, বাজি; কিন্তু শম্ভু বলে, ভোজবাজি—'ছারকাছ'। ছোট তাঁবুটার প্রবেশপথের মাথার উপরেই কাপড়ে আঁকা একটা সাইনবোর্ডেও লেখা আছে 'ভোজবাজি—সার্কাস'। লেখাটার এক পাশে একটা বাঘের ছবি, অন্য পাশে একটা মানুষ, তাহার হাতে এক রক্তাক্ত তলোয়ার, অপর হাতে একটা ছিন্নমুণ্ড। প্রবেশমূল্য মাত্র দুই পয়সা। ভোজবাজি অর্থে 'গোলকধামের' খেলা। ভিতরে পট টাঙাইয়া কাপড়ের পর্দায় শম্ভু মোটা লেন্স লাগাইয়া দেয়, পল্লীবাসীরা বিমুগ্ধ বিস্ময়ে সেই লেন্সের মধ্য দিয়া দেখে 'আংরেজ লোকের যুদ্ধ', 'দিল্লীকা বাদশা', 'কাবুলকে পাহাড়', 'তাজবিবিকা কবর'। তারপর শম্ভু লোহার রিং লইয়া খেলা দেখায়, সর্বশেষে একটা পর্দা ঠেলিয়া দেখায় খাঁচায় বন্দী একটা চিতাবাঘ! বাঘটাকে বাহিরে আনিয়া তাহার উপরে শম্ভুর স্ত্রী রাধিকা বেদেনী চাপিয়া বসে, বাঘের সম্মুখের থাবা দুইটা ধরিয়া টানিয়া তুলিয়া আপন ঘাড়ের উপর চাপাইয়া মুখামুখি দাঁড়াইয়া বাঘটাকে চুমা খায়, সর্বশেষে বাঘটার মুখের ভিতর আপনার প্রকাণ্ড চুলের খোঁপাটা পুরিয়া দেয়, মনে হয় মাথাটাই বাঘের মুখের মধ্যে পুরিয়া দিল। সরল পল্লীবাসীরা স্তম্ভিত বিস্ময়ে নিশ্বাস রুদ্ধ করিয়া দেখিতে দেখিতে করতালি দিয়া উঠে। তাহার পরই খেলা শেষ হয়, দর্শকের দল বাহির হইয়া যায়। সর্বশেষ দর্শকটির সঙ্গে শম্ভুও বাহির হইয়া আসিয়া আবার তাঁবুর দুয়ারে জয়ঢাকটা পিটিতে থাকে—দুম দুম দুম। জয়ঢাকের সঙ্গে স্ত্রী রাধিকা বেদেনী একজোড়া প্রকাণ্ড করতাল বাজায়—ঝন-ঝন-ঝন।

মধ্যে মধ্যে শম্ভু হাঁকে, বাঘ! ওই বড়-বা-ঘ!

বেদেনী প্রশ্ন করে, বড় বাঘ কি করে?

—পক্ষীরাজ ঘোড়া হয়, মানুষের চুমা খায়, জ্যান্ত মানুষের মাথা মুখের মধ্যে পোরে, কিন্তু খায় না।

কথাগুলো শেষ করিয়াই সে ভিতরে গিয়া বাঘটাকে তীক্ষ্ণাগ্র অঙ্কুশ দিয়া খোঁচা মারে, সঙ্গে সঙ্গে বাঘটা বার বার গর্জন করিতে থাকে। তাঁবুর দুয়ারের সম্মুখে সমবেত জনতা ভীতিপূর্ণ কৌতূহল-কম্পিত বক্ষে তাঁবুর দিকে অগ্রসর হয়।

দুয়ারের পাশে দাঁড়াইয়া বেদেনী দুইটি করিয়া পয়সা লইয়া প্রবেশ করিতে দেয়।

এ ছাড়াও বেদিনীর নিজের খেলা আছে। তাহার আছে একটা ছাগল, দুইটা বাঁদর আর গোটাকতক সাপ। সকাল হইতেই সে আপনার ঝুলি ঝাঁপি লইয়া গ্রামে বাহির হয়, গৃহস্থের বাড়ি বাড়ি খেলা দেখাইয়া, গান গাহিয়া উপার্জন করিয়া আনে।

এবার শম্ভু কঙ্কালীর মেলায় আসিয়া ভীষণ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। কোথা হইতে আর একটি বাজির তাঁবু আসিয়া বসিয়া গিয়াছে। তাহার জন্য নির্দিষ্ট জায়গাটা অবশ্য খালিই পড়িয়া আছে, কিন্তু এ বাজির তাঁবুটা অনেক বড় এবং কায়দাকরণেও অনেক অভিনবত্ব আছে। বাহিরে দুইটা ঘোড়া, একটা গোরুর গাড়ির উপর একটা খাঁচা রহিয়াছে, নিশ্চয় উহাতে বাঘ আছে।

গোরুর গাড়ি তিনখানা নামাইয়া শম্ভু নূতন তাঁবুর দিকে মর্মান্তিক ঘৃণায় হিংস্র দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিল, তারপর আক্রোশভরা নিম্নকণ্ঠে বলিল, শালা!

তাহার মুখ ভীষণ হইয়া উঠিল। শম্ভুর সমগ্র আকৃতির মধ্যে একটা নিষ্ঠুর হিংস্র ছাপ যেন মাখানো আছে। ক্রূর নিষ্ঠুরতাপরিব্যঞ্জক একধারার উগ্র তামাটে রঙ আছে—শম্ভুর দেহবর্ণ সেই উগ্র তামাটে; আকৃতি দীর্ঘ, সর্বাঙ্গে একটা শ্রীহীন কঠোরতা, মুখে কপালের নীচেই একটা খাঁজ, সাপের মতো ছোট ছোট গোল চোখ, তাহার উপর সে দন্তুর, সম্মুখের দুইটা দাঁত যেন বাঁকা হিংস্র ভঙ্গিতে অহরহ বাহিরে জাগিয়া থাকে। হিংসায় ক্রোধে সে আরও ভয়াবহ হইয়া উঠিল।

রাধিকাও হিংসায় ক্রোধে ধারালো ছুরি যেমন আলোকের স্পর্শে চকমক করিয়া উঠে তেমনই ঝকমক্ করিয়া উঠিল; সে বলিল, দাঁড়া, বাঘের খাঁচায় দিব গোক্ষুরার ডেঁকা ছেড়্যা!

রাধিকার উত্তেজনার স্পর্শে শম্ভু আরও উত্তেজিত হইয়া উঠিল সে ক্রুদ্ধ

দীর্ঘ পদক্ষেপে অগ্রসর হইয়া নূতন তাঁবুটার ভিতর ঢুকিয়া বলিল, কে বেটে, মালিক কে বেটে?

কি চাই?—তাঁবুর ভিতরের আর একটা ঘরের পর্দা ঠেলিয়া বাহির হইয়া আসিল একটি জোয়ান পুরুষ, ছয় ফিটের অধিক লম্বা, শরীরের প্রতি অবয়বটি সবল এবং দৃঢ়, কিন্তু তবুও দেখিলে চোখ জুড়াইয়া যায়; লম্বা হালকা দেহ,—'তেজী ঘোড়ার' যেমন মনোরম লাবণ্য ঝকমক করে—লোকটির হালকা অথচ সবল দৃঢ় শরীরে তেমনই একটি লাবণ্য আছে। রঙ কালোই, নাকটি লম্বা টিকালো, চোখ সাধারণ, পাতলা ঠোঁট দুইটির উপর তুলি দিয়া আঁকা গোঁফের মতো একজোড়া গোঁফ সূচ্যগ্র করিয়া পাক দেওয়া, মাথায় বাবরি চুল, গলায় কারে ঝুলানো একটি সোনার ছোট চাকা তক্তি,—সে আসিয়া শম্ভুর সম্মুখে দাঁড়াইল। দুইজনেই দুইজনকে দেখিতেছিল।

কি চাই?—নূতন বাজিকর আবার প্রশ্ন করিল, কথার সঙ্গে সঙ্গে মদের গন্ধে শম্ভুর নাকের নীচে বায়ুস্তর ভুরভুর করিয়া উঠিল!

শম্ভু খপ করিয়া ডান হাত দিয়া তাহার বাঁ হাতটা চাপিয়া ধরিল, বলিল, এ জায়গা আমার। আমি আজ পাঁচ বৎসর এইখানে বসছি।

ছোকরাটিও খপ করিয়া আপন ডান হাতে শম্ভুর বাঁ হাত চাপিয়া ধরিল, মাতালের হাসি হাসিল, বলিল, সে হবে, আগে মদ টুক্‌চা—

শম্ভুর পিছনে জলতরঙ্গ বাদ্যযন্ত্রে দ্রুততম গতিতে যেন গৎ বাজিয়া উঠিল, বলিল, কটি বোতল আছে তুমার নাগর—মদ খাওয়াইবা?

ছোকরাটি শম্ভুর মুখ হইতে পিছনের দিকে চাহিয়া রাধিকাকে দেখিয়া বিস্ময়ে মোহে কথা হারাইয়া নির্বাক হইয়া গেল।—কালো সাপিনীর মতো ক্ষীণতনু দীর্ঘাঙ্গিনী বেদেনীর সর্বাঙ্গে যেন মাদকতা মাখা; তাহার ঘন কুঞ্চিত কালো চুলে, চুলের মাঝখানে সাদা সুতার মতো সিঁথিতে, তাহার ঈষৎ বঙ্কিম নাকে, টানা অর্ধনিমীলিত ভঙ্গির মদিরদৃষ্টি দুইটি চোখে, সুচালো চিবুকটিতে—সর্বাঙ্গে মাদকতা। সে যেন মদিরার সমুদ্রে স্নান করিয়া উঠিল; মাদকতা তাহার সর্বাঙ্গ বাহিয়া ঝরিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে। মহুয়া-ফুলের গন্ধ যেমন নিশ্বাসে ভরিয়া দেয় মাদকতা, বেদেনীর কালো রূপও তেমনই চোখে ধরাইয়া দেয় একটা নেশা। শুধু রাধিকারই নয়, এই বেদে জাতের মেয়েদের এটা একটা জাতিগত রূপবৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্য রাধিকার রূপের একটা প্রতীকের সৃষ্টি করিয়াছে; কিন্তু মোহময় মাদকতার মধ্যে আছে ক্ষুরের

মতো ধারের ইঙ্গিত, চারিদিকে হিংস্র তীক্ষ্ম উগ্রতার আভাস, মোহমত্ত পুরুষকেও থমকিয়া দাঁড়াইতে হয়, ভয়ের চেতনা জাগাইয়া তোলে, বুকে ধরিলে হৃৎপিণ্ড পর্যন্ত ছিন্নভিন্ন হইয়া যাইবে।

রাধিকার খিলখিল হাসি থামে নাই, সে নূতন বাজিকরের বিস্ময়বিহ্বল নীরব অবস্থা দেখিয়া আবার বলিল বাক হর‍্যা গেল যে নাগরের?

বাজিকর এবার হাসিয়া বলিল, বেদের বাচ্চা গো আমি। বেদের ঘরে মদের অভাব! এস।

কথা সত্য, এই জাতিটি মদ কখনও কিনিয়া খায় না। উহারা লুকাইয়া চোলাই করে, ধরাও পড়ে, জেলেও যায়; কিন্তু তা বলিয়া স্বভাব কখনও ছাড়ে না। শাসন-বিভাগের নিকট পর্যন্ত ইহাদের এই অপরাধটা অতি সাধারণ হিসাবে লঘু হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

শম্ভুর বুকখানা নিশ্বাসে ভরিয়া এতখানি হইয়া উঠিল। আহ্বানকারীও তাহার স্বজাতি, নতুবা—। সে রাধিকার দিকে ফিরিয়া কঠিন দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, তুই আইলি কেন এখেনে?

রাধিকা এবারও খিলখিল করিয়া হাসিয়া বলিল, মরণ তুমার! আমি মদ খাব নাই?

তাঁবুর ভিতরে ছোট একটা প্রকোষ্ঠের মধ্যে মদের আড্ডা বসিল। চারিদিকে পাখির মাংসের টুকরা টুকরা হাড়ের কুচি ও একরাশি মুড়ি ছড়াইয়া পড়িয়া আছে; একটা পাতায় এখনও খানিকটা মাংস, আর একটায় কতকগুলো মুড়ি পেঁয়াজ লঙ্কা, খানিকটা নুন, দুইটি খালি বোতল গড়াইতেছে, একটা বোতল অর্ধসমাপ্ত। বিস্রস্তবাসা একটি বেদের মেয়ে পাশেই নেশায় অচেতন হইয়া পড়িয়া আছে, মাথার চুল ধুলায় রুক্ষ, হাত দুইটি মাথার উপর দিয়া ঊর্ধ্ববাহুর ভঙ্গিতে মাটির উপর লুণ্ঠিত, মুখে তখনও মদের ফেনা বুদ্বুদের মতো লাগিয়া রহিয়াছে। হৃষ্টপুষ্ট শান্তশিষ্ট চেহারার মেয়েটি।

রাধিকা তাহাকে দেখিয়া আবার খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল. তোমার বেদেনী? ই যি কাটা কলাগাছের পারা পড়েছে গো!

নূতন বাজিকর হাসিল, তারপর সে স্খলিতপদে খানিকটা অগ্রসর হইয়া একটা স্থানের আলগা মাটি সরাইয়া দুইটা বোতল বাহির করিয়া আনিল।

মদ খাইতে খাইতে কথা যাহা বলিবার বলিতেছিল নূতন বাজিকর আর রাধিকা।

শম্ভু মত্ততার মধ্যেও গম্ভীর হইয়া বসিয়া ছিল। প্রথম পাত্র পান করিয়াই রাধিকা বলিল, কি নাম গো তুমার বাজিকর?

নূতন বাজিকর কাঁচা লঙ্কা খানিকটা দাঁতে কাটিয়া বলিল, নাম শুনলি গালি দিবা আমাকে বেদেনী।

কেনে?

নাম বটে কিষ্টো বেদে।

তা গালি দিব কেনে?

তুমার যে নাম রাধিকা বেদেনী, তাই বুলছি।

রাধিকা খিলখিল করিয়া হাসিয়া গড়াইয়া পড়িল, পরক্ষণেই সে আপনার কাপড়ের ভিতর হইতে ক্ষিপ্র হস্তে কি বাহির করিয়া নূতন বাজিকরের গায়ে ছুঁড়িয়া দিয়া বলিল, কই, কালিয়াদমন কর দেখি কিষ্টো, দেখি!

শম্ভু চঞ্চল হইয়া পড়িল; কিন্তু কিষ্টো বেদে ক্ষিপ্র হাতে আঘাত করিয়া সেটাকে মাটিতে ফেলিয়া দিল। একটা কালো কেউটের বাচ্চা! আহত সর্পশিশু হিস্-হিস্ গর্জনে মুহূর্তে ফণা তুলিয়া দংশনোদ্যত হইয়া উঠিল; শম্ভু চীৎকার করিয়া উঠিল, 'আ-কামা', অর্থাৎ বিষদাঁত এখনও ভাঙা হয় নাই। কিষ্টো কিন্তু ততক্ষণে তাহার মাথাটা বাঁ হাতে চাপিয়া ধরিয়া হাসিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। হাসিতে হাসিতে সে ডান হাতে ট্যাঁক হইতে ছোট একটা ছুরি বাহির করিয়া দাঁত দিয়া খুলিয়া ফেলিল; এবং সাপটার বিষদাঁত ও বিষের থলি দুই-ই কাটিয়া ফেলিয়া রাধিকার গায়ে আবার ছুঁড়িয়া দিল। রাধিকাও বাঁ হাতে সাপটাকে ধরিয়া ফেলিল; কিন্তু রাগে সে মুহূর্তপূর্বের ওই সাপটার মতোই ফুলিয়া উঠিল, বলিল, আমার সাপ তুমি কামাইলা কেনে?

কিষ্টো বলিল, তুমি যে বল্ল্যা গো দমন করতে।—বলিয়া সে এবার হা-হা করিয়া উঠিল।

রাধিকা মুহূর্তে আসন ছাড়িয়া উঠিয়া তাঁবু হইতে বাহির হইয়া গেল।

সন্ধ্যার পূর্বেই।

নূতন তাঁবুতে আজ হইতেই খেলা দেখানো হইবে, সেখানে খুব সমারোহ পড়িয়া গিয়াছে। বাহিরে মাচা বাঁধিয়া সেটার উপর বাজনা বাজিতে আরম্ভ করিয়াছে, একটা পেট্রোম্যাক্স আলো জ্বালিবার উদ্যোগ হইতেছে। রাধিকা আপনাদের ছোট তাঁবুটির বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহাদের খেলার তাঁবু

এখনও খাটানো হয় নাই। রাধিকার চোখ দুইটি হিংস্রভাবে যেন জ্বলিতেছিল।

শম্ভু নিকটেই একটা গাছতলায় নামাজ পড়িতেছিল, আরও একটু দূরে একটা গাছের পাশে নামাজ পড়িতেছে কেষ্টা। বিচিত্র জাত বেদেরা। জাতি জিজ্ঞাসা করিলে বলে, বেদে। তবে ধর্মে ইসলাম। আচারে পুরা হিন্দু, মনসা পূজা করে, মঙ্গলচণ্ডী-ষষ্ঠীর ব্রত করে, কালী-দুর্গাকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করে, নাম রাখে শম্ভু শিব কৃষ্ণ হরি, কালী দুর্গা রাধা লক্ষ্মী। হিন্দু পুরাণ-কথা ইহাদের কণ্ঠস্থ। এমনই আর একটি সম্প্রদায় পট দেখাইয়া হিন্দু-পুরাণ গান করে, তাহারা নিজেদের বলে—পটুয়া, বিপুল চিত্রকরের জাতি। বিবাহ-আদান-প্রদান সমগ্রভাবে ইসলাম-সম্প্রদায়ের সঙ্গে হয় না. নিজেদের এই বিশিষ্ট সম্প্রদায়ের মধ্যে আবদ্ধ। বিবাহ হয় মোল্লার নিকট ইসলামি পদ্ধতিতে, মরিলে পোড়ায় না, কবর দেয়। জীবিকায় বাজিকরেরা সাপ ধরে, সাপ নাচাইয়া গান করে, বাঁদর ছাগল লইয়া খেলা দেখায়। অতি সাহসী কেহ কেহ এমনই তাঁবু খাটাইয়া বাঘ লইয়া খেলা দেখায়, কিন্তু এই নূতন তাঁবুর মত সমারোহ করিয়া তাহাদের সম্প্রদায়ের কেহ কখনও খেলা দেখায় নাই। রাধিকার চোখ ফাটিয়া জল আসিতেছিল। তাহার মনশ্চক্ষে কেবল ভাসিয়া উঠিতেছিল উহাদের সবল তরুণ বাঘটির কথা। ইহারই মধ্যে লুকাইয়া সে বাঘটাকে কাঠের ফাঁক দিয়া দেখিয়া আসিয়াছে। সবল দৃঢ় ক্ষিপ্রতাব্যঞ্জক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, চকচকে চিকন লোম, মুখে হাসির মতো ভঙ্গি যেন অহরহই লাগিয়া আছে। আর তাহাদের বাঘটা স্থবির শিথিলদেহ, অতি কর্কশ, খসখসে লোমগুলো দেখিলে রাধিকার শরীর ঘিনঘিন করিয়া উঠে। কতবার যে শম্ভুকে বলিয়াছে একটা নূতন বাঘ কিনিবার জন্য, কিন্তু শম্ভুর কি যে মমতা ঐ বাঘটার প্রতি, তাহার হেতু সে কিছুতেই খুঁজিয়া পায় না।

নামাজ সারিয়া শম্ভু ফিরিয়া আসিতেই সে গভীর ঘৃণা ও বিরক্তির সহিত বলিয়া উঠিল, তুর ওই বুড়া বাঘের খেলা কেউ দেখতে আসবে নাই।

ক্রুদ্ধ শম্ভু বলিল তু জানছিস সব!

রাধিকা নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া কহিল, না জেনে না আমি! তু-ই জানছিস সব!

শম্ভু চুপ করিয়া রহিল, কিন্তু রাধিকা থামিল না, কয়েক মুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া সে বলিয়া উঠিল, ওরে মড়া, বুড়ার নাচন দেখতে কার কবে ভাল লাগে বে! আমারে বলে তুই জানিস সব!

শম্ভু মুহূর্তে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল, পরিপূর্ণভাবে তাহার হিংস্র দুই পাটি দাঁত ওই বাঘের মতো ভঙ্গিতেই বাহির করিয়া সে বলিল, ছোকরার উপর বড় যে টান দেখি তুর!

রাধিকা সর্পিনীর মতো গর্জন করিয়া উঠিল, কি বুললি বেইমান?

শম্ভু আর কোন কথা বলিল না, অঙ্কুশভীত বাঘের মতো ভঙ্গিতেই সেখান হইতে চলিয়া গেল।

ক্রোধে অভিমানে রাধিকার চোখ ফাটিয়া জল আসিল। বেইমান তাহাকে এতবড় কথাটা বলিয়া গেল? সব ভুলিয়া গিয়াছে সে? নিজের বয়সটাও তাহার মনে নাই? চল্লিশ বৎসরের পুরুষ, তুই তো বুড়া! রাধিকার বয়সের তুলনায় তুই বুড়া ছাড়া আর কি? রাধিকা এই সবে বাইশে পা দিয়াছে। সে কি দায়ে পড়িয়া শম্ভুকে বরণ করিয়াছে? রাধিকা তাড়াতাড়ি আপনাদের তাঁবুর ভিতর ঢুকিয়া গেল।

সত্য কথা। সে আজ পাঁচ বৎসর আগের ঘটনা। রাধিকার বয়স তখন সতেরো! তাহারও তিন বৎসর পূর্বে শিবপদ বেদের সহিত তাহার বিবাহ হইয়াছিল। শিবপদ ছিল রাধিকার চেয়ে বৎসর তিনেকের বড়। আজও তাহার কথা মনে করিয়া বাধিকার দুঃখ হয়। শান্ত প্রকৃতির মানুষ, কোমল মুখশ্রী, বড় বড় চোখ। সে চোখের দৃষ্টি যেন মায়াবীর দৃষ্টি। সাপ, বাঁদর, ছাগল এসবে তাহার আসক্তি ছিল না। সে করিত বেতের কাজ,—ধামা বুনিত, চেয়ার-পালির কাজ করিত, ফুলের শৌখিন সাজি তৈয়ার করিত, তাহাতে তাহার উপার্জন ছিল গ্রামের সকলের চেয়ে বেশি। তাহারা স্বামী-স্ত্রীতে বাহির হইত; সে কাঁধে ভার বহিয়া লইয়া যাইত তাহার বেতের জিনিস, রাধিকা লইয়া যাইত তাহার সাপের ঝাঁপি, বাঁদর, ছাগল। শিবপদর সঙ্গে আরও একটি যন্ত্র থাকিত, তাহার কোমরে গোঁজা থাকিত বাঁশের বাঁশী। রাধিকা যখন সাপ নাচাইয়া গান গাহিত, শিবপদ রাধিকার স্বরের সহিত মিলাইয়া বাঁশী বাজাইত।

ইহা ছাড়াও শিবপদর আর একটা কতবড় গুণ ছিল। তাহাদের সামাজিক মজলিসে বৃদ্ধদের আসরেও তাহার ডাক পড়িত। অতি ধীর প্রকৃতির লোক শিবপদ, এবং লেখাপড়াও কিছু কিছু নিজের চেষ্টায় সে শিখিয়াছিল, এইজন্য তাহার পরামর্শ প্রবীণেরাও গ্রহণ করিত। গ্রামের মধ্যে সম্মান কত তাহার! আর সেই শিবপদ ছিল রাধিকার ক্রীতদাসের মতো। টাকাকড়ি সব থাকিত

রাধিকার কাছে! তাঁতে বোনা কালো রঙের জমির উপর সাদা সুতার ঘন ঘন ঘরকাটা শাড়ি পরিতে রাধিকা খুব ভালবাসিত, শিবপদ বারো মাস সেই কাপড়ই তাহাকে পরাইয়াছে।

এই সময় কোথা হইতে দশ বৎসর নিরুদ্দেশ থাকার পর আসিল এই শম্ভু, সঙ্গে এই বাঘটা, একটা ছেঁড়া তাঁবু, আর এক বিগতযৌবনা বেদেনী। বাঘ ও তাঁবু দেখিয়া সকলের তাক লাগিয়া গেল। রাধিকা প্রথম যেদিন শম্ভুকে দেখিল, সেদিনের কথা তাহার আজও মনে আছে। সে এই উগ্র পিঙ্গলবর্ণ, উদ্ধতদৃষ্টি, কঠোর বলিষ্ঠদেহ মানুষটিকে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া গিয়াছিল।

শম্ভুও তাহাকে দেখিতেছিল মুগ্ধ বিস্ময়ের সহিত. সে-ই প্রথম ডাকিয়া বলিল, এ-ই বেদেনী. দেখি তুর সাপ কেমন!

রাধিকার কি যে হইয়াছিল, সে ফিক করিয়া হাসিয়া বলিয়াছিল, শখ দেখি যে খুব! পয়সা দিবা?

বেশ মনে আছে, শম্ভু বলিয়াছিল. পয়সা দিব না; তু সাপ দেখালে আমি বাঘ দেখাব।

বাঘ! রাধিকা বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল। কে লোকটা? যেমন অদ্ভুত চেহারা, তেমনই কি অদ্ভুত কথা; বলে—বাঘ দেখাইবে। সে তাহার মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিয়াছিল, সত্যি বুলছ?

বেশ, দেখ, আগে আমার বাঘ দেখ! সে তাহাকে তাঁবুর ভিতর লইয়া গিয়া সত্যই বাঘ দেখাইয়াছিল। সবিস্ময়ে তাহাকে প্রশ্ন করিয়াছিল, হ, বাঘ নিয়া তুমি কি কর?

লড়াই করি, খেলা দেখাই।

হাঁ?

হাঁ, দেখবি তু?—বলিয়া সঙ্গে সঙ্গেই সে খাঁচা খুলিয়া বাঘটাকে বাহির করিয়া তাহার সামনের দুই থাবা দুই হাতে ধরিয়া বাঘের সহিত মুখোমুখি দাঁড়াইয়াছিল। বেশ মনে আছে, রাধিকা বিস্ময়ে হতবাক হইয়া গিয়াছিল। শম্ভু বাঘটাকে খাঁচায় ভরিয়া রাধিকার সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিয়াছিল, তু এইবার সাপ দেখা আমাকে।

রাধিকা সে কথার উত্তর দেয় নাই, বলিয়াছিল, উটা তুমার পোষ মেনেছে?

হি-হি করিয়া হাসিয়া শম্ভু সবলে তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিয়াছিল,

হি. বাঘিনী পোষ মানাতেই আমি ওস্তাদ আছি।

কি যে হইয়াছিল রাধিকার, এক বিন্দু আপত্তি পর্যন্ত করে নাই। দিনকয়েক পরেই সে শিবপদর সমস্ত সঞ্চিত অর্থ লইয়া শম্ভুর তাঁবুতে আসিয়া উঠিয়াছিল। চোখের জলে শিবপদর বুক ভাসিয়া গিয়াছিল, কিন্তু তাহাতে রাধিকার মমতা হওয়া দূরে থাক্, লজ্জা হওয়া দূরে থাক্, ঘৃণায় বীতরাগে তাহার অন্তর রি-রি করিয়া উঠিয়াছিল। রাধিকার মা বাপ, গ্রামের সকলে তাহাকে ছি-ছি করিয়াছিল, কিন্তু রাধিকা সে গ্রাহ্যই করে নাই।

সেই রাধিকার আনীত শিবপদর অর্থেই শম্ভুর এই তাঁবু ও খেলার অন্য সরঞ্জাম কেনা হইয়াছিল। সে অর্থ আজ নিঃশেষিত হইয়া আসিয়াছে, দুঃখেই দিন চলে আজকাল; শম্ভু যাহা রোজগার করে, সবই নেশায় উড়াইয়া দেয়, কিন্তু রাধিকা একটি দিনের জন্য দুঃখ করে নাই। আর বেইমান কিনা এই কথা বলিল? সে একটা মদের বোতল বাহির করিয়া বসিল।

ও দিকে নূতন তাঁবুতে আবার বাজনা বাজিতেছে। দোসরা দফার খেলা আরম্ভ হইবে। মদ খাইয়া রাধিকা হিংস্র হইয়া উঠিয়াছিল, ওই বাজনার শব্দে তাহার সমস্ত অন্তরটা যেন জ্বালা করিয়া উঠিল। উহাদের তাঁবুতে নিশীথরাত্রে আগুন ধরাইয়া দিলে কেমন হয়?

সহসা তাহাদের তাঁবুর বাহিরে শম্ভুর ক্রুদ্ধ উচ্চ কণ্ঠস্বর শুনিয়া সে মত্ততার উপর উত্তেজিত হইয়া বাহিরে আসিল। দেখিল, শম্ভুর সম্মুখে দাঁড়াইয়া কিষ্টো। তাহার পরনে ঝকঝকে সাজ-পোশাক, চোখ রাঙা, সে-ই তখন কথা বলিতেছিল, কেনে, ইথে দোষটা কি হল? তুমরা বসে রইছ, আমাগোর খেলা হছে! খেলা দেখবার নেওতা দিলাম, তা দোষটা কি হল?

শম্ভু চীৎকার করিয়া উঠিল, খেল দেখাবেন খেলোয়ারী আমার! অপমান করতে আসছিস তু!

কিষ্টো কি বলিতে গেল, কিন্তু তাহার পূর্বেই উত্তেজিত রাধিকা একটা ইট কুড়াইয়া লইয়া সজোরে তাহাকে লক্ষ্য করিয়া ছুঁড়িয়া বসিল। অব্যর্থ লক্ষ্য, কিন্তু কিষ্টো অদ্ভুত, সে বলের মতো লুফিয়া ধরিয়া ফেলিল, তারপর ইটটাকে লুফিতে লুফিতে চলিয়া গেল। বিস্ময়ে রাধিকা সামান্য কয়টা মুহূর্তের জন্য যেন স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল, সে ঘোর কাটিতেই সে বর্ধিত উত্তেজনায় আবার একটা ইট কুড়াইয়া লইল; শম্ভু তাহাকে নিবৃত্ত করিল, সে সাদরে তাহার হাত ধরিয়া তাঁবুর মধ্যে লইয়া গেল। রাধিকা বিপুল

আবেগে শম্ভুর গলা জড়াইয়া ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল।

শম্ভু বলিল, এই মেলার বাদেই বাঘ কিনে লিয়ে আসব।

ওদিকের তাঁবু হইতে কিষ্টোর কণ্ঠস্বর ভাসিয়া আসিল, খোল কানাত, ফেলে দে খুল্যে।

তাঁবুর একটা ছেঁড়া ফাঁক দিয়া রাধিকা দেখিল, তাঁবুর কানাত খুলিয়া দিতেছে, অর্থাৎ ভিতরে না গেলেও তাহারা যেন দেখিতে বাধ্য হয়। সে ক্রোধে গর্জন করিয়া উঠিল, দিব আগুন ধরাইয়া তাঁবুতে।

শম্ভু গম্ভীর হইয়া ভাবিতেছিল। কিষ্টো চলন্ত ঘোড়ার পিঠে দাঁড়াইয়া কসরত দেখাইতেছে। রাধিকা একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল, নতুন খেলা কিছু বার কর তুমি, নইলে বদনামী হবে, কেউ দেখবে না খেলা আমাগোর।

শম্ভু দাঁতে দাঁত চাপিয়া বলিল, পুলিসে ধরাইয়া দিব শালাকে। মদের সন্ধান দিয়া দিব।

ওদিকে টিয়াপাখিতে কামান দাগিল, সেই মেয়েটা তারের উপর ছাতা মাথায় দিয়া নাচিল, বাঘটার সহিত কিষ্টো লড়াই করিল, ইঃ—একটা থাবা বসাইয়া দিল বাঘটা!

রাধিকা আপনাদের খেলার দৈন্যের কথা ভাবিয়া ঝরঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। সঙ্গে সঙ্গে আক্রোশেও ফুলিতেছিল। তাঁবুর আগুন ধরিয়া ধু-ধু করিয়া জ্বলিয়া যায়! কেরোসিন তেল ঢালিয়া আগুন ধরাইয়া দিলে কেমন হয়?

পরদিন সকালে উঠিতে রাধিকার একটু দেরি হইয়া গিয়াছিল; উঠিয়া দেখিল, শম্ভু নাই; সে বোধ হয় দুই-চারিজন মজুরের সন্ধানে গ্রামে গিয়াছে। বাহিরে আসিয়া সে শিহরিয়া উঠিল। কিষ্টোর তাঁবুর চারিপাশে পুলিস দাঁড়াইয়া আছে। দুয়ারে একজন দারোগা বসিয়া আছেন। এ কি? সে সটান গিয়া দারোগার সামনে সেলাম করিয়া দাঁড়াইল। দারোগা তাহার আপাদ-মস্তক দেখিয়া বলিলেন, ডাক সব, আমরা তাঁবু দেখব।

আবার সেলাম করিয়া বেদেনী বলিল, কি কসুর করলাম হুজুর?

মদ আছে কি না দেখব আমরা। ডাক বেটাছেলেদের। এইখান থেকেই ডাক।

রাধিকা বুঝিল, দারোগা তাহাকে এই তাঁবুরই লোক ভাবিয়াছেন; কিন্তু

সে আর তাঁহার ভুল ভাঙাইল না। সে বলিল, ভিতরে আমার কাঁচ ছেলে রইছে হুজুর—

আচ্ছা, ছেলে নিয়ে আসতে পার তুমি। আর ডেকে দাও পুরুষদের।

রাধিকা দ্রুত তাঁবুর মধ্যে প্রবেশ করিয়া সেই দেখা জায়গাটার আলগা মাটি সরাইয়া দেখিল, তিনটা বোতল তখনও মজুত রহিয়াছে। সে একখানা কাপড় টানিয়া লইয়া ভাঁজ করিয়া বোতল তিনটাকে পুরিয়া ফেলিল এবং সুকৌশলে এমন করিয়া বুকে ধরিল যে, শীতের দিনে সযত্নে বস্ত্রাবৃত অত্যন্ত কচি শিশু ছাড়া আর কিছু মনে হয় না। তাঁবুর মধ্যেই কিষ্টো অঘোরে ঘুমাইতেছিল, পায়ের ঠেলা দিয়া রাধিকা বলিল, পুলিস আইছে, বসে রইছে দুয়ারে, উঠ্যা যাও।

সে অকম্পিত সংযত পদক্ষেপে স্তন্যদানরত মাতার মতো শিশুকে যেন বুকে ধরিয়া বাহিরে লইয়া গেল। তাহার পিছনে পিছনেই কিষ্টো আসিয়া দারোগার সম্মুখে দাঁড়াইল।

দারোগা প্রশ্ন করিলেন, এ তাঁবু তোমার?

সেলাম করিয়া কিষ্টো বলিল, জী, হুজুর।

দেখব তাঁবু আমরা, মদ আছে কিনা দেখব।

মেলার ভিড়ের মধ্যে শিশুকে বুকে করিয়া বেদেনী ততক্ষণে জলরাশির মধ্যে জলবিন্দুর মতো মিশিয়া গিয়াছে।

শম্ভু গুম হইয়া বসিয়া ছিল, রাধিকা উপুড় হইয়া পড়িয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছিল। শম্ভু তাহাকে নির্মমভাবে প্রহার করিয়াছে। শম্ভু ফিরিয়া আসিতে বিপুল কৌতুকে সে হাসিয়া পুলিসকে ঠকানোর বৃত্তান্ত বলিয়া তাহার গায়ে ঢলিয়া পড়িল, বলিল, ভেল্কি লাগায়ে দিছি দারোগার চোখে।

শম্ভু কঠিন আক্রোশভরা দৃষ্টিতে রাধিকার দিকে চাহিয়া রহিল। রাধিকার সেদিকে ভ্রূক্ষেপও ছিল না, সে হাসিয়া বলিল, খাবা, ছেলে খাবা?

শম্ভু অতর্কিতে তাহার চুলের মুঠি ধরিয়া নির্মমভাবে প্রহার করিয়া বলিল, সব মাটি করে দিছিস তু; উয়াকে আমি জেহেলে দিবার লাগি পুলিসে বলে এলাম, আর তু করে এলি এই কাণ্ড!

রাধিকা প্রথমটায় ভীষণ উগ্র হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু শম্ভুর কথা সমস্তটা শুনিয়াই তাহার মনে পড়িয়া গেল গত রাত্রির কথা। সত্যই, এ কথা তো

বলিয়াছিল! সে আর প্রতিবাদ করিল না, নীরবে শম্ভুর সমস্ত নির্যাতন সহ্য করিয়া উপুড় হইয়া পড়িয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

আজ অপরাহ্ন হইতে এই তাঁবুতে খেলা আরম্ভ হইবে।

শম্ভু আপনার জীর্ণ পোশাকটি বাহির করিয়া পরিয়াছে, একটা কালো রঙের চোঙের মতো সরু প্যান্টালুন, আর একটা কালো রঙেরই খাটো-হাতা কোট। রাধিকার পরনে পুরানো রঙিন ঘাঘরা আর অত্যন্ত পুরানো একটা ফুলহাতা বডিস। অন্য সময় মাথার চুল সে বেণী বাঁধিয়া ঝুলাইয়া দিত, কিন্তু আজ সে বেণীই বাঁধিল না, আপনাদের সকল প্রকার দীনতা ও জীর্ণতার প্রতি অবজ্ঞায় ক্ষোভে তাহার যেন লজ্জায় মরিতে ইচ্ছা হইতেছিল! উহাদের তাঁবুতে কিষ্টোর সেই বিড়ালীর মতো গাল-মোটা. স্থবিরার মতো স্থূলাঙ্গী মেয়েটা পরিয়াছে গেঞ্জীর মত টাইট পাজামা, জামা, তাহার উপর জরিদার সবুজ সাটিনের একটা জাঙ্গিয়া ও কাঁচুলি ঢঙের বডিস্। কুৎসিত মেয়েটাকে যেন সুন্দর দেখাইতেছে। উহাদের জয়ঢাকটার বাজনার মধ্যে কাঁসা-পিতলের বাসনের আওয়াজের মতো একটা রেশ শেষকালে ঝঙ্কার দিয়া উঠে। আর এই কতকালের পুরানো একটা ঢ্যাপঢ্যাপে জয়ঢাক, ছি!

কিন্তু তবুও সে প্রাণপণে চেষ্টা করে, জোরে করতাল পেটে।

শম্ভু বাজনা থামাইয়া হাঁকিল, ও—ই ব—ড় বা—ঘ।

রাধিকা রুদ্ধস্বর কোনোমতে সাফ করিয়া লইয়া প্রশ্ন করিল, বড় বাঘ কি করে?

শম্ভু খুব উৎসাহভরেই বলিল, পক্ষীরাজ ঘোড়া হয়, মানুষের সঙ্গে যুদ্ধ করে, মানুষের মাথা মুখে ভরে, চিবায় না।

সে এবার লাফ দিয়া নামিয়া ভিতরে গিয়া বাঘটাকে খোঁচা দিল, জীর্ণ বৃদ্ধ বনচারী হিংস্রক আর্তনাদের মতো গর্জন করিল।

সঙ্গে সঙ্গে ও-তাঁবুর ভিতর হইতে সবল পশুর তরুণ হিংস্র ক্রুদ্ধ গর্জন ধ্বনিত হইয়া উঠিল। মাচার উপরে রাধিকা দাঁড়াইয়া ছিল, তাহার শরীর যেন ঝিমঝিম করিয়া উঠিল। ক্রূর হিংসাভরা দৃষ্টিতে সে ওই তাঁবুর মাচানের দিকে চাহিয়া দেখিল, কিষ্টো হাসিতেছে। রাধিকার সহিত চোখাচোখি হইতেই সে হাঁকিল, ফিন একবার।

ও-তাঁবুর ভিতর হইতে দ্বিতীয়বার খোঁচা খাইয়া উহাদের বাঘটা এবার

প্রবল গর্জনে হুঙ্কার দিয়া উঠিল। রাধিকার চোখে জ্বলিয়া উঠিল আগুন। জনতা স্রোতের মতো কিষ্টোর তাঁবুতে ঢুকিল।

শম্ভুর তাঁবুতে অল্প কয়েকটি লোক সস্তায় আমোদ দেখিবার জন্য ঢুকিল। খেলা শেষ করিয়া মাত্র কয়েক আনা পয়সা হাতে শম্ভু হিংস্র মুখ ভীষণ করিয়া বসিয়া রহিল। রাধিকা দ্রুতপদে মেলার মধ্যে বাহির হইয়া গেল। কিছুক্ষণ পরেই সে ফিরিল একটা কিসের টিন লইয়া।

শম্ভু বিরক্তি সত্ত্বেও সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল, কি উটা?

কেরাচিনি। আগুন লাগায়ে দিব উহাদের তাঁবুতে। পুরা পেলুম নাই, দুসের কম রইছে। তাহার চোখ জ্বলিতেছে।

শম্ভুর চোখও হিংস্র দীপ্তিতে জ্বলিয়া উঠিতেছিল। সে বলিল, লিয়ে আয় মদ।

মদ খাইতে খাইতে রাধিকা বলিল, দাউ-দাউ করে জ্বলবেক যখন!

সে খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। সে অন্ধকারের মধ্যে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল, ওই তাঁবুতে তখনও খেলা চলিতেছে। তাঁবুর ছেঁড়া মাথা দিয়া দেখা যাইতেছিল. কিষ্টো দড়িতে ঝুলানো কাঠের লাঠিতে দোল খাইতে খাইতে কসরত দেখাইতেছে, উঃ, একটা ছাড়িয়া আর একটা ধরিয়া দুলিতে লাগিল! দর্শকেরা করতালি দিতেছে।

শম্ভু তাহাকে আকর্ষণ করিয়া বলিল, এখুন লয়. সেই সেই—নিশুত রাতে!

তাহারা আবার মদ লইয়া বসিল।

সমস্ত মেলাটা শান্ত স্তব্ধ; অন্ধকারে সব ভরিয়া উঠিয়াছে; বেদেনী ধীরে ধীরে উঠিল, এক মুহূর্তের জন্য তাহার চোখে ঘুম আসে নাই।

বুকের মধ্যে একটা অস্থিরতায়, মনের একটা দুর্দান্ত জ্বালায় সে অহরহ যেন পীড়িত হইতেছে। সে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। গাঢ় অন্ধকার থমথম করিতেছে। সমস্ত নিস্তব্ধ। সে খানিকটা এদিক হইতে ওদিক পর্যন্ত ঘুরিয়া আসিল, কেহ কোথাও জাগিয়া নাই। সে আসিয়া তাঁবুতে ঢুকিল, ফস করিয়া একটা দেশলাই জ্বালিল, ওই কেরোসিনের টিনটা রহিয়াছে। তারপর শম্ভুকে ডাকিতে গিয়া দেখিল. সে শীতে কুকুরের মতো কুণ্ডলী পাকাইয়া অঘোরে ঘুমাইতেছে। তাহার উপর ক্রোধে ঘৃণায় রাধিকার মন

ছি-ছি করিয়া উঠিল। অপমান ভুলিয়া গিয়াছে, ঘুম আসিয়াছে! সে শম্ভুকে ডাকিল না, দেশলাইটা চুলের খোঁপায় গুঁজিয়া, টিনটা হাতে লইয়া একাই বাহির হইয়া গেল।

ওই পিছন দিক হইতে দিতে হইবে। ওদিকটা সমস্ত পুড়িয়া তবে এদিকে মেলাটার লোকে আলোর শিখা দেখিতে পাইবে। ক্রুর হিংস্র সাপিনীর মতোই সে অন্ধকারের মধ্যে মিশিয়া সনসন করিয়া চলিয়া ছিল। পিছনে আসিয়া টিনটা নামাইয়া সে হাঁপাইতে আরম্ভ করিল।

চুপ করিয়া বসিয়া সে খানিকটা বিশ্রাম করিয়া লইল। বসিয়া থাকিতে থাকিতে তাঁবুর ভিতরটা একবার দেখিয়া লইবার জন্য সে কানাতটা সন্তর্পণে ঠেলিয়া বুক পাতিয়া মাথাটা গলাইয়া দিল। সমস্ত তাঁবুটা অন্ধকার। সরীসৃপের মতো বুকে হাঁটিয়া বেদেনী ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল। খোঁপার ভিতর হইতে দেশলাইটা বাহির করিয়া ফস করিয়া একটা কাঠি জ্বালিয়া ফেলিল।

তাহার কাছেই এই যে কিষ্টো একটা অসুরের মতো পড়িয়া অঘোরে ঘুমাইতেছে। রাধিকার হাতের কাঠিটা জ্বলিতে লাগিল, কিষ্টোর কঠিন সুশ্রী মুখে কি সাহস! উঃ বুকখানা কি চওড়া, হাতের পেশীগুলা কি নিটোল। তাহার আশেপাশে ঘোড়ার খুরের দাগ—ছুটন্ত ঘোড়ার পিঠে কিষ্টো নাচিয়া ফেরে। ঐ যে কাঁধে সদ্য ক্ষতচিহ্নটা—ওই দুর্দান্ত সবল বাঘটার নখের চিহ্ন। দেশলাইটা নিবিয়া গেল।

রাধিকার বুকের মধ্যেটা তোলপাড় করিয়া উঠিল, যেমন করিয়াছিল শম্ভুকে প্রথম দিন দেখিয়া। না, আজিকার আলোড়ন তাহার চেয়েও প্রবল। উন্মত্তা বেদেনী মুহূর্তে যাহা করিয়া বসিল, তাহা স্বপ্নের অতীত। সে উন্মত্ত আবেগে কিষ্টোর সবল বুকের উপর ঝাঁপ দিয়া পড়িল।

কিষ্টো জাগিয়া উঠিল, কিন্তু চমকাইল না, ক্ষীণ নারীতনুখানি সবল আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া বলিল, কে? রাধি—

তাহার মুখ চাপিয়া ধরিয়া রাধিকা বলিল, হ্যাঁ, চুপ।

কিষ্টো চুমোয় চুমোয় তার মুখ ভরিয়া দিয়া বলিল, দাঁড়াও, মদ আনি।

না। চল, উঠ, এখুনই ইখান থেক্যে পালাই চল।

রাধিকা অন্ধকারের মধ্যে হাঁপাইতেছিল।

কিষ্টো বলিল, কুথা?

হ্-ই, দেশান্তরে।

দেশান্তরে? ই তাঁবু-টাবু—?

—থাক পড়্যা। উ ওই শম্ভু লিবে। তুমি উহার রাধিকে লিবা, উয়াকে দাম দিবা না?

সে নিম্নস্বরে খিলখিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

উন্মত্ত বেদিয়া—তাহার উপর দুরন্ত যৌবন—কিষ্টো দ্বিধা করিল না, বলিল, চল।

চলিতে গিয়া রাধিকা থামিল, বলিল, দাঁড়াও।

সে কেরোসিনের টিনটা শম্ভুর তাঁবুর উপর ঢালিয়া দিয়া মাঠের ঘাসের উপর ছড়া দিয়া চলিতে চলিতে বলিল, চল।

টিনটা শেষ হইতেই সে দেশলাই জ্বালিয়া কেরোসিনসিক্ত ঘাসে আগুন ধরাইয়া দিল। খিলখিল করিয়া হাসিয়া বলিল, মরুক বুড়া পুড়্যা।

র স ক লি

পাল-পুকুরের ঘাটের উপরেই প্রকাণ্ড বটগাছটার একটা শিকড় বিশাল অজগরের মত কুণ্ডলী পাকাইয়া গর্তের ভিতর মুখ সেঁধাইয়া যেন পিঠে রোদ পোহাইতেছে। পুলিন দাস তাহার উপর হাঁটুভাঙা দয়ের মত উবু হইয়া বসিয়া জলে খোলামকুচি ছুঁড়িয়া 'ব্যাং ছুড়ছুড়ি' খেলিতেছে। তাহার কাঁধে গামছা, কানে একটা পোড়া বিড়ি।

মিতে বলাই দাস আসিয়া ডাকিল, এই যে পেলা, উঠে আয়। ওরে ও খেপাচণ্ডী, উঠে আয়। খুড়ো যে—

পুলিন হাতের খোলামকুচিটা জলের পরিবর্তে মাটিতে আছড়াইয়া কহিল, টেঁসেছে বেটা বুড়ো?

বলাই সোৎসাহে কহিল, আর দেরি নাই, উঠে আয়।

উভয়েই গ্রামের পথ ধরিল, বলাই আগে, পুলিন পিছনে।

পুলিন সহসা কহিল, বউটা খুব কাঁদছে, নয় রে বলা?

বলা কহিল, খু-উ-ব, আছাড়-বিছেড় করছে।

মাথাটা তাহার প্রায় ঘাড়ের নিকটে হেলিয়া পড়িল, ঠোঁট দুইটা চিবুক পর্যন্ত বাঁকিয়া গেল।

আবার উভয়েই নীরব, রাস্তা ধরিয়া চলিয়াছে। একটা গাই রাস্তার ধারে পতিত জমিতে লম্বা দড়িতে বাঁধা, ঘাস খাইতেছিল। জানি না, পুলিন কোন্ কৌতুকে চট করিয়া বাঁ হাতের দুইটা আঙুলে গাইটার পিঠটা টিপিয়া ঘড়-ড়-ঘোঁৎ শব্দে নাসিকা-গর্জন করিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে গাইটাও মাথা নাড়িয়া লাফাইয়া উঠিল।

পুলিন সলম্ফে হাত দুই সরিয়া আসিয়া কহিল, মাইরি, কি ত্যাজ রে! আমার বউটাও ঠিক এমনই, মাথা নেড়েই আছে।

পুলিনচন্দ্রের এক দেহশ্রী ভিন্ন আর কিছুই প্রশংসা করিবার মত ছিল না। তাহার দেহখানি সুন্দর, দীর্ঘ আকার, সবল দেহ, বর্ণ গৌর, কোঁকড়া চুল,

আর সর্বাঙ্গ বেড়িয়া বেশ একটি মিষ্ট লাবণ্য। এ ছাড়া আর কোন গুণেই ছিল না। বুদ্ধির খ্যাতি তো কোন কালেই নাই, বাল্যকালেই পাঠশালায় গুরুমহাশয় 'এক পয়সায় তিনটে আম, তা তিনটে আমের কত দাম' ঝাড়া তিনটি ঘণ্টাতেও বুঝাইতে না পারিয়া নিজেই তাহার বই-দপ্তর গুছাইয়া বগলে পুরিয়া দিয়া কহিয়াছিলেন, বাবা, শুভঙ্কর যে এ জন্মে বৈরাগী-কুলে জন্ম নিয়ে হিসেবে পর্যন্ত বৈরাগ্য করেছেন, তা জানতাম না। তোমায় পড়ানো আমার কর্ম নয়।

ইহার পর সে ছিল যেন মূর্তিমান বে-তাল।

মজলিশে হয়তো লঙ্কাকাণ্ডের মত ভীষণ গম্ভীর আলোচনা চলিতেছে, বুড়া জাম্বুবান হয়তো মন্ত্রণা দিতেছে, মজলিশসুদ্ধ লোক স্তম্ভিত, নিস্তব্ধ, সহসা সেখানে পুলিনচন্দ্র যেন কৌতুকের কাতুকুতুতে গুলগুল করিয়া হাসিয়া উঠে—হেঁ-হেঁ-হেঁ-হেঁ, এ মাইরি আমার খুড়োকে লিখেছে, তেমুণ্ডে বুড়ো—ইয়া চুল, দাড়ি, ঠিক ঠিক, জাম্বুবান, জাম্বুবান—হেঁ-হেঁ-হেঁ-হেঁ!

আবার হয়তো হনু-ভানুর মিতালির রঙ্গে মজলিশ তো মজলিশ, দেবগণ পর্যন্ত হাসিয়া আকুল, সেখানে পুলিন বিস্ময়ে হতবাক, চক্ষু দুইটা ছানা-বড়ার মত বিস্ফারিত, পাশের লোককে বলে, কি মাইরি যে হাসিস, তার ঠিক নাই। তারপর সোৎসাহে বাহবা দেয়, বলিহারি বাপ হনু, বাবুদের প্যায়দার চেয়েও তুমি জিন্দে পালোয়ান।

গ্রন্থকারও বাদ যান না, পুলিন কহে, বইটার কিন্তু ভারি চহট মাইরি, এ একেবারে অবাক-জলপান লাগিয়ে দিয়েছে!

আবার রাবণ-বধে সীতা-উদ্ধারে আনন্দিত শ্রোতৃমণ্ডলী আবেগে জয়ধ্বনি করিয়া উঠে। বিচিত্র পুলিন, বিচিত্র তাহার রসবোধ, সে সজল চক্ষে বলে, আহা-হা, এতগুলো বেধবা হ'ল, আহা-হা!

আবার সঙ্গে সঙ্গেই ব্যগ্র অনুসন্ধানে কহে, আচ্ছা, লঙ্কায় তাহ'লে মাছের সের কত ক'রে হল? এক পয়সা, না দু পয়সা?—তা লেখে নাই?

লোকে তাই বুদ্ধিহীনের উপর রঙ চড়াইয়া কহে, ক্ষ্যাপা।

পুলিন রাগে না, হাস্যমুখে উত্তর দেয়, অ্যাঁ!

রাগে একজন, আর লজ্জায় দুঃখে মরিয়া যায় আর একজন। দুইজনের প্রথমটি পুলিনের স্ত্রী, বয়স আঠারো-উনিশ, গোলগাল আঁটসাট দেহ, নাম গোপিনী।

কিন্তু পুলিন কহে, সাপিনী। পুলিনের নির্বুদ্ধিতার লজ্জায়, খোঁচায়

গোপিনী রাগে সাপিনীর মতই গর্জায়। কথাগুলিও বাহির হয় সাপিনীর জিহ্বার মতই. লকলকে তীক্ষ্ণ ভয়াবহ। নির্বোধ, সর্বজনের হাস্যাস্পদ স্বামীর ঘরে শত লজ্জার মধ্যেও সান্ত্বনার একটি আশ্রয় গোপিনীর মিলিয়াছিল, সে ওই দ্বিতীয় ব্যক্তিটি, যে পুলিনের জন্য লজ্জায় দুঃখে মরমে মরিয়া থাকিত; সে পুলিনের বৃদ্ধ খুড়া রামদাস মোহান্ত, যাহার সহিত পুলিন জাম্বুবানের সাদৃশ্য দেখিতে পায়।

রামদাসের অবস্থা বেশ ভালই, মোটা জোতজমা, উঠানে বড় বড় মরাই, ঘরে দুগ্ধবতী গাভী. গ্রামে দু-দশ টাকার তেজারতি।

তবে তাহার চেহারাটা আজ শুধু চুল-দাড়ির জন্যই নয়, চিরকালই কেমন বেয়াড়া বিশ্রী; তাই যৌবনে যখন সে শ্রীমতীকে লইয়া পরম আগ্রহে সংসার পাতিয়াছিল, তখন শ্রীমতী রামদাসের ওই বদ চেহারার জন্যই নাকি তাহার পাতানো সংসারে লাথি মারিয়া কোথায় একদিন উধাও হইয়া গিয়াছিল।

গৃহী-বৈরাগীর বংশধর রামদাস শ্রীমতীর সন্ধানে হরেক রকম তালি দেওয়া আলখাল্লা পরিয়া ঝোলা কাঁধে ভবঘুরে ভিখারী বৈরাগী সাজিল, শোকে সংসারকে ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিল, কিন্তু সংসার তাহাকে ছাড়িল না।

শ্রীমতীর সন্ধান মিলিল না, কিন্তু তাহার ভিক্ষার ঝুলির মধ্যে কোন্ দিন শ্রী আসিয়া প্রবেশ করিয়া তাহাকে সংসারের দিকে ফিরাইল; তখন ভিক্ষার সঞ্চয়েই তাহার তিনশো টাকা পুঁজি, আর বাড়ির জোতজমার ধান ঠিকাদার-ভাগদারের কাছে বেশ মোটা হইয়া জমিয়াছিল। শ্রীমতীর অভাবে রামদাস শ্রীকে লইয়া বেশ আঁটালো করিয়া সংসার বাঁধিল।

পাঁচজনে কহিল. মোহান্ত, এইবার ভাল ক'রে সংসার পাত, একটি ভাল দেখে বোষ্টমী।

রামদাস কহিল, রাধে রাধে, ও কথা ছাড়ান দাও দাদা। রাধারানী আমার মনেই ভাল, ধ্যানেই সোজা, বাইরে বেজায় বেঁকা। বেঁকা রায়ের লাঞ্ছনাটাই দেখ না! জয় রাধে, শ্রীমতী শ্রীমতী!

কে একজন স্ত্রী-জাতির কি একটা নিন্দা করিল, মোহান্ত মাথা নাড়িয়া জিব কাটিয়া সবিনয়ে প্রতিবাদ করিল, রাধে রাধে, ও কথা ব'লো না. বলতে নাই। শ্রীমতীর জাত, ওরা সবাই ভাল।

একজন ঠোঁট কাটা কঠোর রসিকতা করিয়া ফেলিল, তা তোমার শ্রীমতী—

মোহান্ত হাসিয়া কহিল. বললাম যে দাদা, শ্রীমতীর জাত ওরা, সুন্দর

নিয়েই যে কারবার ওদের। অসুন্দরকে কে কবে পছন্দ করে দাদা?

এই সময় রামদাসের বড় ভাই শ্যামদাস বছর আষ্টেকের ফুটফুটে মাতৃহীন পুলিনকে রাখিয়া মারা গেল। রামদাস পুলিনকে বুকে করিয়া 'না বিইয়াই শ্যামের মা' হইয়া উঠিল।

সুন্দর পুলিন বড় হইল। বৈষ্ণবের ছেলে, কীর্তনের আখড়ায় খোল করতাল ছাড়িয়া লাঠির আখড়ায় লাঠি ধরিতে শিখিল। বলা সঙ্গী হইল, গাঁজা ধরিল। রামদাস শাসন করিতে পারিল না, শুধু দুঃখই করিল; তবু মনে মনে নিজেই সান্ত্বনা খুঁজিয়া লইল, বেশ একটি গোছালো বউ আসিলেই পুলিন মানুষ হইবে, বোকা বুদ্ধিমান হইবে, ঘর বুঝিবে, না বুঝে ঘর ঘাড়ে চাপিয়া পরিচয় করিয়া লইবে।

রামদাস পুলিনের জন্য পাত্রী খুঁজিতে লাগিল।

সৌরভী বৈষ্ণবী আসিয়া কহিল মোহান্ত, তা আমার মঞ্জরীর সঙ্গে পুলিনের বিয়ে দাও না কেন? ছেলেবেলার সাথী দুটি, ভাবও খুব—

রামদাস কহিল, রাধে রাধে, তা যে হয় না সৌরভী, আমরা হলাম জাত-বোষ্টম, আর তোমরা ভেকধারী।

সৌরভী ছিল ধোপার মেয়ে, ভেক লইয়া বৈষ্ণব হইয়াছে। তাহার মেয়ের সঙ্গে ভাইপোর বিবাহ দিতে রামদাসের রুচি হইল না। না হইলে সৌরভীর মেয়ে মঞ্জরী বেশ সুশ্রী, বেশ নজরে-ধরা মেয়ে। তবে একটু রসোচ্ছলা, যাকে বলে 'ডগমগ' ভাব, সেই ভাবে সে চঞ্চল। চলিতে তাহার দেহে হিল্লোল খেলিয়া যায়, কথা বলিতে হাসি উপচিয়া পড়ে। হাসিতে নিটোল গালে টোল পড়ে, সে গ্রীবাটি ঈষৎ বাঁকাইয়া দাঁড়ায়। নাকে রসকলি কাটে, চূড়া বাঁধিয়া চুল বাঁধে, কথার ধরনটাও তাহার কেমন বাঁকা। লোকে কত কি বলে, কিন্তু তাহাতে তাহার কিছু আসে যায় না। নদীর বুকে লোহার চিরেও দাগ আঁকে না, স্রোতও বন্ধ হয় না।

মঞ্জরী পুলিনের চেয়ে বছর চারেকের ছোট, বাল্যসাথী, দুইজনের ভাবও খুব। পুলিন সময়ে অসময়ে মঞ্জরীদের বাড়ি যায়, মঞ্জরী সাদরে অভ্যর্থনা করে, মুখে দীপ্তি ফুটিয়া উঠে, রসোচ্ছলা আরও উচ্ছল হইয়া উঠে।

পুলিন বলে, কি হে রসকলি, করছ কি?

দুইজনে 'রসকলি' পাতাইয়াছে।

মঞ্জরী মুচকি হাসিয়া সুরে বলে—



"তোমায় আঁকছি হে অঙ্গে যতন ক'রে।"

পুলিন এ কথার উত্তর খুঁজিয়া পায় না।

অভাব-অভিযোগে কত দিন মঞ্জরীর মা সৌরভী আসিয়া কহে, দেখ্ লো মঞ্জরী, দুটো টাকা কারু কাছে পাওয়া যায় কি না, নইলে তোর খাড়ুটা বাঁধা দিতে হবে।

মঞ্জরী বলে, খাড়ু আমি বাধা দেব না রসকলি। তুমি টাকা এনে দাও।

পুলিন শশব্যস্তে বলে. সে কি রসকলির মা, খাড়ু বাঁধা দেবে কি! আমি টাকা এনে দিই।

সৌরভী আপত্তি করিলে মঞ্জরী কহে, কেন, রসকলি কি আমার পর?

খুড়ার তহবিল সন্ধান করিয়া না পাইলে চাউল বিক্রয় করিয়া সে টাকা আনিয়া দেয়।

আবার মঞ্জরী কখনও কখনও পুলিনের হাত চাপিয়া ধরিয়া বলে, না, তুমি দিতে পাবে না, ও মায়ের চালাকি।

মায়ে ঝিয়ে ঝগড়া হয়, পুলিন ব্যস্ত হইয়া উঠে, কিন্তু মঞ্জরী কহে, খবরদার, আড়ি করব।

দশ বছর বয়সেই মঞ্জরীর একবার বিবাহ হইয়াছিল, কিন্তু পাত্রটিকে মঞ্জরীর পছন্দ হয় নাই, তাই তাহাকে সে নাকচ করিয়া দিয়াছে। সে বেচারী বহুবার মঞ্জরীর জন্য হাঁটাহাঁটি করিয়া শেষে অন্যত্র বিবাহ করিয়া সংসার পাতিয়াছে। মঞ্জরীকে ছাড়পত্র করিয়াছে।

নানা কারণে রামদাস সৌরভীকে প্রত্যাখ্যান করিল।

রামদাস সৌরভীকে ফিরাইয়া দিল; সৌরভীও ঘরে গিয়া পুলিনকে ফিরাইয়া দিল, কহিল, বাবা, মেয়ের আমার সোমত্ত বয়েস, তুমি আর এসো না। একেই তো পাঁচজনে পাঁচ কথা বলে। মনে ভেবেছিলাম, তোমরা দুটি ছেলেবয়সের সাথী, দু হাত এক ক'রে দিয়ে দেখে চোখ জুড়োব, তোমার কাকা তা দেবে না। আমাকে তো আমার মেয়ের বিয়ে দিতে হবে!

কথাটা পুলিনের বড় বাজিল, সে দুই দিন খাইল না, শুইল না. মাঠে মাঠে ঘুরিয়া বেড়াইল।

রামদাস শেষে রাজি হইল, বেশ, মঞ্জরীর সঙ্গেই পুলিনের বিবাহ হোক।

সময়টা হোলির, রামদাস শ্রীধাম বৃন্দাবন যাইবে। তাই স্থির হইল যে, রামদাস ফিরিলে বিবাহ হইবে।

কিন্তু উপরওয়ালার অভিপ্রায় অন্যরূপ।

শ্রীধামে সহসা একদিন রামদাসের সঙ্গে হারানো শ্রীমতীর দেখা হইয়া গেল। শ্রীমতী তখন গাছতলায় কলেরায় ছটফট করিতেছে, পাশে বারো-তেরো বছরের মেয়ে গোপিনী বসিয়া বসিয়া অঝোর-ঝরে কাঁদিতেছিল।

স্ত্রীলোকটির কাতরানিতে আর বালিকাটির কান্নায় দয়াপরবশ হইয়া রামদাস সাহায্যে অগ্রসর হইয়া রোগিণীর পাশে বসিল, ক্ষণেক তাহার মুখপানে চাহিয়া সাগ্রহে ডাকিল, শ্রীমতী!

রোগযন্ত্রণায় কাতর শ্রীমতী রামদাসের মুখপানে চাহিয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল, রামদাস উত্তরীয়-প্রান্ত দিয়া চোখ মুছাইয়া দিল। শ্রীমতী তাহার পা দুইটা চাপিয়া ধরিয়া কহিল, আমার যাবার সময় পায়ের ধুলো দাও। আর এই মেয়েটিকে নাও। বড় ভাল মেয়ে, মায়ের মত নয়, পার তো পুলিনের সঙ্গে বিয়ে দিও। ভয় নেই, অজাতের মেয়ে নয়। সেই যে, বাউল প্রেমদাসকে মনে পড়ে? সেও জাত-বোষ্টম, তারই মেয়ে।

রামদাস কাতর কণ্ঠে কহিল, শ্রীমতী, রাধারাণী, আমি যে তোমার তরে আজও শূন্য ঘর বেঁধে ব'সে আছি।

শ্রীমতী সে কথার কোন উত্তর দিল না, শুধু কন্যা গোপিনীকে কহিল, মা, এই তোর বাপ, এঁর সঙ্গে যা, আমার চেয়েও আদরে রাখবে। আর একটা কথা গোপিনী, কখনও যেন স্বামী ছাড়িস নি; হই বোষ্টম, থাকুক নিয়ম, তবু ওতে সুখ নেই।

শ্রীমতীকে বৃন্দাবনে বিসর্জন দিয়া গোপিনীকে লইয়া রামদাস বাড়ি ফিরিল।

সৌরভীকে ডাকিয়া পঞ্চাশ, একশো, শেষে দুইশোটি টাকা হাতে দিয়া কহিল, সৌরভী, আমায় বাক্যি থেকে খালাস দাও।

একমুঠো টাকা খুঁটে বাঁধিয়া সৌরভী হাসিমুখেই বাড়ি ফিরিল।

সৌরভী মঞ্জরীর জন্য পাত্র ঠিক করিল, কিন্তু মঞ্জরী কহিল, না।

মা শেষে রাগ করিয়া রামদাসের টাকা লইয়া বৃন্দাবন চলিয়া গেল।

মঞ্জরী দিন দুই কাঁদিল; তারপর আবার উঠিল, ক্রমে হাসিল, রসকলি কাটিল, কিন্তু বিবাহ করিল না।

এদিকে পুলিনের সঙ্গে গোপিনীর বিবাহ হইয়া গেল। পুলিন যেন

মঞ্জরীর নেশা ভুলিল। সে দিন-রাত্রি ঘরেই থাকে, বাড়ির বাহির হয় না, দেখিয়া রামদাস সুখে হাসিল। মঞ্জরী দুই-চারি দিন পুলিনের অপেক্ষা করিয়া শেষে একদিন চূড়া করিয়া চুল বাঁধিয়া, নাকে রসকলি কাটিয়া, পান চিবাইতে চিবাইতে রামদাসের বাড়িতে আসিয়া উঠিল। রামদাস তখন বাড়িতে ছিল না; উঠানে দাঁড়াইয়া মঞ্জরী মুচকি হাসিয়া ঘরের রুদ্ধ দ্বারকে উদ্দেশ করিয়াই বলিল, কই হে রসকলি, বউ দেখাও হে!

পুলিন ঘরের ভিতর গোপিনীর সহিত কথা কহিতেছিল, মঞ্জরীর আওয়াজ পাইয়া অন্য দুয়ার দিয়া সে ছুটিয়া পলাইয়া গেল। গোপিনী নতমুখে ঘরের মধ্যেই দাঁড়াইয়া রহিল। মঞ্জরী ঘরে ঢুকিয়া গোপিনীর ঘোমটা তুলিয়া দেখিয়া ঠোঁটের আগায় পিচ কাটিয়া কহিল, তুমি বউ?

গোপিনী মুখ তুলিয়া চাহিল।

মঞ্জরী আবার কহিল, তা হ্যাঁ বউ, রসকলির তোমাকে পছন্দ হয়েছে?

গোপিনী এবার কথা কহিল, যেন চিমটি কাটিয়া কহিল, না।

মঞ্জরী বলিল, বাঃ, এই যে পাখি পড়ে বেশ! তা হ্যাঁ বউ, কেন পছন্দ হয় নি, কিছু জেনেছ?

গোপিনী সেই চিমটি কাটার মতই কহিল, রসকলি কাটতে জানি না কিনা, তাই।

মঞ্জরী সব বুঝিল, এবার সে হাসিয়া বিস্ময়ের ভঙ্গীতে গালে হাত দিয়া কহিল, ওমা, তাই নাকি? তা আমার কাছে রসকলি কাটা শিখবে বউ?

গোপিনী কহিল, শেখাবে? দেখো, ঠিক তোমার মতনটি হওয়া চাই।

মঞ্জরী কহিল, তাই শেখাব, কিন্তু ধৈরয ধ'রে থাকা চাই। পারবে তো?

গোপিনী কহিল, পারব, কিন্তু তোমার সময় হবে তো? বলি, আসবে কখন? রসময়রা ছাড়বে তো?

মঞ্জরী এবার ঠেকার দিয়া কহিল, আমার রসময়রা নয় অসময়ে এসে সময় দেবে। তোমার রসময় যে একদণ্ড ছাড়ে না দেখি!

গোপিনী কহিল, ও দুদিন, এখন নতুন নতুন নালতের শাক হে। তারপর বুড়ো গরু ঠিক দামে গিয়ে পড়বে, ভয় নাই।

মঞ্জরী একটু ঝঙ্কার দিয়া কহিল, তা ভাই, বুড়ো গরু বেঁধে রাখলেই হয়! যার দড়ি নাই, তার আবার গরু পোষার শখ কেন?

গোপিনীও এবার একটু ঝঙ্কার দিয়া কহিল, ঘোড়া হ'লে কি চাবুকের

অভাব হয় হে, তা হয় না। যখন গরু পুষেছি, তখন দড়ি কি না জুটবে? বলি, পরনের কাপড়ে আঁচল তো আছে, তাতেই বাঁধব।

মঞ্জরী হাসিয়া কহিল, যদি ছিঁড়ে পালিয়ে যায়?

গোপিনী কহিল, ইস, সাধ্যি কি!

মঞ্জরী কহিল. দেখো।

গোপিনী সেই দম্ভভরেই কহিল, তখন না হয় ছেঁড়া আঁচল গলায় দিয়ে ঝুলব হে, তা ব'লে জ্যান্তে তো আর ভাগাড়ে দিতে পারি না!

ইহার পর মঞ্জরী আর কথা কহিল না, আচমকাই যেন বাড়ি ফিরিল, তখন মুখখানায় হাসি ছিল না, যেন থমথমে জলভরা মেঘ।

পরদিন হইতে রসকলির বাড়িতে পুলিনের আদর যেন বাড়িয়া গেল। লোক পাঠাইয়া পুলিনকে আনাইল, তাহার লজ্জা ভাঙিয়া গেল। এখন আর পুলিনের গাঁজার আড্ডায় মঞ্জরী ঝঙ্কার দেয় না। সঙ্গী বলাকে দেখিয়া বিরক্ত হয় না। এখন কথায় কথায় মঞ্জরী যেন ঢলিয়া পড়ে। পান দেয়। পুলিন আবার বাড়ি ছাড়িল, পূর্বের চেয়ে যেন বেশি শক্ত করিয়া মঞ্জরীর বাড়িতে আড্ডা গাড়িল।

মঞ্জরী মাঝে মাঝে আবার এও বলে, রসকলি, এ তো ভাল কাজ হচ্ছে না।

পুলিন হোৎকার মত কহে, কি?

মঞ্জরী মুচকি হাসিয়া বলে, এই—আমার বাড়িতে এমন ক'রে চব্বিশ ঘণ্টা প'ড়ে থাকা।

পুলিন তেমনই ভাবেই বলে, কেন?

মঞ্জরী সুর করিয়া গান ধরে—

"পাঁচ সিকের বোষ্টুমি তোমার,
ওহে, গোসা করেছে, গোসা করেছে।"

পুলিন কহে, ধ্যেৎ।

গোপিনী সত্য সত্যই রাগ করিল, কিন্তু ভাঙায় কে? যাহার উপর মান, সেই যে মানের মুখে ছাই দিয়া দিল। সে খাবার সময় আসে, দুইটা খায়, দেশের দশের হাস্যাস্পদ হইয়া ফেরে, মঞ্জরীর বাড়ি আড্ডা জমায়, ঘরের পয়সা পর্যন্ত মঞ্জরীর ঘরে তুলিয়া দিয়া আসে। মঞ্জরীর নাকি সোনার নথ হইতেছে, গোপিনী জ্বলিয়া গেল। পুলিন যে-দুই-চারিটা কথা গোপিনীর সহিত কয়,

তাহা পর্যন্ত মঞ্জরী-বিশোভিত। সেদিন রাত্রে কথায় কথায় নির্বোধ কহিল, রসকলি তোমার কি নাম দিয়েছে জান গা? গোপিনী নয়, সাপিনী। তা সত্যি, সবেতেই তোমার ফোঁস।

গোপিনী একটা জ্বলন্ত অগ্নিবর্ষী কটাক্ষ হানিয়া ছুটিয়া পলাইল। রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্যন্ত বাহিরে কাঁদিতে কাঁদিতে মনে পড়িল, সে বলিয়াছিল, যদি আঁচল ছেঁড়ে তবে ছেঁড়া আঁচল গলায় দিয়া ঝুলিবে। উদ্‌ভ্রান্ত ব্যথাহত নারী সত্যই আঁচল ছিঁড়িয়া দড়ি পাকাইতে বসিল। ঘরে পুলিন তখন অঘোরে নিদ্রা যাইতেছে, বুঝি বা রসকলিকে স্বপ্ন দেখিতেছিল।

পাশের ঘরের দরজা খুলিয়া বৃদ্ধ মোহান্ত বাহির হইল, শ্বেতবস্ত্রা গোপিনীকে দেখিয়া চমকিয়া কহিল, কে? কে? এ কি মা! বাইরে কেন, মা আমার?

গোপিনী ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল, বৃদ্ধের স্নেহস্পর্শে তাহার হাতের পাকানো আঁচল এলাইয়া খুলিয়া গেল।

মোহান্ত গোপিনীকে বুকে লইয়া কাঁদিয়া কহিল, মা, বুড়ো ছেলের মুখের দিকে চেয়ে ধৈর্য ধর্, মা আমার, আমি আশীর্বাদ করছি—ভাল হবে, ভাল হবে তোর।

পুলিনের ব্যবহারে শান্ত স্নেহ-দুর্বল বৃদ্ধ মরমে মরিয়া গেল। কঠোর হইতে চেষ্টা করিল, পয়সায় টান দিল, কথা বন্ধ করিল, কিন্তু তবুও যে-পুলিন সেই পুলিনই রহিয়া গেল। অন্ধের কিবা রাত্রি কিবা দিন!

শুধু রসকলির বাড়িতে বসিয়া বলার সহিত খুড়ার আয়ুর দিন গণনা করিতে লাগিল।

রামদাস কিন্তু বাঁচিতে চাহিয়াছিল, মরমে মরিয়াও গোপিনীর জন্য বাঁচিতে চাহিত। সর্বদা তাহার ভাবনা হইত, সে মরিলে গোপিনীর দশা কি হইবে?

কিন্তু মানুষ অমর নয়, মরণের পরোয়ানা সঙ্গে লইয়াই জন্ম লওয়া। সহসা একদিন রামদাসের তলব আসিল। মোহান্তের বয়স হইয়াছিল, হাঁপানি ছিল, হঠাৎ একদিন হাঁপানি মৃত্যুর মূর্তিতে বুকে চাপিয়া বসিল।

গোপিনী চোখের জলে বুক ভাসাইয়া সেবা করিতে বসিল। পাড়া-পড়শী আসিয়া জমিল। মোহান্ত যেন কাহার অনুসন্ধান করিতেছিল, কিন্তু সে তখন পাল-পুকুরের ঘাটে বসিয়া 'ব্যাং ছুড়ছুড়ি' খেলিতেছিল।

পাড়া-পড়শী ভিড় জমাইয়া বসিয়া আছে, কেহ বলে, মোহান্ত, হরি বল, বল—জয় রাধারাণী!

রাধারাণীর জয়গানে চিরমুখরকণ্ঠ চারণ কিন্তু আজ এ সময়ে রাধারাণীর ধ্যান করিতে পারিল না। মৃগমায়াচ্ছন্ন রাজা ভরতের মত শুধু বলিল, মা গোপিনী, কিছু করতে পারলাম না মা।

গোপিনী শেষে আছাড় খাইয়া পড়িল। হায়, তাহার নীড় যে ভাঙিয়া যায়! ভ্রষ্টনীড় বিহঙ্গিনীর ক্রন্দন ছাড়া আর উপায় কি? পাড়ার মেয়েরা দূরে দাঁড়াইয়া ছিল, কিন্তু কেহ এই গোপিনীকে ধরিতে সাহস করিল না। বুড়া রোগী, কখন শেষ নিশ্বাস পড়িবে, খাবি খাইয়া মরিবার নোটিসও হয়তো দিবে না। মড়া ছুঁইয়া কে অশুচি হইবে!

ধরিল শেষে একজন। সে মঞ্জরী।

মঞ্জরী আসিয়াই শোকবিহ্বলা গোপিনীকে ধরিল। কহিল, ভয় কি?

মুমূর্ষু মোহান্ত একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া টানিয়া টানিয়া কহিল, গ্রামের পাঁচজন আছেন, আমার শেষ ইচ্ছা ব'লে যাই।—আমার স্থাবর সমস্ত সম্পত্তির মালিক হ'ল গোপিনী। আর সকলের কাছে এই ভিক্ষে, ছেলেটাকে যেন ওই বেশ্যের হাত হতে বাঁচিও।

কথাটায় সকলের চক্ষু গিয়া পড়িল মঞ্জরীর উপর। সকলেই ভাবিতেছিল, সে কি করিয়া বসে, সে কি করিয়া বসে! কিন্তু মঞ্জরী গোপিনীর এলানো দেহখানি পরম সান্ত্বনাভরে জড়াইয়া বসিয়া ছিল। বসিয়াই রহিল, চাঞ্চল্য দেখা গেল না।

মোহান্ত যখন কথাটা আরম্ভ করে, তখনই বলার সঙ্গে পুলিন আসিয়া পেঁৗছিয়াছিল, সেও কথাটা শুনিল।

কথাটা আজ তাহাকে প্রথম আঘাত দিল, মান-অপমানের স্বাদ আজ সে বুঝি প্রথম বুঝিল।

লোকে তখন মোহান্তের শেষ ইচ্ছার সমালোচনায় ব্যস্ত। পুলিন দাওয়া .হইতে নামিয়া পড়িল, কেহ লক্ষ্য করিল না; কিন্তু মঞ্জরী ডাকিল, যাচ্ছ কোথা?

পুলিন কহিল, আর এ বাড়িতে নয়।

মঞ্জরী কহিল, ছিঃ, এই কি রাগের সময়? এস, খুড়োর মুখে জল দাও, কানে নাম শোনাও।

পাড়াসুদ্ধ লোক এই বেহায়া মেয়েটার সীমাহীন নির্লজ্জতায় অবাক হইয়া তাহার মুখপানে চাহিয়া রহিল। মেয়েরা গালে হাত দিল। পুলিনও মঞ্জরীর মুখপানে চাহিল, তারপর ধীরে ধীরে খুড়ার শিয়রে বসিয়া মুখে গঙ্গাজল দিল, ডাকিয়া কহিল, বল কাকা, জয় রাধারাণী!

বৃদ্ধ কহিল, জয় রাধারাণী! দয়া কর মা, অনাথিনী দুঃখিনীকে দয়া কর মা!

বেলা আড়াই প্রহরের সময় রামদাস মরিল, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শেষ হইতে রাত্রি এক প্রহর হইয়া গেল।

তখন মঞ্জরী গোপিনীকে কহিল, তবে আমি আসি।

গোপিনী বলিল, এস।

মঞ্জরী চারিদিক চাহিয়া সরলভাবেই কহিল, কত্তা কই? একাটি থাকতে ভয় করবে না তো?

গোপিনীর মনে হইল, মঞ্জরী বুঝি তাহাকে ঠাট্টা করিল। সে উত্তর করিল, আসা যাওয়াই যখন একা, তখন একা থাকতে ভয় করলে চলবে কেন? আর একাই তো থাকা এক রকম।

মঞ্জরী কথাটা গায়ে না লইয়া কহিল, আমি কিন্তু ভাই, একা থাকতে পারতাম না।

গোপিনী কহিল, আমি হ'লে একা থাকতে যদি না পারতাম গলায় দড়ি দিতাম, তবু—

মঞ্জরী এবার একটু ঝাঁঝিয়া উত্তর দিল, বালাই, ষাট, মরব কেন? আসি ভাই, কিন্তু রসকলি গেল কোথা?

গোপিনী ক্ষিপ্তের মত কহিল, রসকলি নাকেই আছে, ঘরে গিয়ে আয়না নিয়ে দেখ, পোড়া মুখের ওপরেই ঝলমল করছে।

মঞ্জরী এই আকস্মিক আঘাতে যেন বিহ্বল হইয়া পড়িল। বহুকষ্টে আত্মসংবরণ করিয়াও কিন্তু শেষটা উত্তরের বেলায় বলিয়া ফেলিল, রসকলি তো নিজের নাকেই থাকে বউ, এ যে কেড়ে নেওয়া যায় না! তা তুমি যদি চাও তো না হয় দেবার চেষ্টা করি।

গোপিনী ফোঁস করিয়া বলিয়া দিল, কি বললে তুমি? তোমার কাছ থেকে ভিক্ষে আমি চাই নে, চাই নে। যাও তুমি, যাও।

কথাগুলি ক্রুদ্ধ এক-নিশ্বাসে বলিয়াই সে ঘরে ঢুকিয়া মঞ্জরীর মুখের

উপরেই দরজাটা দড়াম করিয়া বন্ধ করিয়া দিল।

মঞ্জরী ধীরে ধীরে বাড়ি ফিরিল, বুকের ভিতর তাহার যেন আগুন জ্বলিতেছিল। সাপিনীর এত বিষ! আপনার বিষে হতভাগিনী আপনি জর্জর হইয়া মরুক।

আপন বাড়ি ঢুকিতেই মঞ্জরী দেখিল, পুলিন তাহার দাওয়ার উপর বসিয়া।

মঞ্জরীর দেহ ব্যাপিয়া একটা হিল্লোল বহিয়া গেল। হাসিতে তাহার মুখ ভরিয়া উঠিল।

পুলিন উঠিয়া কহিল, রসকলি!

মঞ্জরী হাসিয়া উত্তর দিল, ব'স, বলি।

পুলিন বসিল।

ঘরের তালা খুলিতে খুলিতে মঞ্জরী বলিল, রসকলি. তুমি ভাই সোনা-কপালে পুরুষ। স্ত্রী-ভাগ্যে ধন।

পুলিন খুব রাগিয়াই কহিল, ও ধন আমার ভাদ্দর-বউ, ছুঁতে পাপ।

মঞ্জরী খিলখিল করিয়া হাসিয়া কহিল, আর বউটি? কি গো, চুপ ক'রে রইলে যে? উত্তর দিতে পারলে না? আচ্ছা, আমিই ব'লে দিই, সে তোমার গলার মালা, ঠোঁটের হাসি।

পুলিন কহিল, না রসকলি, হ'ল না, সে আমার গলার ফাঁসি। ঠাট্টা নয় রসকলি, একটা কথা তোমায় বলতে এসেছি, আমি কাল থেকে নিজের বাড়িতে যাব। ও বাড়িতে আর থাকব না।

নিজের বাড়ি অর্থে পুলিনের পৈতৃক বাড়ি। বাস্তব চক্ষে বাড়িটি একটি মূর্তিমন্ত বিভীষিকা, কিন্তু কল্পনায় বাড়িটি বেশ, অর্থাৎ উঠান-ভরা বনফুল, প্রাচীর ভাঙিয়া সীমা অসীমে মিশিয়াছে, ঘরের ভিতরেও চাঁদের আলো খেলে।

মঞ্জরী কহিল, বেশ, তা ভাল, তারপর খাবে কি ক'রে?

পুলিন চট করিয়াই কহিল, বোষ্টমের ছেলে, ভিক্ষে ক'রে খাব।

মঞ্জরী কহিল, আরও ভাল; কিন্তু ভিক্ষেতে মেলে তো চাল, তা রাঁধবে কে? বউকে নিয়ে যাও।

পুলিন প্রবল প্রতিবাদে মাথা নাড়িয়া কহিল, না।

মঞ্জরী কহিল, কেন? আর তুমি 'না' বললেও সে যদি না ছাড়ে?

পুলিন কহিল, ছাড়বে না? মারের চোটে ভূত ছাড়ে, তা জান? হুঁ হুঁ, কথায় আছে, 'পড়লে পরে দুধু ভাতু, না পড়লে ঠেঙার গুঁতু'।

মঞ্জরী কহিল, বেশ। রসকলি আমার বলে ভাল, এ যেন সেই—'ও পারেতে ধান পেকেছে লম্বা লম্বা শীষ, টুকুস ক'রে ম'রে গেল লঙ্কার রাবণ'। তা যেন হ'ল, আজ রাত্রের মত তো বাড়ি যাও।

পুলিন বলিল, না, আর নয়।

মঞ্জরী পরিহাস-ছলেই কহিল, তবে আজ রাতটা পাল-পুকুরের বটগাছেই কাটাবে নাকি?

পুলিন কহিল, না, তোমার দাওয়াতেই প'ড়ে থাকব।

মঞ্জরী হাসিল, দুই আর দুইয়ে চার হয়—এ কথাটা যে বুঝে না, সে চারের গুরুত্ব না বুঝিলে তাহার উপর রাগ করিয়া লাভ কি?

তবু সে বলিল, লোকে বলবে কি?

পুলিন বাহির-দরজার দিকে ফিরিল।

মঞ্জরী কহিল, যাও কোথা?

পুলিন কহিল, দেখি কোথাও—

মঞ্জরী আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া বলিল, যেতে হবে না, এস, শোবে এস।

পুলিন ব্যস্ত হইয়া বলিল, না না, লোকে বলবে কি?

মঞ্জরী কহিল, যা বলবার তারা তো ব'লেই নিয়েছে, আবার বলবে কি? শোন নি, আজই তোমার কাকা বললে, ওই—

পুলিন তাহার মুখ চাপিয়া ধরিয়া কহিল, তোমার পায়ে ধরি রসকলি, ছি, ও কথা তুমি ব'লো না।

মঞ্জরী হাসিয়া মৃদুস্বরে গান ধরিল—

'লোকে কয় আমি কৃষ্ণ-কলঙ্কিনী,
সখি, সেই গরবে আমি গরবিনী।'

পুলিন তাহার হাতখানা চাপিয়া ধরিল। স্পর্শে তাহার সে কি উত্তাপ! মঞ্জরী মৃদু আকর্ষণে হাতখানি ছাড়াইয়া শান্ত মধুর কণ্ঠে কহিল, ছাড়, বিছানা করি।

তকতকে ঘরখানি, লাল মাটি দিয়া নিকানো, আলপনার বিচিত্র ছাঁদে চিত্রিত; দেওয়ালে খান-কয়েক পট—সেই পুরানো গোরাচাঁদ, জগন্নাথ, যুগল-

মিলন; সবগুলির পায়ে চন্দনের চিহ্ন। মেঝের উপর একখানি তক্তাপোশ, এক দিকে পরিষ্কার বেদীর উপর ঝকঝকে বাসনগুলি সাজানো।

তক্তাপোশের উপর গুটানো বিছানা বিছাইয়া দিয়া একটি ছোট চৌকির উপর রক্ষিত তোলা বিছানার গাদা হইতে দেখিয়া দেখিয়া একখানা 'সিজনী' আনিয়া পুরাতন বিছানার উপর বিছাইয়া দিল। সিজনীটি মঞ্জরীর নিজের হাতে অতি যত্নে প্রস্তুত, চারুশিল্পের অপরূপ ছাঁদ বিচিত্রিত। বিছানাটি বেশ করিয়া কয়বার ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিয়া ডাকিল, এস।

পুলিন ঘরে আসিয়া তক্তপোশে বসিল। দেখিল, মঞ্জরী অভ্যাসমত ঈষৎ বাঁকিয়া দাঁড়াইয়া।—সেই হাসি, সেই সব; শুধু দৃষ্টিটুকু নূতন। সে তখন মুগ্ধ, আবিষ্ট. একাগ্র।

পুলিন কথা কহিল, ভাবটা গদ্‌গদ, কিন্তু সঙ্কুচিত. রসকলি!

মঞ্জরী চমক ভাঙিয়া কহিল, কি গো?

পুলিন কহিল, তুমি—তুমি—আমার—আমার—আমার—

কথাটা শেষ করিতে পারিল না, প্রতিবারই বাধিয়া যায়, আর পুলিন রাঙা হইয়া উঠে।

মঞ্জরী খিলখিল করিয়া হাসিয়া কহিল, তোমার—তোমার—তোমার—কি গো?

কৌতুকে গ্রীবা বাঁকাইয়া খানিকক্ষণ পুলিনের নত লজ্জিত মুখের উপর উজ্জ্বল দৃষ্টি হানিয়া সহসা মঞ্জরী তাহার মুখ পুলিনের কানের কাছে লইয়া গিয়া বলিল, আমি তো তোমারই গো।

কথাটা বলিয়াই সে চট করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল. চঞ্চল লঘু গতিতে, ছোট ত্বরিতগতি ঝরনাটির মতই। বাহিরে গিয়াই দরজাটা টানিয়া শিকল আঁটিয়া দিল। একরাশ দমকা দখিনা বাতাস আসিয়া যেন পুলিনকে তৃপ্ত করিয়া অন্তরকে দীপ্ত করিয়া আচমকাই চলিয়া গেল।

শিকল টানিয়া দিয়া আঁচলে চোখ মুছিতে মুছিতে ঢেঁকিশালায় আসিয়া মঞ্জরী আঁচল পাতিয়া শুইয়া পড়িল।

রাত্রিতে পুলিন আসে নাই, বেলা এক প্রহর হইয়া গেল, তবুও দেখা নাই। গোপিনী অপেক্ষায় বসিয়া ছিল, সহসা সে সব ঝাড়িয়া ফেলিয়া উঠিল, স্নান সারিয়া রান্না চড়াইল।

খুট করিয়া শব্দ হইল, ওই বুঝি আসিল! প্রবল অভিমানে ব্যগ্র দৃষ্টিকে

রান্নার কড়ায় সে নিবিষ্ট করিল, হাতের খুন্তি প্রয়োজনাতিরিক্ত অতি-বিক্রমে ঘুরিয়া উঠিল, খন—খন—খন।

এই বুঝি ডাকে, সাপিনী হে!

পোষা বিড়ালটা দাওয়ায় লাফাইয়া উঠিয়া ডাকিল, ম্যাও—ম্যাও—ম্যাও।

আর দৃষ্টি মানিল না, ফিরিল; কিন্তু কই? শূন্য অঙ্গন, ভেজানো বহির্দ্বার—মানুষের বার্তা তো দিল না।

হাতের খুন্তিটা সজোরে বিড়ালটার পিঠে হানিয়া গোপিনী গালি পাড়িল, বেরো. বেরো. বেরো, আপদ বেরো।

কতক্ষণ কাটিয়া গেল, গোপিনীর মনে হইল, বুঝি বা একটা যুগ।

সহসা বহির্দ্বার খুলিয়া বলাই আসিয়া দাওয়ায় বসিল। হাতের হুঁকা টানিতে টানিতে কহিল, শুনেছ মিতেনী, কাল রেতে মিতে যে মঞ্জরীর বাড়িতে—

বলাই পুলিনের মিতে তাই গোপিনীকে ডাকিত—মিতেনী, গোপিনী ডাকিত—মিতে।

গোপিনী কহিল. শুনি নাই, তবে জানি।

বলাই বলিল. আবার নিজের ঘর সাফ হচ্ছে, সেইখানেই থাকবে এ বাড়িতে থাকবে না।

একটা লজ্জা ঢাকিতে পাঁচটা লজ্জা মাথায় লইতে হয়। গোপিনী কহিল. আমিই যে থাকতে দেব না, সে আমি কাল ব'লে দিয়েছি, বাড়ি ঢুকলে ঝাঁটার বাড়ি দেব।

বলাই বিজ্ঞের মত মাথা নাড়িয়া বলিল, ও, তাই বুঝি এত! আবার মঞ্জরীকে পত্র করবে!

বুকে পাথর চাপা দিলেও মানুষ কাতরাইতে পারে, কিন্তু এই কথাটা এমন স্থানে গোপিনীকে আঘাত করিল যে, সে আর কথা কহিতে পারিল না।

বলাই কহিল, কাল রেতে জমিদার গাঁয়ে এসেছেন তুমি নালিশ কর।

গোপিনী দীপ্ত প্রতিবাদে কহিল, না।

তারপর উভয়ই নীরব; গোপিনীর হাতের খুন্তি নড়ে না, চোখ কড়ার উপর, কিন্তু দৃষ্টি নয়, পলকও পড়ে না।

বলাই মনে মনে কি যেন মক্স করিতেছিল, শেষে দালালির ভঙ্গীতে

রসান দিয়া কহিল, বেশ বলেছ. সেই ভাল, ও 'দুষ্টু গরুর চেয়ে শূন্য গোয়ালই ভাল'।

তারপর আবার হুঁকায় টান পড়িল—ফড়র ফড়র। একমুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া কহিল, আমাদের তো ছিঁড়লে মালা গাঁথতে আছে, ভাবনাই বা কি! ভাত থাকলে কি কাকের অভাব হয়, কি বল মিতেনী? আমি রয়েছি, সব ঠিক ক'রে দেব তোমার।

পরিশেষে সম্মতির আশায় মিতেনীর মুখপানে চাহিল।

মিতেনী কোন কথার উত্তর না দিয়া ঘরে ঢুকিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল। রান্না পুড়িতে লাগিল।

পুলিন কোদালি হাতে বাড়ি সাফ করিতেছিল। অনভ্যাসের ফোঁটায় কপাল চড়চড় করে, পুলিন ঘামিয়া যেন নাহিয়া উঠিয়াছে। হাত টাটাইয়া উঠিয়াছে. শিরদাঁড়া টনটন করিতেছে, তবু কাজ সারা চাই। স্ত্রীলোকের অন্নদাস, ছিঃ—তার বড় লজ্জা আর কি!

মিতে বলাই আসিয়া কহিল, ভ্যালা রে মিতে, তা ভাল।

পুলিন কোদালি নামাইয়া বলিল, কল্কেতে কিছু আছে? হুঁকো লয়, অশুচ আমার।

বলা কলিকাটা খসাইয়া পুলিনকে দিল। ধুতরো-ফুলি ছাঁদে হাত ফাঁদিয়া পুলিন টান মারিল, হুশ হুশ হু—শ।

বলাই কহিল. তা এক কাজ করলি না কেন মিতে? জমিদার এসেছেন, তাঁর কাছে পাড়লে একবার হ'ত না? তোর হ'ল সোদর খুড়ো. আর ওর সৎবাবা। ওয়ারিশ হ'লি তুই, ও মাগী সম্পত্তির কে? চল্ তু একবার, দেখবি, এখুনি তোর সম্পত্তি তোর হবে।

অদ্ভুত পুলিন, বিচিত্র তার সংসার-বোধ, সে কহিল, ওর কি হবে?

বলাই বলিল, তোর বউ—তুই খেতে দিবি।

পুলিন কহিল, না না, আমি যে রসকলিকে—

বলাই সোৎসাহে কহিল, রসকলিকে পত্র করবি, ও মরুকগে—যা মন করুকগে। তোর কি?

সে যে নেহাত অমানুষী হয়. হাজার হউক সে স্ত্রী। মনটা পুলিনের

মোচড় দিয়া উঠিল। পূর্বে তাহার সান্ত্বনা ছিল, তাহার প্রাপ্য ধনমূল্যে গোপিনীর নিকট মুক্তি পাইবার হকদার সে।

পুলিন বলিল, না মিতে, তা হয় না।

যেমন দেবা, তেমনই দেবী!—বলাই বিরক্তভাবে উঠিল, রাস্তা ধরিল জমিদারের কাছারির পানে।

পুলিন ভাঙা দাওয়াটার উপর ভাবিতে বসিল।

জমিদারের পশ্চিমা চাপরাসী আসিয়া ভাঙা কাঁসরের মত খনখন করিয়া কহিল, আরে পুলিয়া, আসো আসো, বাবুর তলব আসে।

পুলিন চমকাইয়া বলিল, ক্যানে, ক্যানে, কাহেসে দারোয়ানজী?

পশ্চিমা কহিল, সো হামি জানে না।

জমিদারের কাছারিতে পুলিন আসিয়া প্রণাম করিল।

বাবু ফরাসিতে তামাক টানিতেছিলেন, গোমস্তা কলম পিষিতেছে। কয়জন মাতব্বর এধারে বসিয়া ছিল, আর ওধারে এক পাশে আবক্ষ ঘোমটা টানিয়া দাঁড়াইয়া ছিল সংকুচিতা গোপিনী।

বাবু পুলিনের দিকে চাহিয়া কাছারিকে উদ্দেশ করিয়াই কহিলেন, সে হারামজাদী কই?

রাখাল পাইক বসিয়া ছিল, কহিল, আজ্ঞে, তিনি চানে গেল, আসছেন।

বাবু পুলিনকে বলিলেন, পুলিন, তোমার খুড়োর সম্পত্তি খারিজ করতে হবে।

পুলিন শশব্যস্তে কহিল, আজ্ঞে, সম্পত্তি আমার নয় ওরই।

জোড়হস্তে অঙ্গুলি-নির্দেশে গোপিনীকে দেখাইয়া দিল।

বাবু কহিলেন, ওই হ'ল হে, ওই হ'ল, স্বামী আর স্ত্রী। মুখ থাকতে নাকে ভাত খায় কে হে? আর তুমি থাকতে সম্পত্তির ও কে? ও সম্পত্তি পেলে কি ক'রে? কথা কও গো, চুপ ক'রে থাকলে চলবে না।

অগত্যা গোপিনী মৃদু কণ্ঠে বলিল, আজ্ঞে, তিনি আমায় দিয়ে গিয়েছেন।

বাবু কহিলেন, তোমাকেই তবে খারিজ করতে হবে, পাঁচশো টাকা লাগবে।

পুলিন বলিল, আজ্ঞে, ও মেয়েমানুষ—

বাবু ধমক দিয়া কহিলেন, তুই থাম্ বেটা। বল গো, তুমি বল। আবার চুপ করলে যে, উত্তর দাও, পাঁচশো টাকা চাই আমার।

পথভ্রান্তকে যে পথ দেখাইয়া দেয়, সেই পথেই সে চলে। কিংকর্তব্য-বিমূঢ়া গোপিনী পুলিনের কথা ধরিয়াই বলিল, আজ্ঞে, আমি যে মেয়েমানুষ—

বাবু কহিলেন, আরে, সম্পত্তি তো মেয়েমানুষ নয়। আচ্ছা, না পার, সম্পত্তি তুমি পুলিনকে ছেড়ে দাও।

পুলিন শশব্যস্তে বলিল, আজ্ঞে না।

গোপিনীও বলিল, আজ্ঞে না।

বাবু চটিয়া কহিলেন, আচ্ছা, তবে সম্পত্তি সদরে বাজেয়াপ্ত হবে। আর পুলিন, তুই বেটা ওই মঞ্জরীকে নিয়ে গাঁয়ে ঢলাঢলি করছিস কেন? ওসব হবে না, পরিবার নিয়েই থাকতে হবে।

অভিমান অনবুঝ, স্থানকাল-জ্ঞান নাই; পুলিন কিছু না বলিতেই গোপিনী মাথা নাড়িয়া বলিল, না।

প্রতিবাদে বাবু চটিয়া দীপ্ত কণ্ঠে কহিলেন চোপরাও হারামজাদী, ওই পুলিনকে নিয়েই তোকে থাকতে হবে।

গোপিনী আঁতকাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

ঠিক তখনই মঞ্জরী আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া কহিল, বাবু আমায় তলব করেছেন?

বাবু মুখ ফিরাইয়া আর কথা কহিতে পারিলেন না। সম্মুখে রসোচ্ছলা মেয়েটি—চূড়ার মত চুল বাঁধা নাকে রসকলি আঁকা, মুখে মিষ্ট হাসি, গালে দুইটি ঈষৎ টোল। মঞ্জরীকে দেখিয়া ক্ষণেক তাঁহার কথা সরিল না।

মঞ্জরী পুনরায় বলিল, হুজুর!

চমক ভাঙিয়া বাবু কহিলেন হ্যাঁ, এস।—শুনছ গো, ওসব চলবে না, পুলিনের সঙ্গেই ঘর করতে হবে।

শেষটা কহিলেন গোপিনীকে। কথার নির্দেশে মঞ্জরীর দৃষ্টি পড়িল ভয়ত্রস্তা গোপিনীর উপর, সে ত্বরিতপদে নিকটে গিয়া গোপিনীকে কাছে টানিয়া লইল।

আশ্বাস লোকে কথাতেও পায় দৃষ্টিতেও পায়, স্পর্শেও পায়; গোপিনী মঞ্জরীকে জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, রসকলি!

উজ্জ্বল হাসিতে মঞ্জরীর মুখখানি দীপ্ত হইয়া উঠিল, বলিল, ভয় কি রসকলি?

বাবু পুনরায় কহিলেন, বুঝলে. এই আমার হুকুম। উত্তর দাও, রাজি কি না? শুনছিস পুলিন?

পুলিন, গোপিনী উভয়েই নীরব। উত্তর দিল মঞ্জরী, তেমনই হাসিয়া, হুজুর, স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া কি ধমকে মেটে?

বাবু কহিলেন. আলবাৎ মিটবে, না মিটলে চলবে না।

মঞ্জরী বলিল. নাই যদি মেটে হুজুর, তাই বা কি? আমরা জাতে বোষ্টম, ছিঁড়লে মালা আমরা নতুন গাঁথি।

বাবু কহিলেন. বেশ, তবে ও বলাকে পত্র করুক।

ওপাশে বসিয়া বলা মুচকি হাসিল।

গোপিনী প্রবল প্রতিবাদে বলিল, না, না!

বাবু কহিলেন. তবে কি মতলব শুনি? কিন্তু আমার রাজ্যে ওসব বদমায়েশি চলবে না।

পুলিন কি একটা প্রতিবাদ করিল, কিন্তু এত ক্ষীণ যে, কাহারও খেয়ালে আসিল না। সে নড়িয়া-চড়িয়া বসিল, যেন স্থৈর্য আর থাকে না। গর্তের সাপ ধরা পড়িবার পূর্বে যেমনতর বাহির হইতেও পারে না, অথচ ক্রোধে গর্তের ভিতরে কুণ্ডলী পাকাইয়া যেমন ঘোরে, তেমনই ভাবেই তাহার মনটা পাক খাইতেছিল।

মঞ্জরী কিন্তু বেশ সবিনয়ে সবল প্রতিবাদ করিল, জিব কাটিয়া সে বলিল, ছি ছি, বাবু, আপনাকে ওসব কথা বলতে নাই।

বাবু অপ্রস্তুত হইয়া মঞ্জরীকে ধমক দিয়া কহিলেন, আচ্ছা আচ্ছা। তোমারও এখানে থাকা চলবে না, পাঁচজনে তোমার নামে পাঁচ কথা বলছে, তোমায় গ্রাম ছেড়ে যেতে হবে।

মঞ্জরী সবিনয়ে বলিল, আজ্ঞে, কোথায় যাব? মেয়েমানুষ আমি—

বাবু তাহার মুখপানে চাহিয়া কহিলেন, আচ্ছা আমার সঙ্গে চল তুমি, আমার বাড়িতে থাকবে।

মঞ্জরী বলিল, আজ্ঞে, ঝি-গিরি আমি করতে পারব না।

বাবু কহিলেন, আচ্ছা, কাজ তোমায় করতে হবে না।

মঞ্জরী হাসিয়া বলিল, বাপ রে! রাণীমা তা হ'লে ভাত দেবেন কেন?

বাবু এবার বেশ রস দিয়া কহিলেন, সে ভাবনা তোমায় ভাবতে হবে না। আমাদের বাগানে তোমার কুঞ্জ ক'রে দেব, এখানে যেমন আছ তেমনই থাকবে।—

বলিয়া বাবু হাসিলেন, হাসিটি গেঁজলা রসের মত, কেমন যেন বিশ্রী, কুৎসিত গন্ধের আভাস দেয়।

মঞ্জরী কহিল, আমার পোড়ার মুখকে কি আর বলব!—সত্যি সত্যিই এ মুখে আগুন দিতে হয়। আপনি রাজা, আপনিও শেষ–! না হুজুর, আমি এ গাঁ ছেড়ে কোথাও যাব না. সে যে যা বলবে, বলুক।

বাবু মেয়েটার স্পর্ধা দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলেন, সহসা তিনি উন্মত্তের মত চীৎকার করিয়া কহিলেন, কেয়া হারামজাদী? ভূতসিং, লাগাও জুত্তি হারামজাদীকো।

বন্ধ লৌহদ্বার মত্ত হস্তীও ঠেলিয়া খুলিতে পারে না, আবার অর্গল খুলিলে আঘাতের অপেক্ষাও সয় না, খুলিয়া যায়। পুলিনের মনের দরজার ঠিক অর্গলটিতে হাত পড়িতেই সে খুলিয়া গেল, ভিতরের মানুষটি বাহিরে আসিল, সে একটা ভীষণ দাপে হাঁকিয়া উঠিল, খবরদার!

রাখাল পাইকের শিথিল মুষ্টির লাঠিগাছটা কাড়িয়া লইয়া মাটিতে ঠুকিয়া পুলিন বুক ফুলাইয়া দাঁড়াইল।

ব্যাপারটা গড়াইত কতদূর কে জানে. কিন্তু লোকে ব্যাপারটা গোটা বুঝিতে না বুঝিতে মঞ্জরী ত্বরিতপদে পুলিন ও গোপিনীর হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া বাহির হইয়া গেল।

স্তম্ভিত ভাবটা কাটিতেই বাবু কহিলেন, ভূতসিং!

বলা মৃদুকণ্ঠে কহিল, হুজুর, ওই মঞ্জরীর সঙ্গে গোকুলবাটীর থানার দারোগার পরিবারের সঙ্গে খুব সুখ, একটু বুঝে—

বলার কথাটা ঢাকিয়া দিয়া লাঠি হস্তে ভূতসিং ঘ্যানঘ্যান করিয়া বলিল. হজৌর, হুকুম!

বাবু কহিলেন, কুছ নেহি, যাও।

মঞ্জরী দুইজনের হাত ধরিয়া আসিয়া উঠিল একেবারে রামদাসের বাড়িতে। সারাটা পথ সে যেন কি ভাবনায় ভোর হইয়া ছিল;—ভাবনা বলিলে ঠিক হয় না. সে যেন একটা আবেশ, একটা নেশা।

বাড়িতে প্রবেশ করিয়াই মঞ্জরী দরজাটা বন্ধ করিয়া দিয়া, একগাছা মোটা লাঠি আনিয়া পুলিনের হাতে দিয়া খিলখিল করিয়া হাসিয়া বলিল, বাইরে ব'স পাহারাওলা।

পুলিন লাঠি হাতে বাহিরে বসিল, আর ঘরের মেঝেতে বসিয়া নীরবে চোখের জল ফেলিতেছিল দুইটি নারী। গোপিনী নত দৃষ্টিতে, আর মঞ্জরী তাহার মুখের পানে চাহিয়া যেন নেশায় ভোর হইয়া বসিয়া ছিল।

সহসা হাসিয়া সে কহিল, রসকলি!

গোপিনী মুখ তুলিয়া হাসিল, বড় বিষাদের হাসি, যেন মলিন ফুলটি।

মঞ্জরী বলিল, এক কাছারি লোকের সামনে রসকলি পাতিয়েছ, 'না' বললে তো চলবে না।

গোপিনী কহিল, হ্যাঁ।

মঞ্জরী বলিল, তা ভাই, অনুষ্ঠানটা হয়ে যাক, তুমি আমার নাকে রসকলি এঁকে দাও, আমি তোমার দিই,—যা নিয়ম তা তো করতে হবে।—বলিয়াই খুঁজিয়া পাতিয়া সব সরঞ্জাম বাহির করিয়া তিলকমাটি ঘষিতে বসিল।

তারপর গোপিনীর কোল ঘেঁষিয়া বসিয়া কহিল, তুমি ভাই, আগে বলেছ, আগে তোমার পালা। দাও, আমার নাকে রসকলি এঁকে দাও।—বলিয়া নিজের আঁকা রসকলিটি মুছিয়া ফেলিল।

হতভম্ব গোপিনী কম্পিত করে মঞ্জরীর নাকে রসকলি আঁকিয়া দিল।

মঞ্জরী বলিল, দাঁড়াও, সাক্ষী ডাকি।—বলিয়া বাহিরে পুলিনকে ডাকিল, সেই মধুভরা কণ্ঠ, রসকলি, এস, বলি।

পুলিনকে লইয়া গোপিনীর হাতে হাতে নিজের হস্তবন্ধনে বাঁধিয়া দিয়া কহিল, এই নাও রসকলি, আমার রসকলি তোমায় দিলাম।

পুলিনের কথা সরিল না।

তারপর পুলিনকে বলিল, আমি দিচ্ছি, 'না' ব'লো না।

গোপিনী ও পুলিন বিস্মিত নির্বাক।

সহসা গোপিনী মঞ্জরীর হাত ধরিয়া টানিয়া বলিল, না না, তুমি সুদ্ধ এস, আমরা দু বোনে--

রসোচ্ছলা রসোচ্ছলার মতই কহিল, দূর, আমি যে রসকলি!

বৈকালের মুখে মঞ্জরী কহিল, দাঁড়াও, আমি একবার গাঁয়ের হালচাল দেখে আসি।

পুলিন বাধা দিয়া কহিল, সে কি! একলা?

মঞ্জরী হাসিয়া ঢলিয়া পড়িল, বলিল, ভয় কি! আমার রসকলি যে সঙ্গে।

—বলিয়া নাকের রসকলি দেখাইয়া দিল। তারপর আবার কহিল, ভয় নাই, আমি বাইরে বাইরে খবর নেব, তেমন তেমন বুঝলে আমি গোকুলবাটী থানায় যাব। আজ রাত্রে না ফিরতেও পারি, বুঝলে? খবরদার, তোমরা বেরিও না, দিব্যি রইল, মাথা খাও।

সে কণ্ঠস্বরে পরিহাসের বিন্দুও ছিল না, পুলিন সে কথা অবহেলা করিতে পারিল না।

মঞ্জরী চলিয়া গেল, রাত্রে ফিরিল না।

পরদিন প্রাতে বলাই আসিয়া ডাকিল, মিতে!

মঞ্জরীর সংবাদের আশায় নিজের বিপদের আশঙ্কা তুচ্ছ করিয়া দরজা খুলিয়া কহিল, এস।

বলাই বলিল, বেশ বেশ, তা মঞ্জরীকে দিয়ে টাকাটা পাঠালি কেন? নিজে গেলেই তো হ'ত। তা ও বেশ ভালই হ'ল। বাবুও বললেন, বলাই, পুলিন যখন পঞ্চাশ টাকা জরিমানাই দিলে, তখন আর তার ওপর রাগ নাই আমার। তা পুলিন বোধ হয় ভয়ে আসে নাই, তাই মঞ্জরীকে দিয়ে পাঠিয়েছে। মঞ্জরীকেও মাপ হয়ে গিয়েছে। তা একবার আজ যাস, বাবুকে পেন্নাম ক'রে আসিস। ভয় নাই, আমিও সব ব'লে ক'য়ে দিয়েছি।

পুলিনের কথা সরিল না।

জমিল না দেখিয়া বার-কয়েক হুঁকা টানিয়া বলাই চলিয়া গেল। পুলিন স্তম্ভিতের মত দাঁড়াইয়া রহিল, কে জানে—কতক্ষণ! একটি পুঁটলি কাঁখে মঞ্জরী আসিয়া হাসিমুখে অভ্যাসমত হেলিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়া ডাকিল, রসকলি!

পুলিন কথা কহিল না।

হাসিয়া মঞ্জরী বলিল, রসকলি, রাগ করেছ?

পুলিন অভিমানভরে বলিল, তুমি জমিদারকে—

মঞ্জরী কহিল, জলে বাস ক'রে কুমিরের সঙ্গে বাদ করা কি চলে গো? তাই মিটিয়ে ফেললাম।

পুলিন কহিল, টাকা—?

মঞ্জরী কথা কাড়িয়া বলিল, সে তো তোমারই গো, আমি কি তোমার পর?

তারপর পুলিনের হাত দুইটি ধরিয়া কহিল, তবে আসি।

উদ্‌ভ্রান্তের মত পুলিন বলিল, কোথায়?

মঞ্জরী কহিল, বৃন্দাবন।

পুলিন অভিমান করিয়া বলিল, রসকলি!

মঞ্জরী কহিল, আমি তো তোমারই গো।

গোপিনী দ্বারের পিছনে ছিল, সম্মুখে আসিয়া যেন দাবি করিল, না, যেতে পাবে না।

মঞ্জরী বলিল, তীর্থের সাজ খুলে কুকুর হব?

গোপিনী কহিল, বল তবে, ফিরে আসবে?

মঞ্জরী বলিল, আসব।

গোপিনী কহিল, আসবে? দেখো।

উত্তর না দিয়া মঞ্জরী হাসিয়া পুঁটলিটি তুলিয়া লইয়া রাস্তায় নামিয়া পড়িল। বিচিত্র সে হাসি, রহস্যের মায়া-মাধুরীতে ভরা, কে জানে তার অর্থ।

চলিতে চলিতে গান ধরিল—

"লোকে কয় আমি কৃষ্ণ-কলঙ্কিনী;
সখি, সেই গরবে আমি গরবিনী গো
আমি গরবিনী।"

নাকে তাহার রসকলি, মুখে তাহার হাসি, চলনে সে কি হিল্লোল, রসধারা যেন সর্বাঙ্গ ছাপাইয়া ঝরিতেছিল।

না রী ও না গি নী

ইটের পাঁজা হইতে খোঁড়া শেখ ইট ছাড়াইতেছিল। খোঁড়া শেখের নাম যে কি, তাহা কেহ জানে না; বোধ করি খোঁড়ার নিজেরও মনে নাই। কোন্ শৈশবে তাহার বাঁ পাখানি ভাঙার পর হইতেই সে খোঁড়া নামেই চলিয়া আসিতেছে। শুধু পাখানি তাহার খোঁড়া নয়, যৌবনে কদাচারের ফলে কুৎসিত ব্যাধিতে খোঁড়ার নাকটা বসিয়া গিয়াছে, সেখানে দেখা যায় শুধু একটা বীভৎস গহ্বর। তারপর হয় তাহার বসন্ত. সেই বসন্তের দাগে কুৎসিত খোঁড়া দেখিতে ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিয়াছে।

আপনার মনেই খোঁড়া ইট ছাড়াইতেছিল!

অদূরে অদাই ওরফে ওয়াহেদ শেখ গাড়ি লইয়া আসিতেছিল। গোরু দুইটার লেজ দুমড়াইয়া সে গান ধরিয়া দিল—একটা অশ্লীল গান। কিন্তু অকস্মাৎ তাহার তালভঙ্গ হইয়া গেল। গোরু দুইটা হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। অদাই একটা ঝাঁকানি খাইয়া গান ছাড়িয়া বলিয়া উঠিল, শালার গোরু, কিছু না বলেছি—

প্রচণ্ড ক্রোধে পাঁচন-ছড়িটা সে তুলিল গোরু দুইটার অবাধ্যতার শাস্তি দিতে। গোরু দুইটাও ক্রমাগত ফোঁস-ফোঁস করিয়া গর্জন করিতেছিল। অদাইয়ের কিন্তু প্রহার করা হইল না. সে চীৎকার করিয়া উঠিল, খোঁড়া খোঁড়া, সাপ—সাপ!

অদাইয়ের গাড়ির সম্মুখেই একটি কিশোর সাপ ফণা তুলিয়া অল্প অল্প দুলিতেছিল। অদাই গাড়ি হইতে লাফাইয়া পড়িয়া একটা ইট উঠাইল।

ওদিক হইতে খোঁড়া খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে ছুটিতেছিল, সে বলিয়া উঠিল, মারিস না অদাই, মারিস না। যাই, আমি যাই।

অদাইয়ের হাতের ইট তোলাই রহিল, সে বলিল, কি বাহারের সাপ মাইরি! মুখখানা সিঁদুরের মত টকটকে লাল। মাথার চক্করই বা কি বাহারের! কিন্তু পালাল—পালাল যে, শিগগির আয়।

সাপটা এইবার দ্রুতবেগে পলাইয়া যাইতেছিল। কিন্তু চলিয়াছিল খোঁড়ার

দিকেই, অদাইকে পিছনে ফেলিয়া পলায়নই তাহার উদ্দেশ্য। খোঁড়াকে সে দেখে নাই।

খোঁড়া হাঁকিল, দে তো অদাই, তোর পাঁচনখানা ছুঁড়ে। যাঃ সে, ঢুকে পড়ল পাঁজার ভেতর। উদয়নাগ রে সাপটা, এ সাপ বড় পাওয়া যায় না। ধরতে পারলে কিছু রোজগার হত রে।

খোঁড়া সাপের ওঝা। শুধু ওঝা নয়, সাপ লইয়া খেলাও সে করে। ঘরের চালের কানাচে বড় বড় মুখ-বন্ধ হাঁড়ি তাহার খাটানোই আছে। তাহারই মধ্যে সাপগুলোকে সে বন্দী করিয়া রাখে। জীর্ণ হইলে দূরে মাঠে গিয়া তাহাদের ছাড়িয়া দিয়া আসে। কত সাপ মরিয়াও যায়। সাপ যখন থাকে, তখন খোঁড়া মজুর খাটে না। তখন দেখা যায়, বিষম-ঢাকি ও তুবড়ি-বাঁশি লইয়া খোঁড়া সাপের খেলা দেখাইতে চলিয়াছে। রোজগারও মন্দ হয় না। কিন্তু গাঁজা-আফিঙের বরাদ্দ তখন বাড়িয়া যায়। কখনও কখনও মদও চলে। ফলে সাপগুলি শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে খোঁড়া আবার ঝুড়ি ও বিড়া লইয়া বাহির হয়। অবস্থাপন্ন গৃহস্থের দ্বারে দ্বারে বীভৎস মুখখানি ঈষৎ বাড়াইয়া বলে, মজুর খাটাবে গো—মজুর?

তোশামোদ করিয়া সে হাসে, বীভৎস ভয়ঙ্কর মুখ আরও বীভৎস আরও ভয়ঙ্কর হইয়া উঠে; মজুরি মিলিলে সে প্রাণপণে খাটে, সেখানে সে ফাঁকি দেয় না। যেদিন না মেলে, সেদিন ঝুড়ি কাঁধেই ভিক্ষা আরম্ভ করে। যাহা পায়, তাই দিয়াই খানিকটা গাঁজা-আফিং কেনে। কিনিয়াও যদি কিছু থাকে, তবে খানিকটা পচাই-মদ গিলিয়া বাড়ি ফিরিয়া জোবেদা বিবির পা ধরিয়া কাঁদিতে বসে, বলে, আমাব হাতে পড়ে তোর দুর্দশার আব সীমা থাকল না। না খেতে দিয়ে মেরে ফেললাম।

জোবেদা হাসিতে হাসিতে স্বামীর মাথায় হাত বুলাইয়া বলে, লে—লে, খেপামি করিস না, ছাড় আমাকে—দুটো চাল দেখে আনি।

খোঁড়ার কান্না বাড়িয়া যায়, সে একবার জোবেদার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলে, এক জেরা লতুন কানি কখন দিতে লারলাম। পুরানো তেনা পরেই তোর দিন গেল।

যাক ওসব কথা। পরদিন অতি প্রত্যূষে খোঁড়া ইটের পাঁজাটার কাছে আসিয়া হাজির হইল। হাতে ছোট একটা লাঠি। বগলে একটা ঝাঁপি। সম্মুখে পূর্ব-দিকচক্রবালে সবে রক্তাভা দেখা দিতে শুরু করিয়াছে। গাছের

বুকের মধ্যে বসিয়া পাখিরা মুহুর্মুহু কলরব করিতেছিল। গ্রামের মধ্যে কোন্ হিন্দু দেব-মন্দিরে মঙ্গলারতির শঙ্খ-ঘণ্টা বাজিতেছে। একটা উঁচু ঢিবির উপর বসিয়া খোঁড়া চারিদিকে সতর্ক তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিতেছিল।

পূর্বাচলের রাঙা রঙ ক্রমশ গাঢ় হইয়া পরিধিতে বিস্তৃতি লাভ করিতেছিল। সে রঙের আভায় পাঁজার পোড়া ইটগুলো আরও রাঙা হইয়া উঠিল। খোঁড়ার ময়লা কাপড়খানায় পর্যন্ত লাল রঙের ছোপ ধরিয়া গিয়াছে। খোঁড়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

ওই—ওই না?

ঈষদ্দূরের প্রান্তরের বুকে বোধহয় সেই কিশোর সাপটিই পূর্বাকাশের দিকে মুখ তুলিয়া ফণা নাচাইয়া খেলা করিতেছিল। প্রাতঃসূর্যের রক্তাভায় তাহার রঙ দেখাইতেছিল যেন গাঢ় লাল। সেই লাল রঙের মধ্যে ফণার ঘন কালো চক্রচিহ্ন অপূর্ব শোভায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। প্রজাপতির রাঙা পাখার মধ্যে কালো বর্ণলেখার মতই সে মনোরম। খোঁড়া মুগ্ধ হইয়া গেল। আপনার মনেই মৃদুস্বরে সে বলিয়া উঠিল. বাঃ!

তারপর ধীরে ধীরে অগ্রসর হইল। সর্পশিশু উদীয়মান সূর্যের অভিনন্দনে এত মাতিয়া উঠিয়াছিল যে, খোঁড়ার পদশব্দেও তাহার খেলা ভাঙিল না। অতি সন্নিকটে আসিতেই সে সচকিত হইয়া মুখ ফিরাইল। পর-মুহূর্তে সে গর্জন করিয়া ছোবল মারিল। কিন্তু ফণা আর সে তুলিতে পারিল না। খোঁড়া ক্ষিপ্রহস্তে বাঁ হাতের লাঠিখানি দিয়া তখন তাহার মাথা চাপিয়া ধরিয়াছে। ডান হাতে সাপের লেজ ধরিয়া গোটা-দুই ঝাঁকি দিয়া খোঁড়া বেশ করিয়া সাপটাকে দেখিয়া বলিল, সাপিনী।

মাস ছয়েক পর। গাঁজার দোকান হইতে ফিরিয়া খোঁড়া জোবেদাকে বলিল, কি এনেছি দেখ্।

উঠানে ঝাঁটা বুলাইতে বুলাইতে জোবেদা বলিল, কি?

কাপড়ের খুঁট খুলিয়া খোঁড়া ছোট চিকচিকে একটি বস্তু বাহির করিয়া হাতের তালুর উপর রাখিয়া জোবেদাব সম্মুখে ধরিল। বস্তুটি ছোট একটি মিনি—নাকে পরিবার অলঙ্কার।

জোবেদা প্রশ্ন করিল, এত ছোট মিনি কি হবে?

হাসিয়া খোঁড়া বলিল, বিবিকে পরিয়ে দেব।

জোবেদা অবাক হইয়া গেল, হাসিতে হাসিতে খোঁড়া ঘরে প্রবেশ করিল। তারপর গলায় একটি সাপ জড়াইয়া বাহির হইয়া আসিল। সেই সাপটি। এতদিনে আরও একটু বড় হইয়াছে। কিন্তু সে তেজ নাই। শান্ত আক্রোশহীন-ভাবে ধীরে ধীরে মুখটি ঈষৎ তুলিয়া খোঁড়ার গলায় কাঁধে ফিরিতেছিল। জোবেদা বলিল, দেখ, ও কোরো না। যতই তেজ না থাক্, ও-জাতকের বিশ্বেস নাই।

হাসিয়া খোঁড়া বলিল, বিশ্বেস নাই ওদের বিষ-দাঁতকে। নইলে ওরাও তো ভালবাসে জোবেদা। বিষ-দাঁতই নাই, কিন্তু আর দাঁত তো রয়েছে, কই, আমাকে তো কামড়ায় না। কেমন ভাল মেয়ের মত বিবি আমার ফিরছে বল্ দেখি!—বলিয়া সে সাপটির ঠোঁট দুইটি চাপিয়া ধরিয়া তাহার মুখে একটা চুমা খাইয়া বসিল।

জোবেদা বিস্মিত হইল না, কারণ এ দৃশ্য তাহার নিকট নূতন নয়। কিন্তু সে বিরক্তিভরে বলিল, ছি ছি ছি! তোমার কি ঘেন্না-পিত্তিও নাই। কতবার তোমাকে বারণ করেছি, বল তো?

সে কথায় খোঁড়া কানই দিল না। সে বলিল, দেখ্ দেখ্, কেমন আমার হাতটা জড়িয়ে ধরেছে, দেখ দেখি। জানিস, সাপিনী আর সাপে যখন খেলা করে, তখন ঠিক এমন করে জড়াজড়ি করে ওরা। দেখেছিস কখনও? আঃ, সে যে কি বাহারের খেলা, মাইরি!

জোবেদা বলিল, দেখে আমার কাজ নাই, তুই দেখেছিস সেই ভাল! কিন্তু তোর খেলাও ওই শেষ করবে, তা বুঝি।

খোঁড়া তখন একটা সূচ লইয়া বিবির নাক ফুঁড়িতে বসিয়াছে। পায়ের আঙুল দিয়া সাপটার লেজ চাপিয়া ধরিয়াছে, আর বাঁ হাতে চাপিয়া ধরিয়াছে মুখটা। ডান হাতে সূচ ধরিয়া নাক ফুঁড়িয়া মিনি পরাইয়া দিয়া সাপটাকে ছাড়িয়া দিল। যন্ত্রণায় ক্রোধে গর্জন করিয়া বিবি বারংবার খোঁড়াকে ছোবল মারিতে আরম্ভ করিল। ঝাঁপির ডালাটা ঢালের মত সম্মুখে ধরিয়া বিবির আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে করিতে সে বলিল, রাগ করিস না বিবি, রাগ করিস না। দেখ তো কেমন খুবসুরত লাগছে তোকে। দে তো জোবেদা, আয়নাটা দে তো? দেখুক একবার নিজের চেহারাখানা।

জোবেদা বলিল, লারব আমি।

দে দে, তোর পায়ে পড়ি, একবার দে। দেখি না নিজের চেহারা দেখে ও কি করে!

জোবেদা স্বামীর এ অনুনয় উপেক্ষা করিতে পারিল না। সে আয়না আনিবার জন্য ঘরে প্রবেশ করিল।

খোঁড়া বলিল, একজেরা সিনুর আনিস তো মেহেরবানি করে।

জোবেদা ঘর হইতেই প্রশ্ন করিল, কি, হবে কি?

পরম কৌতুক হাস্য করিয়া খোঁড়া বলিল, দেখবি, কি হবে। আগে হতে বলছি না।

জোবেদা আয়না সিঁদুর লইয়া আসিয়া ঈষদ্দূরে নামাইয়া দিল। খোঁড়া সুকৌশলে বিবিকে ধরিয়া একটি কাঠির ডগায় সিঁদুর লইয়া সাপটির মাথায় একটি লাল রেখা আঁকিয়া দিল। তারপর হা-হা করিয়া হাসিয়া বলিল, ওয়াকে আমি নিকা করলাম জোবেদা, ও তোর সতীন হল।

পরে বিবিকে বলিল, দেখ্ দেখ্ বিবি, কি বাহার তোর খুলেছে দেখ দেখি! সাপটাকে ছাড়িয়া দিয়া সে আয়নাটা বিবির সম্মুখে ধরিল। তারপর বিষম-ঢাকিটা বাজাইয়া কর্কশ অনুনাসিক স্বরে গান ধরিল—

জানি না গো এমন হবে—
গোকুল ছাড়িয়া কেষ্ট মথুরা যাবে
ও জানি না গো—

আরো মাস কয়েক পর।

বর্ষার মাঝামাঝি একটা দুরন্ত বাদলা করিয়াছে। খোঁড়া কোথায় গিয়াছে, বাদলে দুর্যোগে ফিরিতে পারে নাই। জোবেদা অনুভব করিল, ঘরের মধ্যে কেমন একটা গন্ধ উঠিতেছে--গন্ধটা ক্ষীণ, কিন্তু মিষ্ট এবং কেমন রকমের! এদিক ওদিক ঘুরিয়াও সে কিছু বুঝিতে পারিল না।

দিন দুই পরে খোঁড়া ফিরিল, জলের দেবতাকে একটা অশ্লীল গালি দিয়া বলিল, কিছু খেতে দে দেখি জোবেদা, বড় ভুখ লেগেছে।

জোবেদা ঘরের মধ্যে একটা থালায় পান্তাভাত বাড়িয়া দিল। পায়ের কাদা ধুইয়া খোঁড়া ঘরে ঢুকিয়াই বলিল, গন্ধ কিসের বল দেখি জোবেদা?

জোবেদা বললে, কে জানে বাপু, ক-দিন থেকেই ঘরে এমনই গন্ধ উঠছে।

খোঁড়া কথা কহিল না, সে শুধু ঘন ঘন শ্বাস টানিয়া গন্ধটার স্বরূপ নির্ণয়ের চেষ্টা করিতেছিল। এদিক ওদিক ঘুরিয়া বিবির ঝাঁপির কাছে দাঁড়াইল। মানুষের পদশব্দে ঝাঁপির ভিতর নাগিনীটা গর্জন করিয়া উঠিল।

খোঁড়া বলিল, হুঁ।

জোবেদা ঔৎসুক্যভরে প্রশ্ন করিল, কি বল দেখি?

খোঁড়া বলিল. বিবির গায়ের গন্ধ। সাপিনী তো, সাপের সঙ্গে দেখা হবার সময় হয়েছে, তাই। ওই গন্ধেই সাপ চলে আসে।

জোবেদা অবাক হইয়া গেল। বলিল, কে জানে বাপু, তোদের কথা তোদেরই ভাল। নে, এখন পান্তি কটা খেয়ে ফেল।

ভাত খাইতে খাইতে খোঁড়া বলিল, ওটাকে ছেড়ে দিয়ে আসতে হবে মাঠে। এ সময় ধরে রাখতে নাই।

একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সে কথাটা শেষ করিল।

জোবেদা পরম আশ্বাসের একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, সেই ভাল বাপু, ওটাকে আমি দুচক্ষে দেখতে পারি না। এত সাপ মরে, ওটা মরেও না তো!

ভাত খাইয়া খোঁড়া ঝাঁপি হইতে বিবিকে বাহির করিল। মুখটি চাপিয়া ধরিয়া সে আদরের কথা কহিল।

জোবেদা বলিল, এই দেখ, কদিন ওকে কামানো হয় নাই, ওর দাঁত গজিয়েছে। আর মায়াই বা কেন বাপু? যা না, ওকে ছেড়ে দিয়ে আয়।

খোঁড়া বলিল, দেখ দেখ, কেমন আমার হাতটা জড়িয়ে ধরেছে, দেখ।

অপরাহ্ণে খোঁড়া বিমর্ষ হইয়া বসিয়া ছিল। বিবিকে পার্শ্বের জঙ্গলটায় ছাড়িয়া দিয়াছে। জোবেদা বলিল, এমন করে বসে কেন বল্ তো? গাঁজা-টাজা খা কেনে।

খোঁড়া কহিল. বিবির লেগে মন কি করছে রে!

জোবেদা হাসিয়া বলিল, মর্ মর্। তোর কথা শুনে কি হয় আমার—

না রে জোবেদা. মনটা ভারি খারাপ করছে।

জোবেদা এবার স্বামীর পাশে বসিয়া আদর করিয়া গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, কেন রে, আমাকে তোর ভাল লাগে না?

সাদরে তাহাকে চুম্বন করিয়া খোঁড়া বলিল, তোর জোরেই তো বেঁচে রইছি জোবেদা। তু হামার জানের চেয়ে বেশি।

জোবেদা বলিয়া উঠিল, দেখ্ দেখ্, বিবি ফিরে এসেছে। ওই দেখ—নালার মধ্যে!

জলনিকাশী নালার মধ্যে সত্যই বিবি ফণা তুলিয়া বেড়াইতেছিল।

খোঁড়া উঠিতে চেষ্টা করিয়া বলিল, ধরে আনি, দাঁড়া।

জোবেদা স্বামীকে প্রাণপণে চাপিয়া ধরিয়া বলিল, না।

তারপর কর্কশ কণ্ঠে বলিল, বেরো—হেট, হেট।

বাঁ হাতে করিয়া একখানা ঘুঁটে ছুঁড়িয়া সে বিবিকে মারিল। সাপটা সক্রোধে মাটির উপর কয়টা ছোবল মারিয়া ধীরে ধীরে নালা দিয়া বাহির হইয়া গেল।

তখন রাত্রি দ্বিপ্রহর বোধ হয়, জোবেদা চীৎকার করিয়া উঠিল, ওঠ্, ওঠ্, কিসে আমায় কাটলে!

খোঁড়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া আলো জ্বালিয়া দেখিল, সত্যই জোবেদার বাঁ পায়ের আঙুলে এক ফোঁটা রক্ত জলবিন্দুর মত টলমল করিতেছে।

জোবেদা আবার চীৎকার করিয়া উঠিল, বিবি—তোর বিবি আমাকে কেটেছে, ওই দেখ্।

একটা হাঁড়িতে বেড় দিয়া নাগিনী ধীরে ধীরে চলিয়াছিল। খোঁড়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া সাপটাকে ধরিয়া ঝাঁপিতে বন্দী করিয়া বলিল, জোবেদা যদি না বাঁচে, তবে তোকেও শেষ করব আমি।

জোবেদা কিন্তু বাঁচিল না। সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাহার দেহে মৃত্যুর লক্ষণ প্রকাশ পাইল। মাথার চুল টানিতেই খসখস করিয়া উঠিয়া আসিল। ওঝারা চলিয়া গেল। বীভৎস ভয়ঙ্কর মুখ সকরুণ করিয়া শিয়রে খোঁড়া বসিয়া রহিল।

একজন ওস্তাদ বলিল, তুইও যেতিস খোঁড়া, খুব বেঁচে গিয়েছিস। ভারি আক্রোশ ওদের, হয়তো তোকে কামড়াতেই এসেছিল।

সাশ্রুনেত্রে খোঁড়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না।

খোঁড়া ফকির লইয়াছে। তাহার ভিটাটা একটা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইয়া গিয়াছে। খোঁড়ার বাড়ির পাশ দিয়াই একটা পায়ে-চলা পথ ছিল, সে পথ এখন বন্ধ, সেদিক দিয়া এখন কেহ হাঁটে না। বলে, বড় সাপের ভয়। সাপগুলা বড় খারাপ সাপ—উদয়নাগ। প্রত্যূষে সূর্যোদয়ের সময়ে দেখা যায়, রাঙা রঙের সাপ ফণা দুলাইয়া খেলা করিতেছে।

বিবিকে খোঁড়া বধ করিতে পারে নাই। তাহাকে সে ছাড়িয়া দিয়াছিল। বলিয়াছিল, শুধু তোর দোষ কি, মেয়েজাতের স্বভাবই ওই। জোবেদাও তোকে দেখতে পারত না।

কোথা হইতে আসিয়া পড়িল এক কালীয়-দমন—অর্থাৎ কৃষ্ণ-যাত্রার দল। নিতান্ত বৈচিত্র্যহীন অচঞ্চল পল্লী-জীবনের মধ্যে তাহাদের আবির্ভাবটা অনেকটা কোন কৃচ্ছ্রসাধনরত তপস্বীর সম্মুখে তপস্যা-ভঙ্গের জন্য প্রেরিত দেবমায়ার মত হইয়া উঠিল।

দলটা খুব বড় নয়, জন ত্রিশ বত্রিশ লোক—তাহার মধ্যে জন দুয়েক ভারবাহী, একজন চাকর, একজন পাচক, বাকী সাতাশ আটাশ জন অভিনেতা। দক্ষিণে—ক্রোশ চারেক দূরের একখানা গ্রামে গান করিয়া তাহারা উত্তরমুখে চলিয়াছিল, কোথায় চলিয়াছিল সে কথা তাহারাই জানে। পথে এই বর্ধিষ্ণু গ্রামখানা পাইয়া গ্রাম-প্রান্তের একটা প্রকাণ্ড বটগাছের ছায়াতলে আসর বিছাইয়া বসিল। নিকটেই একটা বড় পুকুর। বেলাও তখন দু-পহর গড়াইয়া গিয়াছে। একজন রক্তচক্ষু দন্তুর প্রৌঢ় ভারবাহী দুইজনকে ও চাকরটিকে লইয়া স্থানটাকে যথাসম্ভব পরিষ্কার করিয়া উনান প্রস্তুত আরম্ভ করিয়া দিল। পাচক ব্রাহ্মণ ভারবাহীদের ভারের বোঝা খুলিয়া বাহির করিতে আরম্ভ করিল একটা এ্যালুমিনিয়মের ডেকচি, একখানা কড়াই, তারপর একটা টিনের মগ—একটার পর একটা, বাজীকরের ঝুলির ভিতরের ছোটখাটো নানা টুকি-টাকির মত। বাকী সকলে পুকুরে মুখ-হাত ও হাঁটু পর্যন্ত পথের ধূলা ধুইয়া আসিয়া বটগাছের ছায়াতলে খানকয়েক পুরানো মাদুর ও চট বিছাইয়া গড়াইয়া পড়িল। স্থান সঙ্কুলানের অভাবে জনকয়েক গামছা বিছাইয়া বসিল। দলের মধ্যে গুটি ছয়েক ছেলে, তাহারাই শুধু যেন এখনও ক্লান্ত নয়; শীর্ণ শরীর, তার উপর মুখ শুকাইয়া গেছে,—তবু তাহারা স্থানটা আবিষ্কারের জন্য চঞ্চল ব্যগ্র দৃষ্টিতে এদিক ওদিক চাহিয়া নূতন কিছু খুঁজিতেছিল। চোখে চোখে ইসারাও চলিতেছে, ইঙ্গিতে-ভঙ্গিতে দুটি ছেলের মধ্যে একটা ঝগড়াও চলিতেছে।

রক্তচক্ষু দন্তুর প্রৌঢ় বলিল, পশুপতি শুয়ে পড়লে যে! ওঠ, একবার তামুক খাও, খেয়ে ভারী দুজনকে নিয়ে একবার বাজারে যাও। জিনিসপত্র

যা নাই তা কিনে নিয়ে এস। বলি রমণ, তোমার নাসিকা যে গর্জন করছে মাঝে মাঝে! ওঠ, উঠে আলুগুলো কুটে ফেল!

রক্তচক্ষু প্রৌঢ়ই দলের ম্যানেজার। কংস, আয়ান ঘোষ, ভীম বা যে কোন রাজার ভূমিকায় সে অভিনয় করিয়া থাকে। লোকটার চেহারার মধ্যে একটা উগ্রতা—এবং রুক্ষতা আছে, একটা গাম্ভীর্যও আছে—দেখিয়া মনে ভয় হয়।

পশুপতি উঠি উঠি করিয়াও মধ্যে মধ্যে চোখ বুজিতেছিল; ম্যানেজার বেশ একটু গম্ভীরভাবেই বলিল—ওঠ, ওঠ! ওই দেখ মূলগায়েনের গাড়ী এসে গেল!

সত্যই মূলগায়েনের গাড়ী আসিয়া পড়িয়াছিল; একখানা খোলা গাড়ীর উপর গোটাচারেক বড় বড় কাঠের সিন্দুক-জাতীয় বাক্স বোঝাই করিয়া সেই বাক্সের উপর ছাতা মাথায় দিয়া মূলগায়েন বসিয়াছিল,—তাহার সঙ্গে দু'টি সুশ্রী ছেলে। মূলগায়েনই দলের অধিকারী এবং পালাগানেও সে-ই অধি-নায়কত্ব করিয়া থাকে। রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার মধ্যে সে-ই হয় বৃন্দাদূতী, নন্দগোপের গৃহাঙ্গনের দৃশ্যে সে-ই হয় আবার যশোদা, সে কখনও হয় দাসী, কখনও সখী, কখনও রাণী—একই বেশে সে সমগ্র অভিনয়ের মধ্যে মূল অংশ অভিনয় করিয়া যায়। পালাগানের কঠিন এবং গভীর মারাত্মক গানগুলির সে-ই প্রথমে ধরতা ধরে। লোকটির বয়স যে কত সে বলা কঠিন, তবে ছোটখাটো মানুষটি, বেশ সুশ্রী—সর্ব অবয়বের মধ্যে একটি কমনীয়তা আছে। তাহার সঙ্গের ছেলে দুইটির একটি সাজে রাধা অপরটি কৃষ্ণ।

পশুপতি আর বিলম্ব করিল না, সে ভারবাহী দুইজনকে লইয়া গ্রামের বাজারের ঠিকানায় বাহির হইয়া গেল। মূলগায়েন গাড়ী হইতে নামিয়াই প্রসন্নমুখে বলিল, সংসার যে পেতে ফেলেছেন দেখছি ঘোষালমশায়! সাধে কি আর ব্রাহ্মণকে দেবতা বলেছে—প্রসন্ন দৃষ্টি যেখানে পড়বে, সেখানেই মা-লক্ষ্মীকে এসে ভাণ্ডার খুলে বসতে হবে।

ম্যানেজার ঘোষাল প্রসন্ন হইতে সুপ্রসন্ন হইয়া উঠিল, সে গম্ভীরভাবে আদেশ করিল, ওরে রাধু, পাত, সতরঞ্চিটা পেতে ফেল, হাত পা ধোবার জল নিয়ে আয়। আর ঠাকুর—সরবৎ তৈরী কর দেখি।

মূলগায়েন বলিল,—আপনাদের জল খাওয়া হয়েছে?

—হ্যাঁ, সে পথেই নদীর ঘাটে সেরে নিয়েছে সব।

—তা বেশ! আমার সখী-সখাকেও জল খাইয়েছি পথে। বলিয়া সস্নেহে

রাধা ও কৃষ্ণ—ছেলেদুটির দিকে চাহিল। তারপর একটু চিন্তা করিয়া আবার বলিল,—সেও তো অনেকক্ষণ হ'ল ঘোষালমশায়! আমি বলি কি—সের খানেক বাতাসা—; ম্যানেজার বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল, দাঁড়ান মশায়। ওদিকে আবার সুন্দ-উপসুন্দের লড়াই লেগেছে। সে দ্রুতপদে অগ্রসর হইল। কিছু দূরেই সেই ইঙ্গিতে-ভঙ্গিতে বিবদমান ছেলে দুইটা কখন নিঃশব্দে পরস্পরকে আক্রমণ করিয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। চীৎকার করিলে ম্যানেজার বা দলের লোক জানিতে পারিবে, যুদ্ধে বাধা দিবে—তাই তাহাদের এ নিঃশব্দ যুদ্ধ।

ম্যানেজার আসিয়া দাঁড়াইতেই ছেলে দুইটা পরস্পরকে ছাড়িয়া দিয়া অতৃপ্ত ক্রোধভরে বন্য-পশুর মত শুধু শ্বাসে-প্রশ্বাসে ফুলিতে আরম্ভ করিল। একটা গাছের ডাল ভাঙিয়া ছেলে দুইটার পিঠে সপাসপ ঘা-কতক কষিয়া দিয়া ম্যানেজার ছেলে দুইটাকে দুইটি পৃথক স্থানে বসাইয়া দিল। মূলগায়েন বলিল, হরিদাসকে বাজারে পাঠালাম ঘোষালমশায়; নিয়ে আসুক এক সের বাতাসা। দু-খানা ক'রে মুখে দিয়ে একটু জল খাবে সব।

ম্যানেজার বলিল—দেখুন, এতে রেওয়াজ খারাপ হয়। আজ দিলেই কাল বলবে আমাদের বাতাসা দেওয়া হোক। আপনার কাছে তো কেউ যাবে না, জ্বালাবে সব আমাকে! এই দেখ—আজ বাতাসা মূলগায়েন নিজে হ'তে দিলেন। তা ব'লে—রোজকার রোজের কোন সঙ্গ নাই এর সঙ্গে।

সেই ছেলে দুইটা ফুলিয়া ফুলিয়া তখনও কাঁদিতেছিল, ম্যানেজার অকস্মাৎ তাহার বড় বড় দাঁতে দাঁতে ঘষিয়া কট্ কট্ শব্দ করিতে করিতে অভিনয়ের ভঙ্গিতে বলিয়া উঠিল—কদ-লী বন দল-নের জন্য, মদ-মত্ত হস্তীকে আর বারংবার অঙ্কুশাঘাতে জাগ-রিত করতে হবে না। চোপ—বলছি চোপ! কাঁদবি ত' ছেলেকে ওই ভাতের হাঁড়িতে সেদ্দ ক'রে খেয়ে নেব আজ! তাহার রক্তবর্ণ চোখের তারা দুইটা বন-বন করিয়া চরকীর মত ঘুরিতেছিল।

ছেলেগুলি এবার খিল-খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। মূলগায়েনও মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে বলিল—বেশ ভাল ক'রে একটা পান দাও তো সখি!

ম্যানেজার বলিল—রাধে, আমার জন্যেও একটা।

রাধার ভূমিকার ফুটফুটে ছেলেটি মূলগায়েনের পানের বাটা লইয়া কিশোরী মেয়ের মতই পান সাজিতে বসিল।

বাতাসা ভিজাইয়া জল খাইয়া ছেলেগুলোও শান্তভাবে শুইয়া ঘুমাইয়া

পড়িল। ম্লেগায়েন স্নান করিয়া তিলক কাটিয়া নির্জনে জপ করিতে বসিল। ম্যানেজারের বিশ্রাম নাই, সে ঠায় রান্নার কাছে বসিয়া আছে।

—ওহে—জল দাও হে, জল—। ভাত পুড়ে যাবে, অ-ঠাকুর! বলিতে বলিতে সে নিজেই এক ঘটী জল ভাতের হাঁড়িতে ঢালিয়া দিল। জল দিয়া উনানের কাঠগুলি টানিয়া বাহির করিয়া আগুন কমাইয়া দিল; তারপর সে নিজে তেল লইয়া মাখিতে বসিল।

কিছুক্ষণ পরই তাহার হাঁক-ডাকে নিদ্রাতুর দলটি সচকিত হইয়া উঠিয়া বসিল। চান ক'রে নে সব! এই এই—ওহে শশী—ও শ্যাম—ওঠ হে—ওঠ সব। তখন তাহার নিজের স্নান হইয়া গেছে, লম্বা চৈতনের গোছাটা দুইহাতে টানিয়া টানিয়া গ্রন্থি দিতে দিতে সকলকে ম্যানেজার ডাক দিতেছিল।

একজন প্রৌঢ় আড়ামোড়া দিয়া উঠিয়া গান ধরিয়া দিল—'ঘুমিয়েছিলাম বাবুর বাগানে'! লোকটির কণ্ঠস্বর মিষ্ট, কিন্তু কণ্ঠস্বরের মিষ্টতা অপেক্ষাও তাহার ভঙ্গিটি আরো চমৎকার!......স্বরের কৌশলে এবং ভঙ্গিতে খুব দূর হইতে ডাক শুনিয়া সাড়া দেওয়ার ইঙ্গিতটা সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠিতেছিল।

একজন তেল বিতরণ করিতে বসিল—প্রত্যেকের বরাদ্দ একপলা। তাহার পর স্নান। স্নানান্তে সকলেই একখানা করিয়া আয়না ও চিরুণী বাহির করিয়া বসিল। প্রসাধন পর্বটাই দীর্ঘ। নানা ছাঁদে টেরীকাটা শেষ করিয়া সব পাতা লইয়া বসিয়া গেল। সেই গায়ক প্রৌঢ়টি বাঁ-হাতে খানিকটা মাটি খাল করিয়া তাহার উপর পাতা পাড়িল। পাতাঢাকা খালটিতে তরল ডাল অধিক পরিমাণে ধরিবে!

আহারের পরই একজন গ্রামে গিয়াছিল। ইহারই মধ্যে কে যে কখন সন্ধান লইয়াছিল কে জানে, কিন্তু সঠিক সন্ধান তাহারা পাইয়াছিল। লোকটি রায়েদের বাড়ীর ভুলু রায়ের কাছে আসিয়া উঠিল। ভুলু রায়ের বয়স বৎসর চব্বিশেক, বেকার জমিদার-তনয়, আয় বাৎসরিক শতখানেক টাকা। কিন্তু তবুও সে এরণ্ডহীন দেশের মহাপাদপ, কায়া এতটুকু হইলেও ছায়ার ভনিতাটা তাহার বিপুল, লোকে না মানিলেও সে মাতব্বর সাজিয়া বসিয়া আছে।

ভুলু প্রথমটা একেবারেই গা-ছাড়া দিয়া বলিল—ক্ষেপেছ! লোকের ঘরে চাল অভাবে হাঁড়ি চড়ে না, লোকে যাত্রা শুনতে পয়সা দেবে!

লোকটি বলিল—বেশ তো, একবার দেখুন—যদি নাই হয়, তো আর কি করা যাবে!

—তা-দেখ, তোমরা নিজেই চেষ্টা ক'রে দেখ। এই লক্ষপতি বাঁড়ুজ্জেরা রয়েছেন, ওই গাঁয়ের শেষে রায় বাবু রয়েছেন। তারপর—ও পাড়ার তো সবাই বাবু; লম্বা কোঁচা—দেখ চেষ্টা ক'রে!

—দেখুন দেখি, রায়বাড়ীর নাম হ'ল বনেদী-বাড়ী! সে বাড়ীতে না হ'লে আমরা চলেই যাব। আপনি চেষ্টা করলে কি না হয় বাবু! তবে আপনি না হ'লে হবে না!

ভুলু প্রসন্ন হইয়া বলিল—কি নেবে আগে শুনি। দক্ষিণে কত?

—সে যা' হয় দেবেন; আপনাদের কাছে কি আমাদের কিছু বলা সাজে?

ভুলু হিসাব করিয়া দেখিল, গোটা পনের টাকা বেশ উঠিবে, দুই এক টাকা বেশী ওঠাই সম্ভব। সেটাকে সে পকেট খরচ খাতে রাখিয়া দিয়া হিসাব করিল, আসরের খরচ—আলো, পান-তামাক ইত্যাদিতে গোটা তিনেক টাকা লাগিবে; সুতরাং বারো টাকা দিতে পারা যায়।

আরও দুই টাকা এদিক-ওদিক বাদ দিয়া সে বলিল—এই দেখ, দশটি টাকা আর খোরাকী একমণ চাল—এই পাবে। পারো যদি তবে দল-বল নিয়ে চলে এসো; এই ন'টা নাগাদ গান জুড়তে হবে।

লোকটি হতাশ হইয়া বলিল—বাবু, আমাদের দলের মাইনেটা দেন। বত্রিশ জন লোক—অন্তত ষোলটা টাকা দেন!

ভুলু ঘাড় নাড়িয়া বলিল—আর একটি টাকা মেরে কেটে! তোমাদের আবার কালীয়-দমনের দল, ও আর কেউ শুনতেই চায় না। সখের দল হ'লে বরং লোকে দিত চাঁদা খুশি হয়ে!

লোকটি বলিল—তাইতো! একটু ভাবিয়া লইয়া সে আবার বলিল, আচ্ছা এই দশ মিনিট পরেই আমি এসে খবর দিয়ে যাচ্ছি!

ভুলু রায় ত্বরিত-কর্মা লোক—এবং বিজ্ঞতাও তাহার এই বয়সে যথেষ্ট হইয়াছে বলিয়াই সে মনে করে। ওই এগার টাকাই দলটির পক্ষে 'পড়িয়া পাওয়া চৌদ্দ আনা' একথা সে বেশ জানে। সে পাড়ায় বাহির হইয়া পড়িল। প্রথমেই সে আসিয়া উঠিল 'উরু' দাদার বাড়ী। 'উড়োনচণ্ডী' হইতে সংক্ষিপ্ত হইয়া 'উরু'তে পরিণত লোকটির পরিচয় নামেই বিদ্যমান; সে থিয়েটারে পার্ট করে, স্থাবর অস্থাবর বেচিয়া কলিকাতায় যায়, বেশ গোলগাল চেহারা, মাথায় একটি টাক—সে বলে, ও আমার টাকার টাক নয়, ফাঁকার টাক—সুখটাক নয়, দুখটাক।

—কি করছ উর্দা?

—এই বসে বসে তামাক খাচ্ছি—আর তক্কা বাজাচ্ছি। বললাম তোদিগে —যে, একখানা বই ধরে রিহারশাল বসিয়ে দে—তা'—হুঃ! পচে মর গে তোরা!

—সে হবে। এখন একটা যাত্রার দল এসেছে; কি করি বল দেখি!

—যাত্রা? তা' দে লাগিয়ে দে।

—কিন্তু ষোল টাকার কম যে কিছুতে ঘাড় পাতলে না। কাঁদাকাটা করছে। বলছে—দলের মাইনেটা পুষিয়ে দেন।

—বেশ, আমি একটাকা দোব। তুমি আর সব দেখ।

—তা হলে আসরের ভারটা কিন্তু তোমাকে নিতে হবে।

—তা সব ঠিক করে দোব। দাঁড়া আলো এখুনি দেখে আসি—কুমারীশ ময়রার আলোটা ঠিক করতে বলে আসি। ওর ডে লাইট্‌টা খুব ভাল। উর্দা সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া রওনা হইল। ভুলুও বাহির হইয়া যাইতেছিল—উরুর স্ত্রী তাহাকে ডাকিল—শোন-শোন, ও ঠাকুরপো! ভুলু ফিরিল, উরুর স্ত্রী বলিল—এই দেখ আমি ভাই আলাদা দোব চার আনা; করাও যাত্রা। মেয়ে মহলে সবাই দেবে!

অতঃপর ভুলু গিয়া উঠিল শূলপাণির বাড়ী। বাড়ীতে ঢুকিয়াই সে বুঝিল তাহার আসা ভুল হইয়াছে। বাড়ীতে তখন তুমুল কলহ। বড় বৌয়ের পাঁচ বৎসরের কন্যা সেজ বৌয়ের কোলের মেয়ের দুধতোলা দেখিয়া ঘৃণায় বমি করিয়া ফেলিয়াছে—সেই হেতু লইয়া কলহ। ভুলু ফিরিতেছিল, শূলপাণির ছোট ভাই নির্বাক হইয়া বসিয়াছিল -সে ভুলুকে ফিরিতে দেখিয়া বলিল—ফিরলে যে!

—এসেছিলাম- তা'—; একটু নীরব থাকিয়া সে বলিয়াই ফেলিল—একদল যাত্রা এসেছে। তাই, চাঁদা ক'রে —যদি হয় একরাত্রি তাই—তা—।

—তা বেশ তো, হোক না একরাত্রি—চাঁদা দোব আমরা। বেশ!

বড় বৌ মুখ বাঁকাইয়া বলিয়া উঠিল—'ঘরে ভাত নাই—বাইরে রোশনাই'—সেই বিত্তান্ত! লোকের তো সিন্দুকে টাকা ধরছে না, তাই চাঁদা করে যাত্রা করবে!

মেজ বৌ বলিল—আমি ভাই আট আনা দোব।

সেজবৌ বলিল—একটা টাকাই দাও দিদি! আমি তো আট আনা পাব!

—সে ভাই আজ হবে না। এই আট আনাই আমাকে ধার করতে হবে।

সেজবৌ আজ মেজবৌয়ের প্রতি প্রসন্নই ছিল—সে বলিল—তা হ'লে আমিই এক টাকা দিই। তুমি আমাকে এক টাকাই দিয়ো। বড়বৌ ঘরে প্রবেশ করিয়া আবার বাহির হইয়া আসিয়া বলিল—ভুলু, এই নাও ভাই। সবাই যখন দেবে —তখন আমরাই বা না দিলে হবে কেন? আমার ভাই এক টাকার দলে নাম নিকো খাতায়! আঁর ভাই সকালে আরম্ভ করিয়ো। হ্যাঁ!

ছোট ভাই বলিল—তবে আমারটাও নিয়ে যা।

ভুলু বলিল—একখানা সতরঞ্চি দিতে হবে কিন্তু আসরের জন্যে!

বেশ, লোক পাঠিয়ে দিস।

কিছুক্ষণ পর ছোট ছেলের দল বস্তা ঘাড়ে চাল আদায় করিতে আসিয়া বলিল—চাল দাও গো যাত্রার।

একদল মেয়ে আসিয়া বলিল—বড়বৌ, চল যেতে হবে তোমাকে।

আশ্চর্য হইয়া বড়বৌ বলিল, -কোথায়?

—পদ্মকাকী চাঁদা দেয়নি। কেন দেবে না? চল যেতে হবে!

সঙ্গে সঙ্গে বড়বৌ উঠিল, বলিয়া গেল,—মেজবৌ দেখিস তো ভাই, আমার ভাতটা না পুড়ে যায়! চল।

লোকটি নিবেদন করিল,—এগার টাকা আর একমণ চাল, এর ওপর আর কিছুতেই উঠল না।

ম্যানেজার ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিল,—দলের মাইনেই তো বারো টাকা! এক টাকা কি আমরা গাঁট থেকে দেব না কি?

আসন্ন সন্ধ্যার বিষণ্ণতার মধ্যে একখানি পূরবী রাগিণী ধরিবার জন্য বেহালাদার বাক্স হইতে বেহালাখানি বাহির করিয়া সুর বাঁধিতেছিল, সে বলিল —বসে থাকলে তো কেউ কিছু পাবে না। ব'সে থাকি, না, ব্যাগার খাটি, কিছু কমই না হয় নেবে সবাই। সিকি বাদ বার আনা ক'রে দেন, বার সিকি তিন টাকা বাদ দিয়ে ন'টাকা মাইনে—দুটো টাকা থাকবে।

ম্যানেজার বলিল—তা হলে তুমিই দেখ ওস্তাদ;—বলে কয়ে দেখ সব। আমি মূলগায়েনকে বলে দেখি। ঘুমালো নাকি মূলগায়েন?

মূলগায়েন ঘুমায় নাই—নিস্তব্ধ হইয়া শুইয়া ছিল। ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্বে. এই গ্রামে সে বৎসর বৎসর যাত্রা করিতে আসিত। তাহার গুরু— অধিকারীর দলে সে তখন সাজিত রাধা। মনে পড়িয়া গিয়াছে!

ম্যানেজার আসিয়া ডাকিল—ঘুমালেন নাকি গো!

চোখ মেলিয়া মৃদু হাসিয়া মূলগায়েন উত্তর দিল—বলুন।

—এরা যে এগার টাকার বেশী দিতে চায় না গো!

—তা হলে?

—সেই তো আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি। ওস্তাদ বলছে যে বসে থাকার চেয়ে দলের লোকে মাইনেও কিছু কম নিক—আপনারও কিছু কম থাক। হয়ে যাক ওতেই।

—বেশ। তাই হোক।

ম্যানেজার চলিয়া গেল। মূলগায়েন আবার চোখ মুদিয়া নিস্তব্ধ হইল। তাহার মনোলোকে জাগিয়া উঠিল স্মৃতির ছবি।—

ছোট দশ বৎসরের কমনীয়কান্তি একটি ছেলে—দর্পণে দেখা সে রূপ এখনও তাহার মনে আছে। কেমন করিয়া কোথা হইতে সে যে যাত্রার দলে আসিয়া জুটিয়াছিল, সে জানিতেন পূর্ব অধিকারী। অধিকারীর ঘরেই স্নেহ মমতার মধ্যে সে বাস করিত। সন্ধ্যায় গান শিখিত—অধিকারী পাখির মত তাহাকে শিখাইতেন. বৃন্দা প্রশ্ন করিত—বলি—হ্যাঁগো শ্রীমতী, ব্রজেশ্বরী, ব্রজের রাণী তুমি, তোমার চোখে জল কেন গো?

সে সুর করিয়া ঝোঁক দিয়া উত্তর দিত—বৃন্দে গো! পিরীতির রীতি এমন কেন বলতে পার সখি?

—কেমন সে রীতি বল দেখি? আমি তো জানি না, বল তো শুনি?

—পিরীতি এত দুঃখময় কেন সখি?

—দুঃখময়? না-না-না তা কি হয়! পিরীতি তো সুখের সাগর গো!

—না, না সখি—পিরীতি বড় দুঃখময়! বলিয়া সে গান ধরিত—'পিরীতি সুখের সায়র দেখিয়া নাইতে নামিনু তায়।'

যাত্রার আসরে মুখে অলকা-তিলকা আঁকিয়া বিচিত্র বেশ পরিয়া সে এমনি কথাগুলি বলিয়া যাইত। দেশ দেশান্তরের কত বিচিত্র আসর—সামিয়ানা—নাটমন্দির—কত আলো—কত জনসমাবেশ! এই গ্রামের বাঁড়ুজ্জে বাবুদের প্রকাণ্ড নূতন নাট-মন্দিরের সে শোভা—অপরূপ শোভা! তখন তাহার বয়স বারো।

সাজঘরের দুয়ারে গ্রামের ছেলেদের কত উঁকি-ঝুঁকি; তাহার সহিত আলাপ করিতে তাহাদের কত ব্যগ্রতা! মধ্যে মধ্যে ওই ঘোষালের মত রক্তচক্ষু

উগ্রদর্শন হরিশ ঘোষ তাহাদের তাড়া করিত—এই ধর তো ছেলের পালকে! খাব! খাব! ছেলেরা ছুটিয়া পালাইত! আসরে বসিয়া তাহারা পান ছুড়িত। সে সেদিকে তাকাইলে দেখিত দাতাও কৃতার্থ হাসিমুখে তাহার দিকে চাহিয়া আছে। যাত্রা ভাঙিয়া গেলে অবশিষ্ট রাত্রিটুকুতে ঘুমাইয়া ঘুম শেষ হয় নাই—সকালে বসিয়া সে সাজঘরের বারান্দায় ঠেস দিয়া ঘুমাইতেছিল। কানের মধ্যে তখনও যন্ত্রসংগীতের রেশ যেন ভাসিয়া আসিতেছিল। বৃন্দা যেন ডাকিল—শ্রীমতি! রাধে! তাহার তন্দ্রা ভাঙিয়া গেল। স্বপ্ন নয়, একটি আট নয় বছরের মেয়ে তাহাকে ডাকিতেছে—শ্রীমতি—রাধে!

—ধেৎ ছেলে! ইয়ার্কী করতে এসেছ?—মেয়েটি ছুটিয়া কিছুদূর পলাইয়া গিয়া দাঁড়াইল।—তোমাকে ডাকছে।

—ভাগ্! সে আবার চোখ বুজিল।

—শ্রীমতি! তোমাকে আমার মা ডাকছে গো!

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া সে আবার আরক্ত চক্ষু মেলিয়া চাহিল। মেয়েটি মিনতি করিয়া বলিল—আমার মা সন্দেশ তৈরী করেছে, তোমাকে ডাকছে। এস!

সন্দেশ! লুব্ধ ছেলেটি এবার না উঠিয়া পারিল না। দলের লোক জনকতক উঠিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপনে গিয়াছে, কতক তখনও অসাড় হইয়া নিদ্রামগ্ন; সে উঠিয়া মেয়েটির সংগে চলিল। আঁকাবাঁকা পল্লীপথ—দুই চারিটি লোক, কেহ যায় কেহ আসে।

—ওই দেখ রে, ও-ই কাল রাধিকে সেজেছিল! নয় হে ছোকরা?

মেয়েটি ঝঙ্কার দিয়া উঠিল—ওই, ওযে আমাদের বাড়ী চললো!

—তোমাদের কেও হয় বুঝি?

—হ্যাঁ।

ছেলেটি বিপন্ন হইয়াও প্রতিবাদের সময় পাইল না। মেয়েটি এবার গতি দ্রুততর করিল—ত্বরিতগতিতে আরও কয়টা ছোট গলি ঘুরিয়া ঘন বৃক্ষপল্লবে বেষ্টিত ছোট একটি আঙিনায় আসিয়া উঠিল। একটি পঁচিশ-ছাব্বিশ বৎসরের সুশ্রী মেয়ে--উজ্জ্বল হাসিমুখে তাহাকে আহ্বান করিয়া বলিল—এস, এস—গোপাল এস, তোমার জন্যে আমি বসে আছি।

মেয়েটি ফিক্ করিয়া হাসিয়া বলিল—দূর। গোপাল কেন হবে?—ও যে শ্রীমতী, রাধে।

মা তাহাকে ধমক দিয়া উঠিল—পাজী মেয়ে কোথাকার—দেখবি?

মেয়ে খিল খিল করিয়া হাসিতে হাসিতে ছুটিয়া পলাইল। মা ছেলেটিকে সমাদর করিয়া বসাইয়া বলিল—মুখ হাত ধোয়া হয়নি তো তোমার, গোপাল? বলিয়া নিজেই একটু তামাকের গুলগুঁড়া, একটি তালপাতা, একঘটি জল নামাইয়া দিল। তারপর প্রশ্ন করিল -হ্যাঁ গোপাল, আমরা বোষ্টম; আমাদের ঘরে একটু জল খাবে তো?

ছেলেটি বলিল—আমিও বোষ্টম।

—বোষ্টম! মেয়েটির মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।—তাই তো বলি, বোষ্টম না হলে কি এমন সুন্দর রাধা হয়। একেবারে সাক্ষাৎ রাধা। তা হ'লে একটু জল খাও—কেমন?

ঘরের তৈরী ক্ষীরের নাড়ু, বড় চমৎকার। কিন্তু আর চাহিতে তাহার লজ্জা হইল। সে তাড়াতাড়ি জল খাইয়া আসন ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল।

—হ্যাঁ বাবা, একটি গান শোনাবে?

—কি গাইব বলুন!

—ওই যে শ্যাম শুকপাখী—!

গুন গুন করিয়া ক্রমশ কণ্ঠ উচ্চতর করিয়া সে গাহিল—শ্যাম শুকপাখী সুন্দর নিরখি—ধরিলাম নয়ন-ফাঁদে!

একটা নয়, আরও একটা গান শুনাইয়া সে পান চিবাইতে চিবাইতে বাসায় ফিরিল।

সেই কয়জন অল্পবয়সী বাবু! তাহাদেরও আজ মনে পড়িতেছে! তাহারা তাহাকে ডাকিয়া বলিল--এই ছোকরা, শোন তো!

—কি নাম তোমার?

—আজ্ঞে? সে কেমন ভীত হইয়া পড়িল।

—তোমার নামটি কি?

—আমার নাম?—আমার নাম গৌরদাস দাস।

—কোথায় বাড়ী তোমার?

—আজ্ঞে, আমার মা বাপ কেউ নেই; আমি অধিকারী মশায়ের বাড়ীতে থাকি।

—মাইনে-টাইনে দেয়? না, পেট-ভাতাতেই থাক?

সে চুপ করিয়া রহিল। একজন আবার বলিল—দেখ, আমাদের থিয়েটারের

দল হয়েছে। আমাদের দলে যদি এস, তবে আমরা মাইনে দেব; মা বাপ নাই বলছ—বাড়ী ঘর ক'রে দেব, বুঝেছ!

—আজ্ঞে না। সখের যাত্রা বা থিয়েটার তাহার ভাল লাগে না, সেখানে রাধাকে নাচিতে হয়। এমন করিয়া বৃন্দা সেখানে রাধাকে ভক্তি করে না।

—কেন?

এবার সে ভয়ে কাঁদিয়া ফেলিল। তাহারা আর তাহাকে উত্ত্যক্ত করিল না—হাসিয়া ছাড়িয়া দিল। বাসায় আসিয়া দেখিল—সেই মেয়েটি দাঁড়াইয়া আছে।

—শ্রীমতি!

এবার সে হাসিয়া ফেলিল। মেয়েটি বলিল,—মা ডাকছে।

সেই বৎসর হইতে বাঁড়ুজ্জে বাড়ীর রাস-যাত্রায় তাহাদের দলের বায়না বাঁধা হইয়া গেল। বৎসরে বৎসরে সে দলের সঙ্গে আসিত। বিনা আহ্বানেই সে এখন সেই আখড়াতে গিয়া ডাকিত—মা!

—কে,—গোপাল—গৌরদাস! এস বাবা, এস। এই তোমার জন্যেই খাবার করছি। গোপাল ক্ষীরের লাড়ু বড় ভালবাসে—না বাবা?

সে উত্তর দিবার পূর্বেই কলকণ্ঠে মেয়ে বলিয়া উঠিল—নাড়ুগোপাল! একবার হামাগুড়ি দিয়ে বস তো নাড়ুগোপাল!

—তোকে এইবার এক চড় মারব রাধু! মেয়েটির নাম রাধারাণী।

নয় হইতে দশ—দশ হইতে এগার, এগার হইতে বার বছরের মেয়েটি এখন অনেক শিখিয়াছে। সে গৌরের দিকে পিছন ফিরিয়া বসিল।

গৌর বলিল,—দেখুন—রাগ দেখুন!

রাধু তাহার অভিনয়-ভঙ্গিকে ব্যঙ্গ করিয়া আরম্ভ করিল—না-না—সখি—সে মুখ আর আমি দেখব না গো! কালো রূপ আর হেরব না। যমুনার জল কালো—যমুনায় আর যাবো না গো! মাথার কেশ কালো—সে কেশ আর রাখব না সখি! নীলাম্বরীর বর্ণ কালো, নীলাম্বরী আর পরব না গো! দাও. দাও—আমাকে গৈরিক বাস এনে দাও সখি, আমায় যোগিনী সাজায়ে দাও!

মা তাহার হাসিয়া বলিল,—মরণ তোমার! গৌরদাস অমনি করে বলে নাকি? আর গায় কত সুন্দর—পারিস তুই?

—ছাই। ও আমি খুব পারি।

—বেরো, বেরো বলছি। পালা!

মেয়ে সত্য সত্যই পলাইয়া গেল!

মা বলিল—হ্যাঁ বাবা গোপাল, এইবার তো বড়টি হ'লে—এইবার একটা ঘরদোর কর। রাধুর বাবা বলছিল—গৌর যদি বড় দলে যায়—অনেক মাইনে হয়। তোমার ভাবনা কি বাবা!

গৌর বলিল—অধিকারী আমাকে ঘরদোর করে দেবেন, জমি কিনে দেবেন—বলেছেন।

—হ্যাঁ বাবা, আমার রাধুকে বিয়ে করবে? আমার বড় সাধ।

গৌর সলজ্জ মুখে নত দৃষ্টিতে নীরব হইয়া রহিল। রাধারাণীর রঙ ফরসা না হউক—এমন দেহভঙ্গি বড় দেখা যায় না। একটু দীর্ঘ তন্বী, পিঠে একপিঠ চুল—চোখের তারা দুইটি অহরহ চঞ্চল—কথা কহিবার সময় যেন নাচে!

গৌরের সলজ্জ নীরবতা দেখিয়া রাধারাণীর মা পুলকিত হইয়া উঠিল—মৃদু হাসিয়া সে বলিল—রাধুর বাপের সঙ্গে সেই কথাই হয় আমাদের। তারও ভারি ইচ্ছে। বলে কি জান, বলে গৌরও আমাদের রাধারাণী সাজে, রাধুও আমাদের রাধারাণী—কেমন মিল হবে বল দেখি!......তা হ'লে আজ ওকে পাঠিয়ে দেব অধিকারী মশায়ের কাছে। অধিকারী মশায়ই তো তোমার মা বাপ সব!

গৌর চুপ করিয়া রহিল, খাইতে বসিয়া সলজ্জ কুণ্ঠায় পূর্বের মত এবার আর চাহিয়া খাইতে পারিল না। রাধারাণীর মা অযাচিতভাবেই আরও কয়েকটা নাড়ু পাতে দিয়া বলিল—জামাই না হতেই লজ্জা আমার গোপালের।

আসিবার পথে নির্জন গলির মধ্যে রাধারাণীর সঙ্গে দেখা হইল। রাধু তাহাকে দেখিয়া একপাশে পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইল। গৌর বলিল—মান বুঝি? রাগ হয়েছে?

রাধু ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া লজ্জারক্ত মুখে ফিক্ করিয়া হাসিয়া বলিল,—যাঃ! তারপর দ্রুতপদে চলিয়া যাইতে যাইতে বলিল—আমি বুঝি শুনি নাই!

গৌরদাসের সমস্ত অন্তরটা আবেশময় পুলকোচ্ছ্বাসে ভরিয়া উঠিল।

সমস্ত দিন সে উৎকণ্ঠিত হইয়া অপেক্ষা করিয়া রহিল—কখন রাধারাণীর বাপ আসিবে! কোন কিছু তার ভাল লাগিল না। গ্রামের ছেলেগুলি এখন

বন্ধ হইয়া গিয়াছে; তাহারা পান আনে—সিগারেট দেয়। তাহারা আসিয়া আজ ফিরিয়া গেল।

রাধুর বাপ আসিল সন্ধ্যার দিকে। অধিকারীকে প্রণাম করিয়া বলিল—প্রভুর কাছে একবার এসেছিলাম আমি।

একখানা ছোট ঘরে অধিকারী, ম্যানেজার—দলের রাধা ও কৃষ্ণকে লইয়া থাকেন। স্বতন্ত্র তাঁর শয্যা ও আসন, ব্যবস্থাও স্বতন্ত্র। তিনি বাবাজীর মুখের দিকে চাহিয়া প্রতি-নমস্কার করিয়া বলিলেন.—কি বলুন।

গৌরদাস ঘরের পিছন দিকের জানালায় কান পাতিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। জানালার ছোট একটা ছিদ্র দিয়া সবই দেখা যাইতেছিল।

হাত জোড় করিয়া সহাস্যে রাধুর বাপ আপনার নিবেদন সবিনয়ে ব্যক্ত করিয়া বলিল—এখন আপনার আদেশ না পেলে তো হয় না; আপনিই তো গৌরের সব—রক্ষক বলুন রক্ষক, বাপ বলুন বাপ—সবই আপনি।

অধিকারী একটু নীরব থাকিয়া বলিলেন—প্রস্তাব কিছু অন্যায় প্রস্তাব নয়। তবে গৌর এখন ছেলেমানুষ, বালক বললেই হয়। ছেলেটি ধরুন গান করেই খায়; কণ্ঠস্বর আর সঙ্গীতবিদ্যা হ'ল—সাধনার বস্তু। সংযম নইলে সাধনা হয় না—।

রাধুর বাপ বলিল, আমার কন্যাটিও খুব বড় নয়, এই আপনার বছর বারো হবে! আপনি অনুমতি করলে—এক আধ বছর পরেই না হয়—।

তাহার কথার মধ্যপথেই অধিকারী বলিলেন, ম্যানেজার বাবু একবার বাইরে যদি যান দয়া করে—তা হ'লে .....দরজাটা একটু বন্ধ করে দিয়ে যাবেন। হ্যাঁ!

তারপর বলিলেন—দেখুন, আপনি হলেন বৈষ্ণব, আমি ব্রাহ্মণ, তার ওপর ভগবানের লীলাগান করাই হ'ল আমার ব্যবসা। আমি তো আপনাকে প্রতারণা করতে পারবো না। একটা কথা—

কিন্তু, কথাটা না বলিয়াই তিনি নীরব হইলেন; নীরবেই মাটির দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিলেন। রাধুর বাপও নীরবে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পর সে-ই উৎকণ্ঠিত হইয়া নীরবতা ভঙ্গ করিল,—প্রভু!

অধিকারী বলিলেন—বলতে আমার কষ্ট হচ্ছে বাবাজী; এতদিন এ কথা গোপন করেই রেখেছিলাম। কিন্তু আজ আপনি যে প্রস্তাব করছেন—তাতে আপনার কাছে গোপন রাখা চলে না। দেখুন,......একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া অধিকারী বলিলেন—ছেলেটি জাতিতে বৈষ্ণব নয়!

—বৈষ্ণব নয়! তবে? রাধুর বাপ যেন আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল।

—সকলে অবশ্য বৈষ্ণব বলেই জানে, ছেলেটিও তাই জানে। আমি বরাবর ওই পরিচয়ই দিয়ে এসেছি। অনেকদিন পূর্বে, ছেলেটির বয়স তখন ছয় কি সাত; সেই সময় বর্ধমানের পথ থেকে ওকে কুড়িয়ে এনেছিলাম ওর চেহারা দেখে আর গান শুনে। সেই বয়সেই গান গেয়ে ছেলেটি ভিক্ষা করে বেড়াত; আমার দলের জন্যে ওকে এনেছিলাম। দোকানীরা বলেছিল, ছেলেটির মা নাকি—। অধিকারী নীরব হইলেন।

বাবাজী ব্যগ্র উৎকণ্ঠায় প্রশ্ন করিল—মা নাকি?

—মানে—কি বলব? এই নাচগান করত—মানে বারাঙ্গনা ছিল।

—বেশ্যা?

—হ্যাঁ, তাই।

পিছনের জানালার ধারে দাঁড়াইয়া গৌর কেমন অবসন্ন বিবশ হইয়া গেল—সে যেন পঙ্গু হইয়া গেছে।

বাবাজীও স্তব্ধ হইয়া স্তম্ভিতের মত বসিয়া রহিল। অধিকারী আবার বলিলেন.—ছেলেটিকে এনেছিলাম প্রথমে স্বার্থের জন্যেই। কিন্তু এখন বড়ই মায়া হয়ে গেছে। নিজের কাছেই রেখেছি, রাধাকৃষ্ণের লীলায় ওকে রাধা সাজাই; সেই পুণ্যে ওর পাপ ধুয়ে মুছে যাবে বলেই আশা করি। ভাল ক'রে একটু অধিকার হ'লেই—আমি ওকে বৈষ্ণব ক'রে দোব। মহাপ্রভুর মহাধর্মে তো জাতিকুলের বিচার বড় নয়- সে বাধাও নাই; তারপর দেখুন আপনি—

নিতান্ত অবসন্নের মত বার-কয়েক ঘাড় নাড়িয়া রাধুর বাপ জানাইয়া দিল—না-না—সে হয় না। আমরা জাত বৈষ্ণব। ভেকধারী নই।

তারপর অধিকারীর পায়ের ধুলো মাথায় লইয়া সে বলিল,—আপনি মহৎ লোক—আপনি আমাকে জাতিপাত থেকে রক্ষা করলেন। চোখ দিয়া তাহার জল পড়িতেছিল।

গৌরের চোখের সম্মুখে সমস্ত পৃথিবী অর্থহীন; মাথার ভিতর যেন অসীম শূন্যতা নিঃশব্দ প্রবাহে বহিয়া চলিয়াছে। বুকের মধ্যে শোকোচ্ছ্বাসের মত একটা যন্ত্রণাদায়ক আবেগ নির্দয় ভাবে তাহাকে পীড়িত করিতেছে। মুহুর্মুহুঃ তাহার চোখ জলে ভরিয়া উঠিতেছিল—বারবার মুছিয়া মুছিয়াও সে জল সে শেষ করিতে পারিল না। তাহার মা—! সে—! এবার সে হু হু করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। অকস্মাৎ দ্রুতপদে সকলকে এড়াইয়া—নির্জন পথ

ধরিয়া গ্রামের বাহিরে আসিয়া প্রাণ খুলিয়া কাঁদিল। সে কান্না তাহার আর ফুরায় না! তাহার মা—! সে—! ছি-ছি-ছি! রাধু—রাধারাণীর কাছে সে অস্পৃশ্য!

সহসা একসময় অন্ধকার অনুভব করিয়া সে দাঁড়াইল। নির্জন প্রান্তর—পিছনে অনেক দূরে উজ্জ্বল আলোগুলির ঊর্ধ্বোৎক্ষিপ্ত প্রভা অন্ধকার শূন্য-লোকে জমাট সাদা কুয়াশার মত ভাসিতেছে। আশেপাশে সম্মুখে গ্রামের চিহ্নই অনুভব করা যায় না। সে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া সম্মুখের অন্ধকার পথেই আগাইয়া চলিল। না—ছি-ছি!

কিন্তু রাধু? রাধুও হয়তো কাঁদিতেছে! সে আবার কাঁদিল।

তারপর? কত পথ, কত দেশ-দেশান্তরে ঘুরিয়া কত বিভিন্ন যাত্রার দলে দলে ফিরিয়া সে নিজে দল গড়িল। নামটা পর্যন্ত সে পরিবর্তন করিয়া ফেলিয়াছে। রাধাকৃষ্ণের প্রেমগান তাহার বড় ভাল লাগে। সখের যাত্রার দল তাহার ভাল লাগে নাই—সেখানে রাধা গান গাহিয়া নাচে! ছিঃ! রাধা অভি-মানিনী, মর্যাদাময়ী, রাজনন্দিনী,—ব্রজসুন্দরকে আত্মসমর্পণ করিয়াছিল বলিয়া সে কি নটীর মত নাচিবে! কত বড় প্রেম—কত বড় সে বিরহ—কত দুর্বার সে অভিমান! ওরে আলোর সঙ্গে কি রঙের ভেজাল দেওয়া যায়! রাধা—রাধারাণী—রাধু—রাধু!

একখানি কিশোরীর মুখ তাহার মনে জাগিয়া উঠিল—সে বলিতেছে—না না সখি, সে মুখ আর দেখব না গো!......নীলাম্বরী আর পরব না সখি!—দাও দাও, আমায় গৈরিকবাস এনে দাও—যোগিনী সাজিয়ে দাও!—তাহার কৌতুকময় কণ্ঠ আজ যেন গাঢ় হইয়া উঠিয়াছে।......

এদিকে দলের মধ্যে তখন সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। সাজ-পোশাক লইয়া দল গ্রামের মধ্যে চলিয়াছে। বেহালাদার শশী বলিল,—মূলগায়েনের চোখ দিয়ে জল পড়ছে। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ভাব না-কি?

কথাটা চুপি চুপি সে ম্যানেজার ঘোষালকে বলিল।

ম্যানেজার বলিল—বোধ হয় শুয়ে শুয়েই ইষ্টমন্ত্র জপ করছেন! নাও-নাও—সব গুছিয়ে-গাছিয়ে চল গাঁয়ের ভেতর। এই দেখ—ভদ্দরলোকের গ্রাম—চ্যাংড়ামি যেন কেউ না করে! বুঝলে!

তারপর সে অধিকারীর কাছে আসিয়া সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধাভরে ডাকিল—মূলগায়েন! ওঃ, আপনার ইষ্ট-স্মরণ হয়ে গেল দেখছি! তা শুয়েই—কি রকম হ'ল?

চোখ মুছিয়া মূলগায়েন বলিল—শরীরটা ক্লান্ত ছিল—আর, স্মরণে আপনি উদয় হ'লে—মানে, মনে পড়লে—কি মনে না করে থাকা যায়?

—তা হ'লে চলুন গ্রামের মধ্যে। এরা সব চলে গেল।

ভুলু রায় ও উরুদাদা আসরটা বেশ ভাল করিয়াই সাজাইয়াছিল। চারিদিকে চারিটা ডে লাইটে আসরটা আলোয় আলোয় যেন ঝলমল করিতেছে। সম্মুখে বসিয়া ছেলের দল, তাহার পিছনে একদিকে ভদ্রলোক—অপরদিকে অন্যান্য শ্রেণীর পুরুষেরা বসিয়াছে। পিছনে মেয়েদের আসর।

পালাটা হইতেছিল—দীর্ঘ বিরহের পর রাধা-কৃষ্ণের পুনর্মিলন—প্রভাস-যজ্ঞ। বিরহিণী রাধা দ্বারকার পথের সন্ধান করিতেছেন—কোন্ পথে গেলে দ্বারকায় শীঘ্র যাওয়া যায়।

এই সময়—এতক্ষণে মূলগায়েন আসরে প্রবেশ করিল। মাথায় পাটীপাড়া ধরনের পরচুলা, তাহাতে সিঁথি। সিঁথির দুইটি শাখা চুলের রেখায় রেখায় বেড়িয়া কবরী পর্যন্ত বিস্তৃত। কানে কান, নাকে নথ, গলায় চিক ও সাতনর, হাতে কঙ্কণ, বাহুতে তাবিজ ও বাজুবন্ধ, পরনে বিচিত্র বেশ, কপালে তিলক-বিন্দুর সারি, নাকে রসকলি আঁকিয়া সাজিয়া দূতীরূপে সে আসিয়া আসরে প্রবেশ করিল। দলের চাকরটি পিছনে পিছনে আসিয়া পানের বাটা, পরিপাটী ভাঁজ করা একখানি গামছা রাখিয়া দলস্থ একজনকে জিম্মা দিয়া গেল। পরম ভক্তিভরে মূলগায়েন প্রণাম করিয়া বসিয়া আসরের চারদিক একবার চাহিয়া দেখিল। আলোকিত আসরে সারি-সারি মুগ্ধ শ্রোতার মুখ। কিন্তু রাধারাণী কোথায়? চারিদিক সে চাহিয়া দেখিল; কিন্তু কই?

—উঠুন গো আপনি; গান জমেছে ভাল। আপনি উঠলে আসর আগুন হয়ে যাবে। পিছন হইতে ম্যানেজার ঘোষাল মৃদুস্বরে ইঙ্গিত দিল। সে উঠিয়া দীর্ঘ সুর ছাড়িয়া ধরিল একখানি ধ্রুপদাঙ্গের গান। শিক্ষিত সুমিষ্ট কণ্ঠের রাগিণীর আলাপে আসর যেন ভরিয়া উঠিল।

পরদিন বিদায় লইয়া সে বাসায় ফিরিতেছিল, সঙ্গে ছিল—দলের যে ছেলেটি রাধা সাজে—সেই ছেলেটি।

বিদায়ের কর্তা হইয়া বসিয়াছিল—সেই উরুদাদা। ভুলু ছিল তাহার দক্ষিণ হস্ত-স্বরূপ ডানদিকে বসিয়া। উরুদাদা বলিল, নাঃ অধিকারী মশায়, মনে করেছিলাম কেষ্টযাত্রা ভাল লাগবে না, তা বেশ লাগল, চমৎকার। যেমন আপনার গলা—তেমনি শিক্ষা। সুন্দর! আর রাধা,—যে ছেলেটি—এই যে এইটিই তো! বাঃ খাসা। ওর জন্যে আমরা এই আলাদা আটআনা দিলাম।

মূলগায়েন সবিনয়ে বলিল,—আপনারা মহৎ ব্যক্তি। গুণীর গুণ আপনাদের চোখে তো এড়াবে না। নাও রাধে, বাবুদের প্রণাম কর।

বিদায় লইয়া ফিরিবার পথে চলিতে চলিতে সহসা সে চমকিয়া উঠিল—একি—এ কোন্ পথে সে আসিয়াছে? এ তো সেই আখড়ার পথ! হ্যাঁ! এই তো! কিন্তু আখড়াটা কই? বোধ হয় এইটাই! উঃ—গাছগুলি কত বাড়িয়া উঠিয়াছে! কুঞ্জবন যে বন হইয়া উঠিয়াছে!

দাঁড়ালেন যে? ছেলেটি তাহার অনুসন্ধানরত বিচিত্র দৃষ্টি দেখিয়া সবিস্ময়ে প্রশ্ন না করিয়া পারিল না।

একটু অপ্রস্তুত হইয়া মূলগায়েন বলিল—জল খাবে?

—না, আমার তো তেষ্টা পায়নি।

তবুও একবার উঁকি মারিয়া সে দেখিল; বনান্তরালে ঘরগুলি ভগ্নস্তূপে পরিণত, কেহ কোথাও নাই!—বনের ছায়ার নিবিড় অন্ধকারে ভাল করিয়া দেখাও যায় না. বনের ঝরা-পাতা পচিয়া একটা ভ্যাপসা গন্ধে স্থানটা পরিপূর্ণ। একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া সে ফিরিল; রাধু নাই! দুর্দমনীয় একটা দুঃখের আবেগে বুকটা তাহার ভরিয়া উঠিল। দ্রুতপদে সে সেই চেনা গলির পথটা ধরিয়াই অগ্রসর হইল। কিন্তু চলিতে চলিতে তাহাকে বিব্রত হইয়া দাঁড়াইতে হইল। নাঃ, এ সংকীর্ণ পথে আসা ভাল হয় নাই! ওদিক হইতে একটা স্থূলাঙ্গী বিরলকেশা স্ত্রীলোক আসিতেছিল। মেয়েটি তাহাকে দেখিয়া অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া মাথায় কাপড় টানিয়া দিয়া মধ্য পথেই এক পাশে পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইল। মেয়েটির মুখে রাজ্যের বিরক্তি; মূলগায়েন সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। সন্তর্পণে সসঙ্কোচে স্থানটা পার হইতে হইতে গৌরদাসের হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল—এইখানেই একদিন লজ্জিতা রাধু পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইয়াছিল।

আশ্চর্যের কথা—আজও যে স্থূলাঙ্গী সেখানে পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইয়াছিল—সেও রাধু। গাছের শিকড়ে শিকড়ে ঘর জীর্ণ হওয়ায় তাহারা

স্থানান্তরে আখড়া বাঁধিয়াছে। সে এখন ঘরণী গৃহিণী, সন্তানের জননী। সমস্ত রাত্রি কৃষ্ণযাত্রা দেখিয়া তাহার শরীরটা অবসন্ন হইয়া আছে—এবং মনটাও তাহার ভাল নাই। দলের রাধাটিকে দেখিয়া বহুদিন পূর্বের এমনই এক কিশোরকে তাহার মনে পড়িতেছিল। সেও রাধা। কতবার মনে হইয়াছে—এ-ই যেন সে-ই! তাহাকে মনে করিয়া মনটা তাহার বিষণ্ণ হইয়া গিয়াছে। সে বিষণ্ণতা বিরক্তিতে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। বিরক্তভাবেই সে ফিরিয়া দাঁড়াইল।

গৌরদাস পরম সম্ভ্রমভরে রাধুকে অতিক্রম করিয়া গেল, রাধুও অপরিচয়ের সঙ্কোচ লইয়াই অবগুণ্ঠন টানিয়া তাহাকে পিছনে ফেলিয়া চলিয়া গেল।

সম্মুখে শূন্য পথ; পিছনে রাধুর স্মৃতি-বিজড়িত ওই আখড়ার ভগ্নস্তূপ—ওই গলিপথটা গভীর আকর্ষণে মূলগায়েনকে আকর্ষণ করিতেছিল, বুকে অসহ দুঃখ—রাধু নাই! বারবার তাহার গতি মন্থর হইয়া আসিতেছিল। ছেলেটির গতির আকর্ষণে চলিবার অভিপ্রায়ে গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া মূলগায়েন রাধা ছেলেটিকে সম্মুখে আনিয়া বলিল—রাধে, তুমি আগে চল।

রাধারাণী! রাধু না থাক রাধারাণী আছে!

কিছুক্ষণ পরেই কৃষ্ণযাত্রার দলটি গ্রামখানি ছাড়িয়া পথে বাহির হইল। গাড়ীর উপরে মূলগায়েন ও কৃষ্ণ ছেলেটির পাশে সেই রাধা ছেলেটি। মন্থর গতিতে গাড়ীটা গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া গেল। ছেলের দল উদাস দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল, পল্লীর মেয়েরা ঘোম্‌টার ভিতর দিয়া চাহিয়া দেখিতেছিল! বুড়াদের মনও আজ কাজে বসিতেছে না। রায়েদের মুলতুবী ঝগড়াটা আজ আবার সকাল হইতে আরম্ভ হইয়াছে। বৈষ্ণবদের মেয়ে রাধু ঘাট হইতে ফিরিয়া দাওয়ায় বসিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল; বাতের বেদনা যেন চাগাইয়া উঠিতেছে। তাহার উপর কানের পাশে যেন গানের সুর বাজিতেছে। চোখ বন্ধ করিলে ভাসিয়া উঠিতেছে—যাত্রার ছবি; রাধা বলিতেছে—না—না—সখি—!

কিন্তু চোখ খুলিলে—কই? কোথায়?

রূপ স্বতন্ত্র বস্তু—রূপ তাহার কোন কালে ছিল না; তবে অন্নবস্ত্রে দেয় যে শ্রী—সে শ্রী তাহার ছিল। কিন্তু সেটুকুও তাহার থাকিল না। অন্নবস্ত্রের অভাবে নয়, কয় মাসের কারাক্লেশ জলোকার মত শ্রীটুকু যেন শোষণ করিয়া লইল। জেলে ক্লেশ কিছু সে পায় নাই, কিন্তু তবুও চারমাসের মধ্যেই আমাশয় ও চোখের অসুখে কুব্জ, শ্রীহীন হইয়া ফিরিল। স্থূলতা বর্জিত শরীর শীর্ণ হইয়া গিয়াছিল; খদ্দরের পোষাকও ভারী বোধ হইতেছিল। অবয়বের লাবণ্য নিঃশেষে ঝরিয়া গেছে—দেহের শ্যামবর্ণ প্রায় কালো হইয়া উঠিয়াছে। তাহার সে লাবণ্য আর ফিরিল না। শ্রী না ফিরুক দেহ সুস্থ হইল।

জেল হইতে ফিরিয়া তাহার নেশা পড়িল লেখায় এবং গাছ পোঁতায়। নিজেই মাটী কোপাইয়া ফুলের বাগান করে, গ্রামের প্রান্তের প্রকাণ্ড বড় বাগানটায় বট অশ্বত্থের ডাল ও চারা পোঁতে, ফুলের গাছও পোঁতে—কিন্তু সংখ্যায় কম। রৌদ্রে বৃষ্টিতে তাহার শ্রীহীনতা উত্তরোত্তর বাড়িতেছিল। আন্দোলনের পূর্ব হইতেই জামা জুতা সে ত্যাগ করিয়াছিল; তাহার পরণে থাকে মোটা কাপড় আর কাঁধে চাদর! চাদর আবার সব সময়ে নয়, কোথাও যাইতে আসিতে হইলে চাদরটা কাঁধে চাপে। অন্য সময়ে খালি গা, খালি পায়ে সে মূর্তিমান শ্রীহীনের মত ঘুরিয়া বেড়ায়। সে জেলে থাকিবার সময় ছোট ভাই সংসার ঘাড়ে লইয়াছিল—সে সংসার তাহার স্কন্ধে দৈত্যের স্কন্ধের আকাশের মতই চাপিয়া রহিল। শিবনাথ সে আর ঘাড়ে করিল না। তবে উপদেশ দেয়—সময়ে সময়ে কিছুদিন ধরিয়া কঠোর পরিশ্রমে ত্রুটীগুলি সংশোধন করিয়া দিয়া সংসার রথখানিকে অপেক্ষাকৃত সবল ও দ্রুত গতিশীল করিয়া দেয়।

দ্বিপ্রহরে এক গা ঘামিয়া সেদিন শিবনাথ বাড়ী ফিরিল। খালি গা, খালি পা—কোমরে গুঁজিয়া কাপড়খানা পর্যন্ত হাঁটুর উপর টানিয়া তোলা; সাড়া না দিয়াই বাড়ী ঢুকিল।

শিবনাথের স্ত্রী গৌরী ও ছোট বৌ অমলা বারান্দায় থামের আড়ালে বসিয়া পান সাজিতেছিল, গৌরী বলিল, শম্ভু এদিকে শোন দেখি!

শম্ভু শিবনাথের বাড়ীর মাহিন্দার।

শিবনাথ সটান খিড়কীর বাগানের দিকে চলিয়া গেল। গৌরী উঠিয়া বারান্দায় দাঁড়াইয়া বলিল—শম্ভু কোথায় গেল মনুর মা?

রন্ধনশালে ব্যস্ত পাচিকা মনুর মা বলিল—কে জানে বৌদিদি, দেখি নাই ত। কেউ আসে নাই ত'!

ছোট বৌ অমলা মিহিভাবে বলিল, আসবে না কেন—খিড়কী দিয়ে গেল চোখের সামনে।

গৌরী রুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল—চাকর বাকর অবাধ্য হয়েছে দেখেছ! ডাকলে সাড়া পর্যন্ত দেয় না। তা বলব কাকে বল? বড়বাবুই চাকর বাকরের মাথা খেলে। এখুনি শম্ভু খিড়কী দিয়ে গেল।

খিড়কীর রাস্তাঘরে পদশব্দ উঠিল। মনুর মা বলিল—ওই যে, ওই যে বাবু আসচেন।

গৌরী বলিল—এই শম্ভু, বেয়াদপ চাকর কোথাকার—

প্রথমটা না লক্ষ্য করিলেও শিবনাথ খিড়কীর বাগানে দাঁড়াইয়া কথাবার্তা শুনিয়া সব বুঝিয়াছিল। সে হাসিমুখেই জোড় হাতে দাঁড়াইয়া বলিল—অধম কি একান্তই শম্ভু পদবাচ্য হ'ল হুজুরাইন?

মনুর মা মুখে কাপড় গুঁজিয়া ঘরে ঢুকিয়া পড়িল। ছোট বৌ-এর চাপা হাসির খুক্ খুক্ শব্দ বেশ শোনা যাইতেছিল। গৌরী নিজেও না হাসিয়া পারিল না—বলিল, মা গো মা, কি অপ্রস্তুত করতে পার তুমি মানুষকে—না বাপু, ছি, ও কি?

শিবনাথ হাসিয়া বলিল—আমার কথাটার উত্তর দাও, আমি কি শম্ভুর কেলাসে পড়লাম তা হ'লে?

গৌরী স্বামীকে বেশ করিয়া দেখিয়া বলিল—কিন্তু এ কি চেহারা হয়েছে বল দেখি? সর্বাঙ্গে ধুলো, শরীরের এই অবস্থা—ছি ছি ছি। বস দেখি, একটু বাতাস করি। ভোলাদাসী, জল দে ত এক বালতী! ছোট বৌ আমার সাবান আর তোমার ভাসুরের গামছা দেখে দাও ত।

ভোলাদাসী বাড়ীর ঝি।

খেয়ালের সুর চাপা পড়িয়া ধ্রুপদ ধামার আরম্ভ হয় দেখিয়া শিবনাথ

গ্রস্ত হইয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি সে বলিল—ধীরে মহাশয়া ধীরে, ধ্রুপদ ধামার আরম্ভ করতে হয় ধীরভাবে সুস্থচিত্তে। একটু অপেক্ষা কর, এই গাছ কটা পুঁতে আসি!

গৌরী বলিল- হাত মুখ ধোও, জল খাও, তারপর। সে স্বামীর হাত হইতে গাছের চারা কয়টা টানিয়া লইল। আর উপায় ছিল না—শিবনাথকে বাধ্য হইয়া আত্মসমর্পণ করিতে হইল। অতঃপর কিন্তু শিবনাথের মন্দ লাগিল না—তপ্তদেহে শীতল বারি সিঞ্চন, তাহার সঙ্গে পাখার মৃদু বাতাস, সকলের উপর মিছরীর সরবৎ—মন্দ কেন, খুব ভালই লাগিল। সে চোখ মুদিয়া পরম আরামে বলিল—আঃ!

গৌরী বলিল—দেখ, কিছুদিন কোথাও গিয়ে শরীর সেরে এস তুমি! আর জামা জুতো পর—ও ছেড়ে আর—

মধ্যপথেই শিবনাথ বলিল—কেন, অমনি আর পছন্দ হচ্ছে না আমাকে!

গৌরী বলিল—আমার কথাই তোমার পছন্দ হয় না। কিন্তু মা থাকলে তিনিও ঠিক এই কথাই বলতেন।

শিবনাথ বলিল—তনয় যদ্যপি হয় অসিত বরণ, প্রসূতির কাছে সেই কষিত কাঞ্চন। কিন্তু, কন্যা কাময়তে রূপং—সখি, আশঙ্কা আমার তোমার সম্বন্ধে।

গৌরী এবার বিদ্রোহ করিয়া উঠিল। সে বলিল,—তোমাকে যেতে হবেই। আর জামা জুতো তোমাকে পরতেই হবে।

শিবনাথ উত্তর দিল—শরীর ত আমার অসুস্থ নয় গৌরী। আর বেশভূষা জীবনের পক্ষে বাহুল্য বলেই আমি মনে করি।

গৌরী বলিল—ও শরীর তোমার ভাঙতে কতক্ষণ? তা'ছাড়া শ্রী বলে জিনিষটাও ত দরকার। আমি টাকা দিচ্ছি।

শিবনাথ মুদিত চোখেই উত্তর দিল—কি হবে রূপ, কি হবে বেশভূষা, মহাকালের দরবারে—

গৌরী রাগ করিয়া উঠিয়া গেল।

শিবনাথ তবুও একটু রসিকতা করিবার চেষ্টা করিল—রূপ দেখে যদি ভালবাস সখি—।

কিন্তু রসিকতা জমিল না, গৌরীর মুখ দেখিয়া গানের কলিটা সে সম্পূর্ণ আবৃত্তি করিতে পারিল না।

শিবনাথ স্ত্রীর অনুরোধ রাখিল না। তাহার সেই এক উত্তর--কি হবে? সে গ্রাম প্রান্তের বাগানে ঘুরিয়া বেড়ায়, কত ধারার চিন্তা করে, লেখে—মস্তিষ্ক ক্লান্ত হইলে গাছ পোঁতে।

গৌরী অবশেষে দেবর দেবনাথকে দলে টানিয়া শিবনাথকে পরাজিত করিবার চেষ্টা আরম্ভ করিল। এবার ফল কিছু ফলিল, স্থির হইল, এখন কয়েক মাস আর এমন করিয়া শিবনাথের ঘুরিয়া বেড়ান হইবে না। বাড়ীতে বসিয়া সেরেস্তার কাজকর্ম দেখিয়া দিতে হইবে। শিবনাথকে স্বীকার করিতে হইল। কর্তব্যে সে অবহেলা করে না।

গৌরী বলিল, তবু আমার কথাটা রাখলে না!

শিবনাথ বলিল—তোমার কথাই ত রাখলাম।

—না, ভাই-এর কথা রাখলে। কেন—সে কথাও আমি জানি।

—কেন শুনি?

—বই ছাপাতে টাকা চেয়েছিলে তুমি, আমি দিইনি—তাই। আমার টাকায় শরীর সারতে পর্যন্ত যাবে না তুমি। আমার ব্রতের কাপড় জামা জুতো ছাতা সে পর্যন্ত নিলে না তুমি।

শিবনাথ বলিল—পাগল তুমি! গৌরীর কথা তখনও শেষ হয় নাই, সে বলিতেছিল—টাকা দেবার আমি কে? টাকার মালিক ছেলেরা। তারাই মায়ের দৌহিত্র। একথাটা তুমি বুঝলে না, আমার উপর রাগ করলে।

শিবনাথ বলিল—ও তোমার ভুল ধারণা গৌরী। বলিয়া সে বাহিরে চলিয়া আসিল। কিন্তু কথাটা সে চিন্তা না করিয়া পারিল না। বৈঠকখানাটা জনশূন্য—চাকরটা বাজারে গিয়াছে, চাপরাশীটা ওই মাত্র গেল দেবনাথের সঙ্গে মাঠে, নায়েব স্থানীয় ব্যক্তি, কি কারণে সে আজ আসিতে পারে নাই। শিবনাথ একা বসিয়া ঐ কথাটাই ভাবিতেছিল।

গৌরী কিছু মাতৃধন পাইয়াছে—হাজার নয় টাকা। টাকাটা কতক ক্যাস সার্টিফিকেটে আবদ্ধ আছে, কতক গৌরীর পিতৃকুলের এক ব্যবসায়ে ধার দেওয়া আছে—সুদটা তাহার মাসে মাসে পাওয়া যায়। কিছু টাকা শিবনাথ একবার চাহিয়াছিল, কিন্তু গৌরী দেয় নাই। শিবনাথ ভাবিতেছিল, গৌরীর কথাটা কি সত্য?

চিন্তাটা সুখপ্রদ মনে হইতেছিল না, মনে মনে যেন অপরাধ আংশিক ভাবেও

স্বীকার করিতে হইতেছিল। শিবনাথ উঠিয়া সেরেস্তার খাতাপত্রগুলো লইয়া বসিল।

কাহার জুতার শব্দে মুখ তুলিয়া শিবনাথ দেখিল এক সৌম্যদর্শন প্রৌঢ় আসিতেছে। ভদ্রলোক আসিয়া নমস্কার করিয়া বলিলেন—নমস্কার।

শিবনাথও প্রতিনমস্কার করিয়া বলিল—বসুন। বসিয়াই ভদ্রলোক বলিলেন—নতুন বহাল হয়েছেন বুঝি আপনি?

নগ্ন গাত্র শিবনাথ বুঝিল ভদ্রলোকের ভুল হইয়াছে। কিন্তু কি ভাবে কেমন করিয়া সে ভ্রম সংশোধন করিয়া দেওয়া যায়, তাহাই সে দ্রুত চিন্তা করিতেছিল। কিন্তু তাহার পূর্বেই ভদ্রলোক তাহার হাতদুটী জোড় করিয়া মৃদু কণ্ঠে বলিল—পাঁচটি টাকা আপনাকে পান খেতে দোব নায়েব বাবু। আমার একটি কাজ ক'রে দিতে হবে।

শিবনাথ অগাধ জলে পড়িয়া গেল। দুই কুল বজায়ের উপায় না পাইয়া সে নায়েব সাজিয়াই বসিল।

বলিল—কি কাজ বলুন।

ভদ্রলোক বলিল—বাবুদের দরবার থেকে পাঁচ টাকা ক'রে বার্ষিক বৃত্তি ছিল আমাদের। গত বছর থেকে সেটা বন্ধ ক'রে দিয়েছেন বড়বাবু। তা সেইটী আপনাকে উদ্ধার করে দিতে হবে।

শিবনাথ প্রশ্ন করিল—বৃত্তি বন্ধ হ'ল কেন? বড়বাবু ত—

বিরক্তিভরে ভদ্রলোক বলিয়া বসিল—আর মশায়, নতুন লোক আপনি—ক্রমে বুঝতে পারবেন। সে এক আচ্ছা লোক। এখন ব্যাপারটা শুনুন। বাবুদের মহাল ২১৯ নং তৌজি পাবনায় আমার শ্বশুর বাড়ী—বৃত্তি আমার শ্বশুরদের পৈত্রিক। আমিই সব সম্পত্তি পেয়েছি—শ্বশুরের ছেলেপিলে নাই। শ্বশুরের পৈত্রিক দুর্গাপূজা ছিল; বিজয়ার পর যাত্রার দিন আমার শ্বশুর প্রতিমার গলার পৈতে নিয়ে আসতেন—বাবুরা পাঁচটী টাকা দিতেন। এখন এবার আসতেই ছোটবাবু বললেন—বৃত্তি আপনি পাবেন না; কেন মশায়, জিজ্ঞাসা করলাম। শুনলাম শ্বশুরের দুর্গাপূজা ত আমি আর করি না। সেই জন্যে বড়বাবুর হুকুম।

শিবনাথের ব্যাপারটা মনে পড়িয়া গেল! সে বলিল—পূজাটা বন্ধ না করলেই হ'ত!

হাসিয়া ভদ্রলোক বলিল—বেশ মশাই আপনি। খরচ কত! তা ছাড়া

ইস্কুল মাস্টারী করি, ছ্বটী হয় সেই পঞ্চমীর দিন। কখনই বা কি করি!

শিবনাথ ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিল—তা আমি বলব বাব্বকে।

ভদ্রলোক বলিল—হ্যাঁ, ছোটবাব্বকে নয়, বড়বাব্বকে বলবেন। আচ্ছা ঘড়েল লোক মশাই—ছোট ভাইকে শিখণ্ডীর মত সামনে রেখে আড়াল থেকে হ্বঃ—বেশ! আরে মশাই পাঁচ দিন এসে দেখাই পেলাম না। কোথা? না, বাড়ী নাই—মাঠে নয় বাগানে।

তারপর সহসা ম্বখটা খ্বব কাছে আনিয়া বলিল—এত বাগানে কেন মশাই, বলি মালটাল—এ্যাঁ? এদিকে ত স্বদেশীতে জেল টেল খেটে এলেন।

শিবনাথের এর পর হাস্য সম্বরণ করা কঠিন হইয়া উঠিতেছিল। সে কোনর্বপে বলিল--কই, সে রকম ত শ্বনি টুনি নাই।

চোখের ইসারা করিয়া ভদ্রলোক বলিল—আরে মশাই, ডুবে ডুবে জল খেলে একাদশীর বাবাও জানতে পারে না।

শিবনাথ ভদ্রলোককে বিদায় করিবার চেষ্টায় ব্যস্ত হইয়া উঠিল—এখনি কে হয়ত আসিয়া তাহার পরিচয় ব্যক্ত করিয়া দিবে। সে বলিল—আমি বলব। আচ্ছা, নমস্কার।

কে হয়ত আসিয়া তাহার পরিচয় ব্যক্ত করিয় াদিবে। সে বলিল—আমি বলব।
বললে হবে না। ব্রাহ্মণের ব্বত্তি উদ্ধার করে দিতেই হবে। আমি বরং আরও কিছ্ব—

বাধা দিয়া শিবনাথ বলিল—আমাকে কিছ্ব লাগবে না। তবে বড়বাব্ব যে ধারার মান্বষ—

ভদ্রলোক বলিল—আরে, দেখা পেলে যে দেখি কি ধারার মান্বষ। ব্বড়ো-ছেলে শাসন করার অভ্যেসও আমার আছে। এই দেখ্বন, আপনাকে দশটাকা দোব আমি। আচ্ছা চললাম আজ—নমস্কার।

ভদ্রলোক চলিয়া যাইতেই শিবনাথ তক্তাপোষের উপর গড়াইয়া হাসিতে আরম্ভ করিল। একা একা এতটা কৌতুক ভোগ করিতে তাহার ভাল লাগিল না। সে উঠিয়া বাড়ীর দিকে চলিল। শিবনাথের বাড়ী ও বৈঠকখানার মধ্যে খানিকটা ব্যবধান আছে—একটা রাস্তা পার হইয়া সামান্য একটু যাইতে হয়। বৈঠকখানা হইতে রাস্তায় নামিয়াই কিন্তু তাহাকে দাঁড়াইতে হইল। সেই ভদ্রলোক তাহারই এক বন্ধ্বর সহিত কথা কহিতে কহিতে অগ্রসর হইয়া আসিতেছেন।

শিবনাথ সঙ্গে সঙ্গে ফিরিল, কিন্তু তাহার পূর্বেই বন্ধুটী বলিয়া উঠিল—এই যে শিবনাথ। এই ভদ্রলোক--ও মশায়, ও সীতারামবাবু—চলে যাচ্ছেন কেন, এই যে শিবনাথ।

সীতারামবাবু ততক্ষণে বিপরীত দিকে মুখ ফিরাইয়া দ্রুতপদে অনেকটা চলিয়া গিয়াছেন।

শিবনাথের হাসিতে নূতন জোয়ার ধরিয়া গেল। তবুও সে ডাকিল—শুনুন, শুনুন সীতারামবাবু।

অল্প দূরেই পথটা একটা মোড় ফিরিয়াছে। সীতারামবাবু সেই মোড়ের মধ্যে তখন অদৃশ্য হইয়া গিয়াছেন। বন্ধুটী হতবাক হইয়া শিবনাথের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। অবশেষে বলিল—কি ব্যাপার বল ত শিবনাথ? ভদ্রলোক আমার জানা লোক, তাই দেখা হতেই বল্লেন শিবনাথবাবুকে ধরে একটী কাজ করে দিতে হবে আমার। তাই সঙ্গে আসছিলেনও আমার, কিন্তু তোমাকে দেখেই—কি ব্যাপার বল ত?

শিবনাথ তখনও প্রচুর হাসিতেছিল—সে হাসির মধ্যেই কোনরূপে বলিল—পরে বলব দাদা, এখন হাসতে দাও!

বলিয়া সে হাসিতে হাসিতেই বাড়ী চলিয়া গেল। বাড়ীর সকলেও হাসিয়া আকুল হইল। গৌরী, ঘরের মধ্যে লক্ষ্মীর সিংহাসন পরিষ্কার করিতেছিল। সে গম্ভীর মুখে বাহির হইয়া আসিল।

বাড়ীর পুরাতন ঝি সতীশের মা বলিতেছিল—তা বাপু লোকের দোষ কি! বাবুলোকের চেহারা হবে এ্যাই থল্‌থলে—এই ভুঁড়ি! এ্যাতখানি জায়গা জুড়ে বসে থাকবে পাহাড় পর্বতের মতন! এই জামা, চক্‌চকে জুতো, মস্‌ মস্‌ করে যাবে! তা-না ই এক ঢং বাপু তোমার।

শিবনাথ গৌরীর দিকে চাহিয়া বলিল—শুনলে হাসির কথা!

কাজের অজুহাতে ওঘরে যাইতে যাইতেই গৌরী উত্তর দিল—কালা ত নই, শুনলাম বৈকি! কিন্তু হাসির ত এতে কিছু নাই।

শিবনাথ প্রশ্ন করিল—কি রকম?

—তা বৈ কি! আড়ি পেতে শোন যদি তবে নিরেনব্বুই জনকে অমনি ধারার কথা বলতে শুনবে। নিজের পরিচয় গোপন করে নিজের সম্বন্ধে কথা শোনাও আড়িপাতারই সামিল। ও অতি ছোট কাজ।

গৌরীর কথার সুরে ও অর্থে বাড়ীর হাস্যচটুল বায়ুস্তর যেন দেখিতে

দেখিতে স্তব্ধ উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। সকলেই যেন হাঁপাইয়া উঠিতেছিল। শিবনাথও মনে যেন একটু আঘাত পাইয়াছিল, তবুও সে রহস্য করিবার চেষ্টা করিল—হতভাগ্য শিবের কপালে পতিনিন্দা শুনে গৌরীও শেষে সতীর মত দেহত্যাগ না করেন—আমি তাই ভাবছি!

গৌরী শান্তস্বরে উত্তর দিল—দেহত্যাগ করে আর লাভ কি বল? গৌরী দেহত্যাগ করলে মহাদেব আবার বিবাহ করবেন, মাঝখান থেকে গৌরীর কার্তিক গণেশই ভেসে যাবে।

কথাগুলির গঠনের ভঙ্গীকে রহস্য বলিয়াও ধরা যায়—কিন্তু অতি কুৎসিত ব্যক্তির রোদন-বিকৃত মুখ দেখিয়া যেমন হাসা যায় না—তেমনি এ কথাগুলি শুনিয়াও কেহ হাসিতে পারিল না। শিবনাথও নীরব হইয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে শিবনাথ বলিল—এত রূপের আকাঙ্ক্ষা কেন বল ত তোমার?

অতি রুষ্ট কণ্ঠস্বরে গৌরী উত্তর দিল—এত বড় জঘন্য কথাটা তুমি বললে আমাকে! অতি ইতর তুমি!

শিবনাথের কর্কশ কৃষ্ণমূর্তি ক্রোধে কুৎসিত হইয়া উঠিল। সে বলিয়া উঠিল—যা সত্য তাই বলেছি। সত্য কথা ইতরে বলে না—ইতরেই সত্যকথা সসম্মানে গ্রহণ করতে পারে না।

পাচিকা মনুর মা বলিল—তা বাবু একবার ঘুরেই আসুন না। বৌদিদি ত ভাল কথাই বলছেন!

শিবনাথ উত্তর দিল—সে খরচ করবার মত অবস্থা আমার নয়। তার চেয়ে স্নো-পাউডার মেখে রূপ বাড়ান কম খরচে হয়। বলিতে বলিতেই সে উঠিয়া বৈঠকখানার দিকে চলিয়া গেল।

ইহার পর দুই বৎসর চলিয়া গেছে। শিবনাথ তখন খ্যাতিসম্পন্ন লেখক। দুই চারিখানা কাগজের লেখার তাগিদ, পত্রের জবাব তাহাকে নিত্য দিতে হয়। পরিশ্রমও সে করে অগাধ। কিন্তু গাছের নেশা—উদ্দেশ্যহীন ভাবে মাঠে মাঠে ঘোরার নেশা, বেশভূষায় উদাসীনতা এখনও তাহার তেমনি আছে।

সেবার বর্ষার সময় খেয়াল হইল ঘর মেরামতের। রাজমিস্ত্রী লাগাইয়া নয়—রাজমিস্ত্রীর যন্ত্রপাতি কিনিয়া সে নিজেই কাজ আরম্ভ করিল। বাগানের ভিতর দিয়া বৈঠকখানায় প্রবেশের পথ ছিল না—সেখানে সে পাঁচিল ভাঙিয়া

এক নূতন ফটক ও একপ্রস্ত সিঁড়ির প্রয়োজন অনুভব করিল। আর তৈয়ারী করিতে হইবে বাগানের মধ্যে একটা পাকা বেদী।

ছোট ভাই বলিল—তোমার অদ্ভুত খেয়াল দাদা। বেশ ত, রাজমিস্ত্রী লাগান হোক।

শিবনাথ নিজের হাতেই বনিয়াদ খুঁড়িতেছিল। সে বলিল—উঁ-হু। দেবনাথ জানে এ লোকের সঙ্গে বাক্যব্যয় করা বৃথা; সে দাদাকে কিছু না বলিয়া বাড়ীতে গিয়া গৌরীকে ধরিল—পার ত তুমি পারবে বৌদি—তুমি বল।

গৌরী বলিল -পাগল তুমি দেবু! মহাপুরুষ যারা হয় তাদের ঐ ধারা! কারও কথা তাদের রাখতে নাই। আমি পারব না ভাই, আমাকে বলো না।

দেবু বলিল--প্রজা সজ্জন আসে যায়, তারা দেখলে কি বলে বল ত? মাথার ওপরে এই কড়া রোদ, কখনও বৃষ্টি!

গৌরী বলিল—তারা হীন ব্যক্তি, তাদের বলা কওয়ায় কি আসে যায়! আর রোদ বৃষ্টি প্রকৃতির দান—ওতে কি শরীরের অনিষ্ট হয়? তা ছাড়া খালি গায়ে, খালি মাথায়, রোদ বৃষ্টিতে মহাপুরুষদের কষ্টও হয় না।

দেবু চুপ করিয়া রহিল। গৌরী জল খাবার সাজাইয়া একখানা রেকাবী দেবুর হাতে দিয়া বলিল—খাইয়ে এস দেখি। চাকর বাকরের হাতে দেওয়া ত মিথ্যে—পড়েই থাকবে।

পনর দিনেও সিঁড়িটা শেষ হইল না। সেদিন সকালে শিবনাথ মাথায় এক মাথালী দিয়া সিঁড়ির উপর সিমেণ্ট চালাইতেছিল। পনর দিনেই রৌদ্রে তাম্রাভ রংএ তাহার কালো ছোপ ধরিয়াছে—পিঠখানার রং গাঢ় কালো হইয়া উঠিয়াছে।

পিওন আসিয়া প্রশ্ন করিল—এই, বাবু আছেন রে?

শিবনাথ মুখ তুলিয়া চাহিতেই সে লজ্জায় জিভ কাটিয়া বলিল—আজ্ঞে, চিনতে পারি নাই আপনাকে। একটা রেজেস্ট্রী আছে, খারিজ ফিজের নোটীশ!

চিঠি কয়খানা হাতে লইয়া সে হাসিয়া বলিল—রেজেস্ট্রী ছোট বাবুকে দাও গে যাও।

চিঠিগুলোর কয়খানা কাগজের পত্র, একখানা তাহার মামার, অপর খানা দিয়াছেন তাহার ভগ্নীপতি। ভাগ্নীর বিবাহ আগামী সপ্তাহে, তিনি তাহাকে যাইতে লিখিয়াছেন। দিদিও পত্র দিয়াছেন—এবার দেবুকে পাঠাইলে

চলিবে না। তাহাকেই আসিতে হইবে, অন্যথায় তিনিও কখনও আর শিবুর বাড়ী আসিবেন না।

শিবু এ নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করিতে পারিল না। ভগ্নীপতির দেশ বর্ধমান জেলার এক পল্লীগ্রামে—রেল স্টেশন হইতে মাইল পাঁচেক দূরে যাইতে হয়। কাঁচা রাস্তা বর্ষার জলে কাদায় অব্যবহার্য হইয়া উঠিয়াছে। পোঁছিবামাত্র ভগ্নীপতি সম্বর্ধনা করিলেন—এস এস ভাই, এস। কিন্তু এ কি চেহারা হয়েছে তোমার শিবু? খালি পা—খালি গা—এ কি!

শিবু হাসিয়া বলিল—চাষার চেহারা আবার কবে সজ্জনের মত হয় জামাইবাবু! এই ত চাষীর পোষাক।

ভগ্নীপতি উপস্থিত ভদ্রলোক কয়টীর দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—ডাক্তারবাবু, ইনিই আপনাদের প্রিয় লেখক শিবনাথ—আমার তালব্য শয়ে আকার লয়ে আকার। কেমন হে? আর ইনি—

তৎপূর্বেই ডাক্তারবাবুটী আগাইয়া আসিয়া বলিলেন—আমার পরিচয়—এ ভিলেজ ডক্টর, সামান্য ব্যক্তি। ভারী সুখী হলাম! ভারী ভাল লাগে আপনার লেখা। আমাদের ক্লাবের লাইব্রেরীতে কিন্তু একদিন যেতে হবে আপনাকে।

ভগ্নীপতি বলিলেন—হবে ডাক্তার, হবে। এখন পনর দিন ছাড়ব মনে করছ? তবে চোয়াড়ের গলায় ফুলের মালা দিয়ে কি করবে? চলহে, বাড়ীর ভেতরে চল—দিদি তোমার দশবার খোঁজ করেছে এর মধ্যে—শিবু এল?

শিবু বলিল—যে রাস্তা আপনাদের!

বাড়ীর মধ্যে দিদি তাহাকে দেখিয়া কাঁদিয়া বলিলেন—এ কি দশা হয়েছে তোর শিবু? এ্যাঁ, সেই শিবু তুই! বলে না দিলে ত তোকে আমি চিনতেই পারতাম না। বৌ লেখে, শরীর খারাপ হয়েছে তোর, কিন্তু এত খারাপ! সে রাক্ষুসী সেবা যত্ন করে না নাকি? বস, বস, আমি বাতাস করি। আর এ কি পোষাক পরিচ্ছদের শ্রী-রে তোর?

শিবনাথ হাসিতে হাসিতে বলিল—এক কাপ চা দাও দেখি আগে।

দিদি ডাকিয়া বলিলেন—অ ভাই বিনী, চায়ের জল চড়িয়ে দাও ত। আর ওরে নবীন—হাত মুখ ধোবার জল দে।

ওদিকের বারান্দায় মেয়েরা দাঁড়াইয়াছিল, সম্মুখেই কতকগুলি ঝিউরী মেয়ে—তাদের পিছনে কতকগুলি বধূ। দিদি বলিলেন--মেয়েরা সব দেখতে

এসেছে তোকে। আমাদের এখানে লাইব্রেরীতে তোর বই সব আছে কি না—আর সব কাগজই আসে ত।

শিব্ হাসিয়া বলিল—তা ছাড়া তোমার মত সজীব বিজ্ঞাপন যখন রয়েছে, তখন এখানে শিব্র খ্যাতির অভাব কি?

দিদি বলিল—না রে না, আমি মিথ্যে বড়াই ক'রে বেড়াই না। কিন্তু ও চেহারায় তোকে দেখবে কি বল্ ত?

শিব্ বলিল-- ভয় কি দিদি? জামাইবাব্র অনূঢ়া ভগ্নী ত নাই যে এই চেহারায় বরমাল্য গলায় নিতে হবে—টোপর পরতে হবে!

শিব্র মাথায় এক চপেটাঘাত করিয়া ভগ্নীপতি বলিলেন—ও রে শালা, আমাকে পাল্টে শালা বলতে চাও তুমি!

দিদির ননদ বিনী বা বিনোদিনী হাসিতে হাসিতে আসিয়া এক কাপ চা হাতে দিয়া বলিল—দুধ বেশী হয়ে গেছে, গরমও নেই, শিগ্গির খেয়ে নিন।

দিদি বলিল--খাসনে শিব্ খাসনে, মাড় মাড়—চা নয়।

তাহার পূর্বেই শিব্ চুমুক দিয়াছিল—সেটুকু ফেলিয়া দিয়া শিব্ বলিল, মাড় খুব পুষ্টিকর জিনিষ. সেণ্ট পারসেন্ট ভিটামিন। আর আমার মত চাষার পক্ষে উপযুক্ত বস্তু।

সকলে হাসিয়া উঠিল।

শিবনাথের উপর পড়িল বরযাত্রী সম্বর্ধনার ভার।

ভগ্নীপতি গোপালবাবু বলিল—দেখো ভাই, সহুরে জীব সব. তার ওপর আসছেন বরযাত্রী, বিজয়ী প্রুসিয়ান সৈন্যের মত বিক্রমে আসবেন। প্রথম মোহড়া তোমাকেই নিতে হবে।

মাথায় এক তোয়ালে জড়াইয়া শিব্ যাইবার জন্য সাজিল, বলিল—কোন চিন্তা নাই আপনার। খান দশেক গো-গাড়ী ও খান দুয়েক পাল্কী লইয়া শিব্ স্টেশন হইতে বরযাত্রী আনিবার জন্য যাত্রা করিল। রাস্তায় স্থানে স্থানে এক হাঁটু করিয়া কাদা জমিয়াছে। শিব্ যখন স্টেশনে পৌঁছিল তখনও ট্রেণের বিলম্ব ছিল। একজন খাবারওয়ালাকে ধরিয়া সে চায়ের বন্দোবস্ত করিয়া রাখিল।

বরযাত্রীর দল স্টেশন হইতে বাহির হইয়াই থমকিয়া দাঁড়াইল।

কাদা! এ কি দেশ বাবা! এ কথা তো ছিল না!

শিবু জোড়হাত করিয়া বলিল, এই আমাদের দেশ। তবে কষ্ট বিশেষ করতে হবে না, যেটুকু কষ্ট ঐ দোকান পর্যন্ত। ওখানে চা খেয়ে গাড়ীতে উঠবেন, বাড়ীর দোরে নামবেন।

একজন বলিল—বলিহারি ইয়ার! জুতোর কাদা ঘুচোবে কে?

বরকর্তা আগাইয়া আসিয়া বলিলেন, করবে কি আর, উপায় কি? এক কাজ কর, জুতো খুলে ফেল সব।

তরুণ দলের মধ্যে গুঞ্জন উঠিল—জুতো হাতে করে বরযাত্র যাওয়া, এ ত নতুন।

বরকর্তা বলিলেন—তোমরা জুতো হাতে করবে কেন, ঐ যে চাকর না সরকার ওকেই দাও সব। এই, জুতোগুলো সব নাও হে তুমি। একখানা বস্তা আন বরং।

শিবু অদূরবর্তী একজন গাড়োয়ানকে ডাকিল—ওরে—

একজন বরযাত্রী তাহার মাথায় সজোরে এক চড় বসাইয়া দিয়া বলিল—ওকে বলা হল ত উনি আবার বলেন ওকে। নে বেটা, তুই নে না। তোকেই নিতে হবে।

ভাবী বৈবাহিক তখন ক্রুদ্ধ মার্জারের মত গোঁফ ফুলাইয়া বলিতেছেন—লোক নাই জন নাই, কি ব্যাপার সব? পাড়াগাঁয়ের ভদ্রলোক means হাফ চাষা।

শিবু হাসিমুখেই বস্তা ঘাড়ে লইয়া জুতা সংগ্রহ করিতেছিল। সে বেয়াইকে বলিল, আপনার জুতো জোড়াটা?

দোকানে আসিয়া আর এক হাঙ্গামা ভাঁড়ে চা কি ভদ্রলোকে খায়?

শিবু বলিল—আজ্ঞে কাপের চেয়ে ভাঁড় ভাল, কাপে কত জনে খায়!

একজন বলিয়া উঠিল—আচ্ছা ইম্পার্টিনেন্ট চাকর ত! দে ত রে বেটার কান মলে।

শিবুর সঙ্গে চাপরাশী ছিল জন কয়েক। তাহারা রুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু ইসারা করিয়া শিবনাথ তাহাদিগকে নীরব থাকিতে আদেশ করিল। যাই হোক—নেশার বস্তু চা এবং সে চা যখন আর রাস্তার মধ্যে পাওয়া যাইবে না, তখন অগত্যা ভাঁড়েই খাইতে হইল। ভাঁড়ে চা বিস্বাদ লাগিল কিনা সে প্রশ্ন করিতে শিবু সাহস করিল না। গাড়ীতে উঠিবার সময় জুতো চাই—শিবনাথ পূর্বেই জুতোগুলি জোড়া মিলাইয়া সারিবন্দী করিয়া সাজাইয়া

রাখিয়াছিল। বরযাত্রীরা বলিল—পায়ে যে কাদা, জুতো পায়ে দিই কি করে?

শিবু গাড়োয়ানদের হুকুম করিল—জল এনে দে, বাবুরা পা ধোবেন।

একজন গাড়ীতে বসিয়া পা বাড়াইয়া দিয়া বলিল—এইখানে পা ধুয়ে দাও বাবা, কাদার ওপরে পা ধুয়ে ফল কি?

সহযাত্রীরা তাহাকে তারিফ করিয়া উঠিল—দি আইডিয়া। ব্রেণ কি রে বাবা!

সঙ্গে সঙ্গে সকলেই গাড়ীতে চড়িয়া পা বাড়াইয়া বসিল। গাড়োয়ান পা ধুইয়া গামছা দিয়া মুছিতে উদ্যত হইতেই বরযাত্রীরা বলিয়া উঠিল—থাক্ থাক্। শোন ত হে ইয়ার খানসামা, শোন ত।

শিবনাথ কাছে আসিতেই সে বলিল—খোল ত বাপধন মাথার তোয়ালে-খানি, মোছ, পা মুছে দাও।

একে একে সকলের পা মুছিয়া দিয়া হাসিতে হাসিতেই সে গাড়ীর সঙ্গ ধরিল। গাড়ীতে স্থান তাহাকে কেহ দিল না; অগত্যা সে একজন গাড়োয়ানের স্থানে বসিয়া পাঁচন হাতে গরু ঠেঙাইতে বসিল—হেৎ-তা-তা বাপধন রে আমার!

ভগ্নীপতি গোপালবাবু বলিল—ব্যাপার কি হে শিবু, চাপরাশীরা বল্লে আমায়, ওরা নাকি তোমার মাথায় চড় মেরেছে, জুতো বইয়েছে—

হাসিয়া বাধা দিয়া শিবনাথ বলিল—যেতে দিন না জামাইবাবু, ও সব তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে শেষে শুভকর্মে একটা ব্যাঘাত ঘটাবেন?

সজল চক্ষে গোপালবাবু শুধু বলিল—ভাই শিবু!

শিবনাথ তাড়া দিয়া বলিল—যান, কাজে যান। কোথায় কি হয়ে যাবে। শেষে আপনাকে হয়ত, কান নাক মলিয়ে ছাড়বে।

গোপালবাবুও এবার অল্প একটু হাসিয়া বলিল—তোমাকেই ডাকতে এসেছি, আলাপ করবেন বেয়াই মশায়। উনি আবার সাহিত্যরসিক লোক কিনা।

শিবু বলিল—না না, সে হয় না জামাইবাবু। ভারী অপ্রস্তুত হবেন ওরা।

গোপালবাবু বলিল—তুমি না গেলে হয়ত ভাববে তুমি রাগ করেছ, কারণ, জানতে ওরা পারবেই যে তুমিই স্টেশনে আনতে গিয়েছিলে।

শিবুকে দেখা দিতে হইল।

গোপালবাবু শিবুকে সঙ্গে লইয়া আসরে আসিয়া পরিচয় দিতেই গমগমে গরম আসরখানায় কে যেন জল ঢালিয়া দিল। বরযাত্রী সকলেরই মুখ কালো হইয়া গেল। বরকর্তা উঠিয়া আসিয়া জোড় হাতে সম্মুখে দাঁড়াইলেন। শিবু বলিয়া উঠিল—ডিটেক্‌টিভ নভেল লিখব বে-ই মশাই, তাই ছদ্মবেশ প্র্যাক্‌টিস করছি।

তুচ্ছ রসিকতা, কিন্তু ইহাতেই সকলে প্রাণ খুলিয়া হাসিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। ইহার পর কিন্তু দুরন্ত বরযাত্রীর দল সুবোধ বালক হইয়া গেল—যাহা পাইল তাহাই খাইল—যাহা অনুরোধ করা হইল তাহাই রাখিল।

বাড়ীতে আসিয়া একথা শিবনাথ প্রকাশ করিল না—গৌরীর উষ্মা আশঙ্কা করিয়া।

সেদিন সে পড়িবার ঘরে বসিয়া একখানা সাপ্তাহিকের একটা প্রবন্ধ পড়িতেছিল। প্রবন্ধটা গল্প সাহিত্যের উপরে লেখা—তাহাতে তাহার সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করা হইয়াছে। গৌরী ঘরে ঢুকিয়া একখানা খোলা চিঠি তাহার সম্মুখে ফেলিয়া দিল। শিবনাথ দেখিল, দিদি লিখিয়াছেন চিঠিখানা। সমস্ত কাহিনী সবিস্তারে বর্ণনা করিয়া পরিশেষে গৌরীকে তিরস্কার করিয়াছেন—তুমি নিশ্চয়ই শিবনাথের সেবা যত্নে মনোযোগী নও। রত্ন পাইয়া তুই চিনিলি না পোড়ারমুখী!

শিবনাথ মুখ তুলিয়া গৌরীর দিকে চাহিল, তারপর ঈষৎ হাসিয়া বলিল—হ্যাঁ, বলিনি তোমাকে আমি।

অকস্মাৎ ঝর ঝর করিয়া কাঁদিয়া গৌরী কহিল—তুমি চেঞ্জে যাবে কি না বল? নইলে—কথা তাহার অসম্পূর্ণ থাকিয়া গেল।

শিবু বলিল—আবেগ ভাল নয় গৌরী, শোন, আমার কথা শোন!

গৌরী চোখ মুছিল, কিন্তু তাহার ঠোঁট দুইটী কাঁপিতেছিল। সে বলিল—লোকে তোমায় চাকর ভেবে অপমান করে, কতজনে কত কথা বলে। ও বাড়ীর হরির বৌ সেদিন কি বল্লে জান, বল্লে—দিদি, বড়ঠাকুর কি নেশা টেশা করেন যে এমন পাক দেওয়া—

তাহার কণ্ঠস্বর আবার রুদ্ধ হইয়া গেল।

শিবু হাসিয়া বলিল—এ যে তোমার মিথ্যে দুঃখ গৌরী!

গৌরী বলিল—না, মিথ্যে নয়। নিজের স্বামী সন্তান কুৎসিত হলেও কেউ সে কথা বল্লে বড় দুঃখ হয়। বুলুর কথা কি মনে নেই তোমার?

শিবু চমকিয়া উঠিয়া একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল, তাহার মনে পড়িয়া গিয়াছে।

গৌরী বলিল--বুলুর কথা ত তোমার ভোলবার নয়!

বুলু শিবনাথের মৃতা কন্যা। মেয়েটি শিবনাথের বড় প্রিয় ছিল। কিন্তু সে ছিল কালো, তাহার উপর চোখ দুটী ছিল ছোট ও ট্যারা।

গৌরী বলিল--মনে পড়ে তোমার, গাঙ্গুলীবাবুদের ঠাকুরবাড়ী থেকে যেদিন সে কাঁদতে কাঁদতে—

ঝর ঝর করিয়া গৌরী নিজেই কাঁদিয়া ফেলিল।

শিবনাথের মনশ্চক্ষের উপর ছবিটী ভাসিয়া উঠিল।

শিবনাথ বসিয়া জল খাইতেছিল সেদিন। অঝোর ঝরে কাঁদিতে কাঁদিতে চার বছরের মেয়ে বুলু আসিয়া দাঁড়াইল। সে তাড়াতাড়ি তাহাকে বুকে লইয়া প্রশ্ন করিল—কি হল মা, কে মারলে তোমাকে?

বুলু উত্তর দিতে পারিল না—চোখের জলে বুকের দুঃখ তখনও তাহার নিঃশেষিত হয় নাই। উত্তর দিল গঙ্গা, শিবনাথের বড় মেয়ে। সে বলিল—ওই ঠাকুরবাড়ী গিয়েছিলাম আমরা পূজা দেখতে। তাই ওদের গিন্নী বল্লে, এই কাদের ছেলে তুই? সরে যা! তা আমি বল্লাম--ও আমার বোন। তাই ওরা কি বল্লে জান বাবা--বল্লে, শিবুর মেয়ে! ওমা কি কুচ্ছিত হয়েছে এটা, চোখ দুটো আবার দেখ। শিবু বিয়ে দেবে কি করে গা! বুলু ছুটতে ছুটতে পালিয়ে এল। রাস্তা থেকে কাঁদতে কাঁদতে আসছে।

শিবনাথের মনে পড়িল, সেদিন সে বলিয়াছিল—মিথ্যে কথা মা. ওরা মিথ্যে কথা বলেছে; এই দেখ তুমি—আমার চেয়ে কত সুন্দর তুমি!

বুলু সান্ত্বনা পাইলেও শিবনাথের কথা বিশ্বাস করে নাই, সে বলিয়াছিল—বাবা, তুমি কালো আর আমি কালো! ওরা সব সুন্দর!

গৌরী তখন বলিতেছিল—সে আঘাত আমি জীবনে ভুলব না। তুমিও ত সেদিন কেঁদেছিলে।

শিবু দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল—ভুলিনি গৌরী!

গৌরী বলিল--তুমি হাস, কিন্তু আমার বুকে তেমনি আঘাত লাগে! তোমার খ্যাতিতে আমার তৃপ্তি হয় না। তোমার স্বাস্থ্য, তোমার শ্রীতে আমার বেশী তৃপ্তি।

শিবনাথ গৌরীর হাতখানি টানিয়া আপনার কাঁধের উপর রাখিয়া বলিল—

এখানটা বড় ধরেছে, একটু হাত বুলিয়ে দাও ত।

গৌরী নীরবে স্বামীর ঘাড়ে হাত বুলাইয়া দিতে আরম্ভ করিল। আরামে শিবনাথের চোখ বন্ধ হইয়া আসিতেছিল। মাথাটি হেলাইয়া সে গৌরীর বুকের উপর স্থাপন করিয়া বলিল—আজ থেকে তোমার হাতেই সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করলাম গৌরী। যা করবার তুমি কর।

চোখে জল মুখে হাসি মাখিয়া গৌরী বলিল—তা হ'লে আসছে সপ্তাহেই দিন দেখাই!

এবার চোখ খুলিয়া চোখে চোখ মিলাইয়া শিবু বলিল—কিন্তু আমি সুন্দর হলে আমাকে দেখে তোমার মনে কি বেশী আনন্দ হবে?

গৌরী আরক্তিম হইয়া উঠিল, বলিল—হবে, এর চেয়ে ঢের বেশী আনন্দ হবে।

বিস্ফোরণের ঠিক পূর্ব মুহূর্ত।

বারুদ দিয়ে তৈরী পলতেতে আগুন ধরালে সে আগুন যেমন বিদ্যুৎগতিতে এগিয়ে চলে বিস্ফোরকের মুখের দিকে, ঠিক তেমনি ভাবেই স্বামী-স্ত্রীর কথাবার্তার সুর চরম সংঘাতের দিকে এগিয়ে চলেছিল।

ভবেন্দ্র বললে,—হ্যাঁ তোমার নাম সার্থক, তুমি সুভাষিণী বটে। এত বিষ তোমার কথায়! সম্ভবত সমুদ্র মন্থনের শেষ কল্লোল—যে কল্লোলের সঙ্গে হলাহল উঠেছিল, তারই ধ্বনি ভগবান তোমার কণ্ঠে দিয়েছিলেন! ওই থেকেই তৈরী হয়েছে তোমার ভাষা।

শিক্ষিত চিন্তাশীল মানুষ ভবেন্দ্র; হুঙ্কার দিল না, স্থূল ভাবে আঘাত করলে না, কিন্তু সুভাষিণীর অন্তর ভেদ করে সব যেন ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দিলে। ছেলেবেলায় সুভাষিণী গল্প শুনেছিল এক সিদ্ধ অস্ত্রনির্মাতার; সে তলোয়ার তৈরী করত—বড় বড় গাছের কাণ্ড যে তলোয়ারের কোপে দ্বিখণ্ডিত হয়ে যেত কিন্তু পড়ে যেত না। যেমনকার গাছ তেমনি দাঁড়িয়েই থাকত, শুধু শুকিয়ে যেত তার পত্রপল্লব—ঝরে পড়ত ফুল-ফল। এ যেন তেমনি আঘাত। সুভাষিণী পল্লীগ্রামের বড়লোকের ঘরের মেয়ে, শিক্ষিতা নয়, কিন্তু মুখরা, প্রচণ্ড মুখরা; স্বামীর কথার সূত্র অনুসরণ ক'রে পৌরাণিক উপমা সংগ্রহ করেই সে উত্তর দিলে.– আর তোমার? তোমার কথার পরতে পরতে অমৃত! সুধা! সুধা ঝরে পড়ছে। ব্রজের বাঁশীর মধুর সুরের ধ্বনি তোমার কণ্ঠে ভগবান দিয়েছেন—না?

এর পরই সে ফেটে পড়ল, চীৎকার ক'রে ব'লে উঠল,—তুমি বল না মন্দ কথা?

শান্ত স্বরে ভবেন বললে,—না। মন্দ কথা, অন্যায় কথা, কুৎসিত কথা আমি বলি না। আমি বলি কঠোর সত্য কথা। তুমি তা সহ্য করতে পার না। হাত-পা থাকলেই মানুষ হয় না সুভাষিণী; আকৃতির সঙ্গে প্রকৃতির পরিবর্তনের দরকার হয়। সূর্যের আলোকে সহ্য করতে পারে না বলে পশু

দিনের বেলা লুকিয়ে থাকে জংগলের অন্ধকারে—গুহার অন্ধকারে। মানুষের মধ্যে প্রকৃতিতে যারা পশুত্বকে ছাড়াতে পারে না তারা সত্যকে ভয় করে সূর্যের আলোর মত। সূর্যের আলো শুধু তো সাদাই নয়, তার উত্তাপ আছে, কঠোর উত্তাপ।

—তার মানে আমি পশু, আমি জানোয়ার?

—যে চীৎকারটা তুমি করছ সুভাষিণী, সে কি শুনতে পাচ্ছ না? বুঝতে পারছ না জানোয়ারের গর্জনের সংগে কতখানি মিল রয়েছে? একটু এগিয়ে যাও ওই আয়নাটার দিকে—নিজের মুখের চেহারা দেখ, তোমার পরিষ্কার দাঁতের ডগায় কি ধার ঝিলিক মারছে দেখ। তা হ'লে বুঝতে পারবে।

সুভাষিণী শরবিদ্ধ পশুর মত যন্ত্রণায় অধীর হয়ে নিজের আহত স্থানটিকে কামড়ে ধরতে চাইলে; ভাবলে, ওইখানেই আছে তার আঘাতকারী শত্রু। সে নিষ্ঠুর ক্রোধে দেওয়ালের গায়ে নিজের মাথা ঠুকে বলে উঠল,—মরুক মরুক, জানোয়ার মরুক; তোমার শিকার করা সার্থক হোক।

ভবেন্দ্র দাঁড়িয়ে রইল, এক পা এগিয়ে গেল না তাকে ধরতে, বা একটি কথা বললে না সুভাষিণীকে ক্ষান্ত হবার জন্য। সে জানে সুভাষিণী এ ভাবে মাথা ঠুকে মরতে পারে না। জীবনে স্বার্থই যার সর্বস্ব, সামান্য এতটুকু পার্থিব বস্তু যে ত্যাগ করতে পারে না, সে জীবন ত্যাগ করবে কি করে? কয়েক মুহূর্ত পরেই ভবেন্দ্রের অনুমান সত্য হ'ল সুভাষিণী দেওয়ালের কাছ থেকে প্রায় ছুটে এগিয়ে এল ভবেন্দ্রের দিকে। এবার ভবেন্দ্র শিউরে উঠল। সুভাষিণীর কপাল ফুলে উঠেছে, খানিকটা ছেঁচে গিয়েছে, রক্ত বেরিয়ে আসছে সেই ক্ষতস্থান থেকে। ভবেন বলে উঠল,—সুভাষিণী!

গ্রাহ্য করলে না সুভাষিণী, সে শেষ আক্রমণ করবার জন্য দাঁত নখ বের ক'রে ছুটে এসেছে, টুক্‌রো টুক্‌রো করে ছিঁড়ে ফেলবে সে ভবেন্দ্রকে। এবার সে উলংগ আক্রমণ করলে বললে—আমি জানোয়ার, তুমি দেবতা! তুমি অক্ষম, তুমি অপদার্থ, উপার্জন করবার তোমার ক্ষমতা নেই, তাই তুমি পরোপকার আর দেশোদ্ধারের ভাণ করে মাথা উঁচু করে টো-টো ক'রে ঘুরে বেড়াও, জেল খাট। তুমি স্ত্রীর টাকা দান করে দাতা সাজ। অর্থ তোমার নেই, তাই তুমি নিঃস্বার্থ। লজ্জা করে না তোমার, আমার বাপের দেওয়া টাকা এই ভাবে খরচ করতে? তোমার বাপের ভিটে দেনার দায়ে নীলামে চড়ে, আমার বাপের দেওয়া টাকায় দেনা শোধ করে সে ভিটে বাঁচে। তুমি যাও সত্যাগ্রহ করতে!

একবারও মনে ভেবে দেখ না, যুবতী স্ত্রী কি খাবে, কি পরবে, কে দেখবে তাকে! তার ওপর তুমি পঞ্চাশ-পঞ্চান্নটা ভিখিরী জুটিয়ে এনেছ, তাদের খেতে দেবে ব'লে। তাতেই আমি আপত্তি করেছি, সেইজন্য আমি জানোয়ার। নির্লজ্জ কোথাকার, বেহায়া কোথাকার! ভিখিরী যে সেও ভিক্ষে করে স্ত্রীকে খেতে-পরতে দেয়, চোর চুরি ক'রে স্ত্রীকে প্রতিপালন করে।

ভবেন্দ্র মাথা হেঁট করে পিছন ফিরলে। দরজার দিকে পা বাড়ালে।

পিছন থেকে তার জামার পিছনটা চেপে ধরলে সুভাষিণী।

—কোথায় যাবে তুমি? উত্তর দিয়ে যাও আমার কথার।

ভবেন্দ্র বললে,—জীবনের সাধ আমার মিটে গেল সুভাষিণী। তোমায় মুক্তি দিয়ে আমিও মুক্তি নিতে চল্লাম। ছেড়ে দাও আমাকে।

নিষ্ঠুর বিদ্রূপে ব্যঙ্গ করলে সুভাষিণী,—ছেড়ে দাও আমাকে! আমাকে মুক্তি দিতে যাচ্ছেন, মুক্তপুরুষ, সাধুপুরুষ! দাঁতে দাঁত চেপে কঠিন স্বরে সে আবার বললে,—আমার দেনা শোধ কঁর তুমি। আজ পর্যন্ত তোমার কাছ থেকে সাড়ে তিন হাজার টাকা পাব। যখন যা দিয়েছি—পাই-পয়সা আমি লিখে রেখেছি।

ভবেন্দ্র বললে,—জন্মান্তর। জন্মান্তরে সুদ শুদ্ধ শোধ করবো।

বলেই সে জোর করে জামার খুঁট্‌টা ছাড়িয়ে নিয়ে বেরিয়ে গেল।

সুভাষিণীও কঠিন ক্রোধে ছুটে নেমে এল নীচে। কিন্তু ভবেন্দ্র দ্রুততর গতিতে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেছে। কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে সে দাঁড়িয়ে রইল উঠানে—তারপর উপরে উঠে গেল, ঘরে খিল দিয়ে খুঁজতে লাগল একগাছা দড়ি, একটা টেবিল, একটা টুল; উপরের দিকে চেয়ে দেখলে, খড়ে ছাওয়া কোঠা ঘর, চালের কড়িগুলো অনেক উঁচুতে। অনেক উঁচু! তা-হোক! হোক অনেক উঁচু, খাটের উপরে টেবিল, তার উপরে চেয়ার, তার উপরে টুল,—নাগাল পাওয়া যাবেই! দড়ি পাওয়া যাবে বাইরের ঘরের পূব দিকের দেয়ালের কাছে যে কাঠের সিন্দুকটা আছে তার ভিতর। চাষের জিনিসের মধ্যে আছে লাঙলের দড়ি। হাতে পাকানো শণের মজবুত দড়ি—অন্তত হাত আষ্টেক লম্বা!

টেবিলটা টানলে সে।

ঠোঁটে তার অতি নিষ্ঠুর ব্যঙ্গহাস্য ফুটে উঠেছে। যত ধারাল, তত বাঁকা। ঠোঁট দুটি সত্যসত্যই গুণ দেওয়া ধনুকের মত বেঁকে গেছে।

লোকে তাকে বলে ভাগ্যবতী। স্বামীভাগ্যে ভাগ্যবতী! রূপবান, গুণবান, মহৎ, পণ্ডিতলোক ভবেন্দ্র! লোকে বলে এ গ্রাম বহু তপস্যা করে তাকে পেয়েছে।

গুণবান! মহৎ ! পণ্ডিত!

তার বাবা এবং মাও এই ভ্রান্তিতে আচ্ছন্ন হয়ে তাকে ভাসিয়ে দিয়ে গেছেন। গ্রামেরই ছেলে ভবেন্দ্র, শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন তার বাবা, লোকে বলত নির্লোভ মানুষ। দেহের গৌরবর্ণের স্নিগ্ধতার দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে তারা বলত, বর্ণচ্ছটা এমন হয় না—এ হল পুণ্যচ্ছটা। একটি শিশু ছেলে আর একটি শিশু মেয়ে রেখে মারা যান; মা ছিলেন বিনীতা, মধুর স্বভাবের মেয়ে—তিনিই মানুষ করেছিলেন ছেলেকে মেয়েকে। মেয়ের বিবাহ দিতে ব্রহ্মত্র জমিটুকু বিক্রী করেছিলেন। ভিটেটুকু বন্ধক দিয়েছিলেন। যজমানদের সাহায্যে চলত সংসার। দীপ্তিমান ছেলেটি, স্থানীয় স্কুলে ছিল ফ্রি। ইস্কুলের নাম উজ্জ্বল করবে—ভরসা করতেন শিক্ষকেরা।

সুভাষিণীর ঠোঁট দুটি আরো বেঁকে গেল। যেন ছিলায় ধরে টান দিলে ধনুকে। দীপ্তি! ঝকমকানি দেখলেই মানুষ তাতে দেয় মহামূল্য। গিল্‌টিকে ভুল করে সোনা বলে, কাচকে ভ্রম করে হীরা বলে! বাবাও তার সেই ভ্রম করেছিলেন। একদিন রেল স্টেশনে তিনি নামছিলেন ট্রেন থেকে। দেখলেন, লাইনের ডি-টি-এস্‌ একজন ইংরেজের সঙ্গে মাথা উঁচু করে নির্ভয়ে বাদ-প্রতিবাদ করছে ভবেন্দ্র। দীপ্ত গৌরবর্ণ কিশোর যেন অকম্পিত শিখার মত জ্বলছে। বোর্ডিংয়ের একটি ছেলে স্টেশন কম্পাউণ্ডের গাছ থেকে ফুল পাড়ছিল। সায়েব ছিলেন লাইনের উপর, কেটে-রাখা সেলুনের মধ্যে। ইনস্‌পেকশনে এসেছিলেন। তিনি ছেলেটিকে ডেকে চোর বলে অপমান করেই ক্ষান্ত হননি—তাকে উপলক্ষ্য করে সমস্ত দেশীয় ছেলেকেই চোরের জাত, নিগারের জাত বলে গাল দিয়েছিলেন। ভবেন্দ্রও ছিল সেখানে, সে নির্ভয়ে সায়েবের গাড়ীর হাতল খুলে গাড়ীতে ঢুকে প্রতিবাদ করেছিল। সুভাষিণীর বাপ ছিলেন বড় ব্যবসায়ী। তিনি সেদিন না থাকলে হয় তো ভবেন্দ্র সেই দিনই জেলে যেত। ইংরেজ রাজত্ব। খাস ইংরেজ ডি-টি-এস্‌! সুভাষিণীর বাবা ভবেন্দ্রের সাহস দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। সেদিন বাড়ী ফিরেই সুভাষিণীর মাকে বলেছিলেন,—ছেলেটিকে জামাই করলে হয় না? সুভাষিণীর মা স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে বলেছিলেন,—ঠাট্টা করছ, না সত্যি

বলছো? বড় ভাল ছেলে। আমার সাধ হয়। আমার চোখের সামনে থাকে। তা ছাড়া, কিছু মনে করো না, যে মুখরার বংশ তোমাদের! গাঁয়ে ঘরে গরীবের ছেলে—বিয়ে দিলে সুভাষিণীর আদর হবে।

বাবা বলেছিলেন,—মন্দ বলনি। দেখি, ভেবে দেখি। আমার সাধ বিদ্বান জামাইয়ের। আমার ছেলেরা তো বড়লোকের ছেলে, লেখাপড়া শিখলে না! ও ছেলে লেখাপড়া শিখবে। কি সুভো, বিয়ে করবি ওই ভবেনকে?

সুভাষিণীর বয়স তখন সবে এগারো, সে হেসে পালিয়ে গিয়েছিল। তার ভাল লাগত ভবেনকে। সুভাষিণীর ছোড়দার সঙ্গে পড়ত। ছোড়দা কোন রকমে পাশ করত, ভবেন হ'ত ফার্স্ট। ছোড়দার সঙ্গে সুভাষিণীর ছিল ঝগড়া; ছোড়দা কোন মতেই দেখতে পারত না ভবেনকে, তাই সুভাষিণীর ভাল লাগত তাকে। শুধু ওই জন্যেই নয়, আরও কিছুর জন্যেও ভাল লাগত। ওই গিল্টির ঝকমকানিতে সেও ভুলেছিল। গৌরবর্ণ দীর্ঘ দেহ ছেলেটিকে দেখে তারও ভাল লাগত।

যাক্—আজ হয়ে যাক সে ভাল-লাগার প্রায়শ্চিত্ত। সে টেবিলটাকে টেনে তুলতে লাগল খাটের উপর। ভারী টেবিল, খাটের উপরে উঠে টেবিলখানাকে টানলে; কিন্তু ঝোঁক সামলাতে পারলে না. মাথা নিচু করে পড়ে গেল, টেবিলটা উল্টে গিয়ে তারই টানে মাটিতে আছাড় খেয়ে পড়ল।

ভবেন চলেছিল ট্রেনে। একটা কামরার এক কোণে চোখ বুজে সে বসে ছিল। আজ সে মুক্তি পেয়েছে।

যৌবনের প্রারম্ভে একটা নিদারুণ ভ্রান্তির ফলে নাগপাশে জড়িয়ে ফেলেছিল নিজেকে। স্কলারশিপ পেলে ম্যাট্রিকে। সুভাষিণীর বাপ—এ অঞ্চলের প্রসিদ্ধ ধনী, তার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে চাইলেন। ভবেন মনে করলে এ তার বিশ্বজয়ের গৌরব। হায় রে ভ্রান্তি! পল্লীগ্রামের দরিদ্রের সন্তান, বিশ্ব তার কাছে তখন এমনি ছোটই ছিল। এ অঞ্চলের রাজা; তিনিই ছিলেন তার কাছে পৃথিবীর রাজা। দাম্ভিক ধনী তার কাছে মাথা হেঁট করলেন! তখন সে কি ভেবেছিল—ধনীর ওই কন্যাটির অন্তর এত কদর্য। স্বার্থপর সুভাষিণী; অহংকৃতা দুর্বিনীতা সুভাষিণী! আশ্চর্য! এতদিন —আজ সাত বৎসর তার সঙ্গে বাস করলে, তবু তার এতটুকু পরিবর্তন হল না! কলকাতায় পড়তে গেল ভবেন। বাইরের পৃথিবী দেখে তার চিত্ত

সূর্যালোক-সংকেতে নূতন অঙ্কুরটির মত আকাশের দিকে মাথা ঠেলে উঠতে লাগল। তার বংশ-সম্পদের লোভ নেই। পুরুষানুক্রমে এই সাধনাই তারা ক'রে এসেছে। পণ্ডিতের বংশ, পরমরহস্যের সন্ধানই ছিল তাদের বংশগত সাধনা। সেই সাধনা নূতন শিক্ষার খাতে পড়ে নূতন মুখে ছুটল। গ্রহণ করল সে গান্ধীজীর আদর্শ। আরম্ভ হল সংঘাত।

সুভাষিণী বলেছিল,—মা গো! এ কি ছিরি করেছ নিজের! হাঁটু পর্যন্ত খাটো মোটা কাপড়, গায়ে একটা আধ বাঁইয়া—এর চেয়ে যে চাষাভূষোর পোশাক ভাল। মাথার চুল কদম-ফুলি করে ছেঁটেছ—আয়নাতে দেখেছ নিজের ছিরি? —ও সব ছাড়।

ভবেন বলেছিল,—না; তোমাকেই বরং ছাড়তে হবে জর্জেট-বেনারসী-পপ্‌লিন্‌।

—কি দায় আমার। কেন ছাড়ব?

—সে হবে না।

—হবে না তোমার কথায়? এ সব তুমি দিয়েছ আমাকে? আমার বাবা আমায় টাকা দিয়ে গেছেন, সেই টাকায় আমি পরি।

এই সুরু। তার পর একটার পর একটা। ভবেনের প্রথম জেল হ'ল হলওয়েল মনুমেণ্ট অপসারণ আন্দোলন নিয়ে। বি, এ পরীক্ষা দেওয়া হ'ল না। জেল-গেটে আটক বন্দী হল। তারপর গ্রামে এসে কাজ সুরু করলে।

সুভাষিণী বললে,—শেষে তুমি এই করলে! আমার কপালে আগুন ধরিয়ে দিলে? লেখাপড়া ছাড়লে, চাকরি করবে না—গাঁয়ের যত ছোটলোক নিয়ে পাঠশালা, সেবাসমিতি—এ করে শেষে খাবে কি? হাওয়া?

ভবেন বলেছিল,—খাওয়াব তোমাকে আমি, নিশ্চিন্ত থাক। কিন্তু তার জন্যে আমার সঙ্গে খাটতে হবে।

—খেটে খেতে হবে! কাজ নেই সে অন্নে। আমার বাবা আমাকে পঁচিশ হাজার টাকা দিয়েছেন, তাতেই আমার চলে যাবে।

ভবেন খেতো মোটা চালের ভাত, দাল, একটা তরকারি। বাড়ীতে সে তার জন্যে স্বতন্ত্র রান্নার ব্যবস্থা করেছিল। সুভাষিণীর সংসারের জন্য ব্যবস্থা ছিল তার রুচিমত। এই নিয়ে অনেক অশান্তি হয়ে গেছে। সুভাষিণীর জেদ—তার রুচি অনুসারে খেতে হবে। ভবেন চলত নিজের রুচি নিয়ে।

সে রুচি জোর করে সুভাষিণীর উপর চাপাবার পক্ষপাতী ছিল না সে; সুভাষিণীর সে জেদ ছিল।

তারপর যুদ্ধের প্রারম্ভে মহাত্মাজী সুরু করলেন ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ। এ জেলায় সে হল দ্বিতীয় সত্যাগ্রহী। সেই জেল থেকে বেরিয়ে এসেছে মাত্র দশ দিন।

দেশে লেগেছে দুর্ভিক্ষ। সঙ্গে সঙ্গে মড়ক।

সে কয়েক দিন ঘুরে নিজের বাড়ীতেই খুললে সাহায্য-কেন্দ্র। আজকার বিরোধ সেই নিয়ে। সুভাষিণী বললে,—দেব না, ওসব করতে দেব না আমি।

ভবেন বলেছিল,—তোমার কিছু লাগবে না, আমি ভিক্ষে করে সংগ্রহ করব।

—না, লাগবে না! তা হলে তো ওরাই ভিক্ষে করে খেয়ে বাঁচতে পারে। আমি জানি শেষ পর্যন্ত—

—না সুভাষিণী, সে লাগবে না তোমাকে।

সুভাষিণী বলেছিল,—না, তোমার কথায় এতটুকু বিশ্বাস নেই আমার।

স্তম্ভিত হয়েছিল ভবেন,—আমায় তুমি অবিশ্বাস কর?

—করি! সংসারে যারা অক্ষম, তারাই অবিশ্বাসী। দেবতার টাকা, গুরুর টাকা তারা ভেঙ্গে ফেলে। আমি তোমার স্ত্রী—আমার দন্ডমুণ্ডের মালিক তুমি। সঙ্গে সঙ্গে জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বাইরের বাড়ীতে যারা সাহায্য-কেন্দ্রের কাজ করছিল তাদের চীৎকার করে বলতে গিয়েছিল—বেরিয়ে যাও, বেরিয়ে যাও! বাধা দিয়েছিল ভবেন। চাপা গলায় গম্ভীর ভাবে বলেছিল—সুভাষিণী!

সুভাষিণী বলেছিল,—না-না। তোমার চোখ-রাঙানিকে ভয় করি না আমি। নির্গুণ পুরুষের ফণা কূলোর মতই বড় হয়, ফোঁসফোসানিও তেমনি মারাত্মক হয়. কিন্তু বিষ থাকে না।

ভবেন কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ থেকে আত্মসম্বরণ করে বলেছিল,—হ্যাঁ তোমার নাম সার্থক. তুমি সুভাষিণী বটে!

যাক. আজ মুক্তি পেয়েছে সে। শেষ হয়ে গেল দ্বন্দ্বের। ভগবানকে সে ধন্যবাদ দিলে মনে মনে। এমনি করেই তুমি চরম আঘাত দিয়ে বন্ধনমুক্ত করে দাও, তাই তো তুমি বন্ধনহারী। চোখ থেকে গড়িয়ে পড়ল তপ্ত অশ্রুর দুটি

ধারা। সে জল সে মুছলে না। গাড়ীটা একেবারে খালি। বেয়াল্লিশ সালের শেষ, কলকাতা-গামী ট্রেন প্রায়-জনশূন্য। কলকাতায় বোমা পড়ছে। অনেক-খানি চোখের জল বেরিয়ে যেতে সে খানিকটা সুস্থ হ'ল। মনে মনে নিজেকে বললে, তোমার প্রেমে আঘাত আছে, নেই কো অবহেলা। এ সত্যি—এ সত্যি। আঘাত দিয়ে তুমি আমাকে মনে করিয়ে দিলে—আমি তোমাকে ভুলে ছিলাম। আমার বংশগত সাধনার ধারার মুখে নিজেই দিয়েছিলাম বাঁধ। সে বাঁধ আজ খুলে গেল। সকল কিছুর উপরে তুমি। আমি তোমাকে চাই, তোমার সন্ধানে যাব আমি।

এবার সে বাইরের দিকে চাইলে। হু হু করে ট্রেন চলেছে। রাত্রি হয়ে গেছে। অন্ধকার। এমনি চিন্তানিমগ্ন ছিল সে, কতদূর এসেছে সে খেয়ালও তার নেই। নড়েচড়ে বসলে সে আবার। কলকাতা নয়। সামনের যে-কোন বড় স্টেশনে নেমে পড়বে। চলবে সে পশ্চিমে। দূর—সুদূর উত্তরে, শান্তিময় হিমালয়—ভারতবর্ষের আত্মজ্ঞান লাভের সিদ্ধ বেদী।

ট্রেন এসে থামল ব্যাণ্ডেলের খানিকটা আগে। চারিদিকে গভীর অন্ধকার। আকাশে গুরু গুরু গুরু গুরু শব্দ উঠছে। প্লেন উড়ছে। সাইরেন হয়েছে। হঠাৎ চকিতে দীপ্তি চমকে উঠল আকাশে। আকাশ আলো হয়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে বিস্ফোরণের শব্দ হ'ল। কাছেই কোথাও এয়ার রেড আরম্ভ হয়েছে।

মরবে? সে মরবে? এমন সুযোগ! নেমে পড়ল সে গাড়ী থেকে।

চার বৎসর পর।

চরকা-কাটা শেষ ক'রে সুভাষিণী উঠল। ঘড়িতে আটটা বেজে দশ মিনিট। দশ মিনিট দেরি হয়ে গিয়েছে। তাড়াতাড়ি দেওয়ালের হুকে ঝোলানো খদ্দরের ঝুলিটা নামিয়ে কাঁধে তুলে বেরিয়ে পড়ল।

ঘর থেকে বেরিয়ে আবার ফিরল। জীবনে ব্যস্ততাটা কিছু নয়। ভুল হয়ে যায়। ফিরে দেওয়ালের গায়ে টাঙানো ভবেন্দ্রের ছবির নীচে দাঁড়িয়ে প্রণাম করলে। ছবিখানি সে অনেক সন্ধান করে সংগ্রহ করেছে জেলা কংগ্রেস-কমিটির সভাপতির কাছ থেকে। ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহের দণ্ডভোগের শেষে জেল থেকে যেদিন ভবেন্দ্র বেরিয়েছিল সেই দিন ছোট ক্যামেরায় ছবিখানি তুলেছিল সভাপতির ছেলে। ছবিখানিকে বড় করে করিয়ে নিয়েছে সে। ছবিতে টাটকা ফুলের মালা ঝুলছে। সকালেই সে মালা গেঁথে পরিয়েছে। প্রণাম করে সে

বেরিয়ে পড়ল। সেবা-সমিতিতে যেতে হবে। তারপর মেয়েদের ইস্কুলে। দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর গ্রামের বয়স্কা মেয়েদের আসর। সন্ধ্যায় নৈশবিদ্যালয়।

সুভাষিণীর প্রচণ্ড পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে। পড়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল সে। আহত অজ্ঞান অবস্থাতেই ভাইয়েরা তাদের বাড়ী নিয়ে গিয়েছিলেন। তারপর সে যমে-মানুষে টানাটানি। ছমাস পর সেরে উঠে বসল যেদিন সেদিনই সে বড় বৌদিকে ডেকে বললে,—আমি এইবার ওবাড়ি যাব। রোগের মধ্যেই অনেক কথা তার কানে এসেছে এ বাড়ির। সবই ভবেন্দ্রের এবং তার সমালোচনা। নীরবে সে সব সহ্য করেছে। ভাইরা দিয়েছেন ভবেন্দ্রকে গালাগালি। বউয়েরা দিয়েছেন সুভাষিণীকে দোষ। এর মধ্যে সে শুধু ভেবেছে। শুধুই ভেবেছে। ভাবতে ভাবতে অনেক অভিমান, অনেক ক্ষোভ, অনেক আত্মগ্লানির সংঘর্ষের মধ্যে তার অনেক ভাঙ্গা-গড়া হয়ে গেল। স্বামীর বাড়ী ফিরে সে আরম্ভ করলে নূতন জীবন। প্রথমেই সে ভাইদের ফিরিয়ে দিলে তার বাপের দেওয়া টাকা। বললে,—আমায় এই দণ্ডের মূল থেকে মুক্তি দাও দাদা। এ হল রক্তমুখী নীলা—যার কাছে থাকে তার ওপর এর প্রভাব ফলবেই।

বড় ভাই বললেন,—সেটা ভাল দেখাবে না সুভাষিণী। তার চেয়ে দানটান কর।

ছোট ভাই—তার ছোড়দা নিজের অংশটা নিলেন। ইতিমধ্যেই তার অভাব দেখা দিয়েছে।

সুভাষিণী অর্ধেক টাকা দিয়ে আরম্ভ করলে স্বামীর ফেলে-যাওয়া কাজ।

ভবেন্দ্রের সন্ধান মিলল না।

জেলা কংগ্রেস সভাপতি অনেক সন্ধান করেছেন কর্মীদের বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে, সন্ধান মেলে নি। ভাইরা সন্ধান করলে জেলা আই-বি অফিসারের মারফৎ, জেলে জেলেও খবর করা হল—মিলল না সন্ধান।

সুভাষিণীর কানে একটা কথা মধ্যে মধ্যে বেজে ওঠে—জন্মান্তরে, জন্মান্তরে সুদ শুদ্ধ শোধ করব।

সে সঙ্গে সঙ্গে ছুটে চলে যায় ঘরের কোণে। কাঁদে।

হয় সে নেই, নয় সে সন্ন্যাসী হয়ে গেছে। সুভাষিণী তখন তাকে জেনেও জানে নি, আজ তার কাছে সব স্পষ্ট—প্রত্যক্ষ।

স্কুলের মেয়েরা গান গাইছিল। স্কুল বসার সুরুতেই গান হয়ঃ

'ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলে আগুন জ্বালো—আগুন জ্বালো!'

হঠাৎ সামনের রাস্তায় এসে দাঁড়াল একখানা প্রকাণ্ড মোটর। কে এল? চঞ্চল হয়ে উঠল মেয়েরা। ভ্রূ কুঞ্চিত করে সুভাষিণী বললে,—ভুল হচ্ছে; মন দিয়ে গাও।

গাড়ী থেকে নেমে এল তার ছোড়দা।—সুভি!

মুখ তুলে তাকালে সুভাষিণী।

গাড়ীতে এসেও ছোড়দা হাঁপাচ্ছে। হাঁপাতে হাঁপাতে বললে,—ভবেন এসেছে, সুভি, বাড়ী আয়।

—কে? কে এসেছে? থর থর করে কাঁপতে লাগল সুভাষিণী।

—ভবেন। ভবেন এসেছে। আমাদের ওখানে রে। এই তো তার গাড়ী। মস্ত বড়লোক হয়েছে। এই তো তার গাড়ী, দেখ না কত বড়? তিরিশ হাজার টাকা দাম। সুটখানা পরে আছে—তার দাম কম-সে-কম পাঁচশো। আমরা তো চিনতেই পারি নি।

সুভাষিণীর দেহের কম্পন স্থির হয়ে এল। স্থির দৃষ্টিতে সে ছোড়দার দিকে চেয়ে রইল।

ছোড়দা বলেই গেল—না বলে যেন তার তৃপ্তি নেই, স্বস্তি নেই, মুক্তি নেই; বললে,—বাঁশবেড়েতে যেদিন বম্বিং হয়, সে সময় ব্যাণ্ডেলের ওখানে একজন বড় মিলিটারি অফিসার জিপ্ উলটে পড়েছিল রাস্তার ধারে। ভবেন দেখতে পেয়ে তাকে জিপের তলা থেকে বের ক'রে সেবা ক'রে জ্ঞান ফিরিয়ে স্টেশনে নিয়ে যায়, সেখান থেকে হাসপাতালে। ব্যস্, আর কি? হা-হা করে হেসে ভবেন বললে—যাচ্ছিলাম সন্ন্যাসী হ'তে। বুঝেছ না; good luck—অফিসার আমাকে সে foolish কর্ম থেকে রক্ষা করলেন। বললেন—Young man, চল আমার সঙ্গে। তারপর মিলিটারী কনট্রাক্ট। একটার পর একটা। লক্ষর পর লক্ষ। সুভাষিণী was my inspiration, বুঝেছ না! Run on—run on, run on—বুঝেছ না—দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটেছি। অবশেষে পরশু—স্বপ্ন দেখলাম সুভাকে। মন চঞ্চল হয়ে উঠল। ভেবেছিলাম কোটী পূরণ না করে ফিরব না। কিন্তু থাকতে পারলাম না। কাল রাত্রে বেরিয়ে পড়লাম। ভাবলাম, না পুরুক কোটী, বাকি তো কুড়ি লক্ষ—সেটা সুভাকে নিয়ে এসেই পুরিয়ে নেব।

সুভাষিণী চোখ বুজল।

তার মনশ্চক্ষের সম্মুখে পৃথিবীর অন্তরলোক টলছে, কাঁপছে, সেখানে ভূমিকম্প সুরু হয়েছে।

ছোড়দা বললে,—তুই এখন এই সব করছিস শুনে যা হা-হা-হা করে হাসলে! বললে—আরে রাম-রাম, আমার ভূতটা শেষে ওকে পেয়ে বসল? —আয়! সুভি!

সুভাষিণী হাত বাড়িয়ে বললে,—আমার হাতটা ধর।

প্রকান্ড বড় চকচকে গাড়ী, ত্রিশ হাজার টাকা দাম। দরজাটা খুলতে খুলতে ছোড়দা বললে,—আমি মদ খাই বলে অনেক কথা বলতিস। চল দেখবি, ভবেন একেবারে চুরচুরে হয়ে আছে। সঙ্গে একটা বাক্সবন্দী বিলিতী মদ।

পৃথিবীটা ভেঙ্গে পড়ে গেল—সুভাষিণী চীৎকার করে উঠল—ভূমিকম্প...

সভয়ে হাত ছেড়ে দিলে তার ছোড়দা। সুভি!

সুভাষিণী পড়ে গেল মাটিতে। পরক্ষণেই উঠে ছুটতে সুরু করল। ছুটল নিজের বাড়ীর দিকে।

ছোড়দার কথা শুনে ভবেন হেসে আকুল হ'ল। বললে,—শক্ পেয়েছে। সামলাতে দাও। আমি ততক্ষণ স্নানটা সেরে নিই! কাল রাত্রে পানের মাত্রা বেশি হয়েছিল। মাথা reel করছে।

সুভাষিণী ছুটে এসে উপরে উঠে দরজা বন্ধ করে দিলে।

চালের কাঠের দিকে তাকালে।

ধীরে ধীরে খাটের উপর তুললে টেবিলটা।

তার ওপর চাপালে চেয়ার—তার উপরে টুল।

অকম্পিত হাতে খুলে নিলে সেই লাঙলের দড়িটা—সেটা ওই ঘরেই লম্বা করে টাঙানো ছিল কাপড় রাখার জন্য।

ছবির দিকে তাকিয়ে প্রণাম করে বললে,—শেষে প্রেতমূর্তি ধরে আমাকে ভয় দেখাতে এসেছ!

তারপর সহাস্য তিরস্কার করলে—ছি! ছি!

রা ঙা দি দি

একে পটুয়ার মেয়ে—তার উপর বৃদ্ধের তরুণী ভার্যা। ঠিক যেন জীর্ণ প্রাচীন সহকার-বিহারিণী আলোকলতা। জীর্ণ সহকারকে আপনার দেহজালের জটিল বেষ্টনে আচ্ছন্ন করিয়া যেমন আলোকলতার অগ্রভাগগুলি সাপিনীর মত আশপাশের সরস সহকারগুলির দিকে উদ্যত হইয়া নাচে, বৃদ্ধ গণপতি পটুয়ার তরুণী ভার্যা সরস্বতীও ঠিক তেমনি করিয়া হেলিয়া দুলিয়া যেন নাচিয়া ফেরে।

গণপতি পটুয়া এ অঞ্চলের পটুয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে বিখ্যাত গুণী। তাহার হাতের আঁকা পট সাহেব-সুবায় কিনিয়া লইয়া যায়;—এমন নিখুঁত পটল-চেরা চোখ ঠিক তিলফুলটির মত নাক, এমন মুঠিতে ধরা কোমর, এমন সুডৌল কলসীর মত বুক—এ আর কাহারও তুলিতে ফুটিয়া ওঠে না। গণপতি শুধু তুলির টানে পট আঁকিতে বা হাতের কৌশলে পুতুল-প্রতিমা গড়িতেই ওস্তাদ নয়, তাহার রচনা করা পটমাহাত্ম্যগান, দেবদেবীর নানা লীলার গানও বিখ্যাত। গণপতির গান নাকি গেজেটে ছাপা হইয়াছে! 'দুর্গাঠাকরুণের শাঁখা পরা' 'শিবের মাছধরা' 'শিবের চাষ' 'শ্রীকৃষ্ণের মৃত্তিকাভক্ষণ' প্রভৃতি অনেক পালা-গানই সে রচনা করিয়াছে। এ অঞ্চলের পটুয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে ধনে-মানে-গুণে গণপতি শ্রেষ্ঠ লোক। বৃদ্ধ বয়সে সেই লোক, সরস্বতী পটুয়ানীকে দেখিয়া দিগ্বিদিক জ্ঞান হারাইয়া শেষ পর্যন্ত তাহাকে বিবাহ করিয়া বসিল। সরস্বতীর বাপ-মা গণপতির টাকা দেখিয়া অমত করিল না, অনেকগুলি টাকা দিয়া বুড়া সরস্বতীকে ঘরে আনিয়া তুলিল। বুড়ার কয়জন সম্পর্কিত নাতি নিজেরা পয়সা খরচ করিয়া মুচিদের ডাকিয়া বাজনা বাজাইয়া দিল—ঢাক ও শিঙা! বুড়া গণপতি কিন্তু অদ্ভুত লোক, সে ইহাতে রাগ করিল না, নাতিদের আদর করিয়া বসাইয়া পেট পুরিয়া মিষ্টি খাওয়াইয়া ছাড়িল।

কথাতেই আছে—"পটোনী আর নটোনী, চালচলনে এক ছন্দ, কে ভাল আর কে মন্দ!" 'পটোনী' অর্থাৎ পটুয়ার মেয়ে, আর 'নটোনী' অর্থে নটিনী এ দুইই নাকি এক; চলনে বলনে, রীতে করণে, ইঙ্গিতে ভঙ্গিতে, হাসিতে

কাসিতে—ইহাদের পার্থক্য বিশেষ নাই! যেটুকু আছে তাহাকে এপিঠ ওপিঠ বলিলেই চলে—নক্সীপাড় শাড়ীর সদর মফস্বলের মত। সরস্বতীও পটুয়ার মেয়ে, নববধূ হইয়াও সে মুখ বাঁকাইয়া ফিক করিয়া হাসিয়া মুখ ফিরাইল। তাহার ম্যাজেণ্টার রঙমাখা ঠোঁটের অন্তরাল হইতে মিশি-দেওয়া দাঁতগুলি সেই যে কলঙ্করেখার মত আত্মপ্রকাশ করিল, সে আর কোনদিন আত্মগোপন করিল না। সকলের উপর আশ্চর্য--তাহার ওই হাস্যকলঙ্কচিহ্নিত মুখের উপর কখনও দুঃখের কৃষ্ণপক্ষ নামিয়া আসে না; চকিত অবগুণ্ঠনের লঘু মেঘেও কখনও সে মুখ ক্ষণিকের জন্য আবৃত হয় না।

বেলা দশটা বাজিতেই রাঁধা-বাড়া শেষ করিয়া পটুয়াদের মেয়েরা ব্যবসায়ে বাহির হয়। কাচের চুড়ি, মাটির পুতুল, পুঁতির মালা, কারঘুনসী কাচপোকা, সোনাপোকা ডালায় সাজাইয়া তাহারা গ্রামে গ্রামান্তরে ফিরি করিয়া বেচিতে যায়। রঙীন ছিটের খাটো কাঁচুলীধরনের জামার উপর মুসলমানী ঢঙে ফেরতা দিয়া কাপড় পরিয়া মাথায় ডালাটি তুলিয়া লয়। অভ্যাস এমনই হইয়া গিয়াছে যে, ডালাটা ধরিবার পর্যন্ত প্রয়োজন হয় না, দুখানি হাতই দিব্য দুলাইয়া, হেলিয়া দুলিয়া অতি সংকীর্ণ পথেও তাহারা চলিয়া যায়। গ্রামে প্রবেশ করিয়া বেশ এক বিচিত্র সুরে হাঁকে—চাই রে-শমী চুড়ি—! সোহা—গি—নী! নী—ল্ মা-নিক! গুল্—বা-হা-র!

চুড়িগুলির রঙের পার্থক্য অনুযায়ী বিভিন্ন নাম-করণ উহারা নিজেরাই করিয়া থাকে। হলুদ রঙের চুড়িগুলির নাম সোহাগিনী. গাঢ় সবুজগুলিকে বলে নীলমানিক, গুল্‌বাহার চুড়ির রঙ গোলাপী। ঘোর লালের নামের বাহার সব চেয়ে বেশী—'মন্‌চোরা'!

পুতুলের নাম আছে—'কেশবতী', 'চম্পাবতী', 'কালিন্দী'। কেশবতীর মাথায় বেঢপ রকমের খোঁপা, চম্পাবতীর গায়ের রঙ হলুদ, নীলরঙের পুতুলের নাম কালিন্দী। মাথায় হাঁড়ি 'গোহালিনী', হাতে সাজি 'মালিনী', এ তো পুরানো নাম। এ ছাড়া পক্ষীরাজ-ঘোড়া, বাঘ, সিংহ, লক্ষ্মীপেঁচা এসবও আছে। সরস্বতী নিজেই পুতুল গড়ে; গণপতি তাহাকে শখ করিয়া একাজ শিখাইয়াছে।

ফিরি করিয়া ব্যবসা করিতে গেলে মুখও দেখাইতে হয়, মুখরাও হইতে হয়, কিন্তু সরস্বতীর সবই স্বতন্ত্র; মুখের সঙ্গে মাথার কোঁকড়া চুলের

খোঁপাটাও সে বাহির করিয়া রাখে, মিশি-দেওয়া দাঁতের হাসি তো কলঙ্করেখার মত দেখাই যায় এবং সে কলঙ্করেখা শুধু রূপেই বিকাশমান নয়, রবেও প্রকাশমান। সে রূপ ও রবের স্পর্শে তাহার অতিরিক্ত মুখরতা নটিনীর পায়ের নূপুরের মত উচ্ছল মাদকতাময় এবং নিঃসঙ্কোচ। হাটে সে লোককে ডাকিয়া জিনিস বিক্রী করে। মনিহারীর দোকানে যে যুবকটি সাবান কিনিতেছে, তাহাকে ডাকিয়া সে হাসিয়া বলে—চুড়ি নেবে না—চুড়ি?

—চুড়ি! সে সবিস্ময়ে প্রশ্ন করে—চুড়ি?

—হ্যাঁ, চুড়ি। সোহাগিনী, নীলমানিক, গুলবাহার, মনচোরা! কি লিবে দেখ!

সরস্বতীর মিশি-দেওয়া দাঁত মৃদু হাসিতে ঈষৎ বাহির হইয়া কালো বিদ্যুতের মত ক্ষণে ক্ষণে ঝিলিক হানে, লোকটি চুপ করিয়া থাকে, কিন্তু সরিয়া যাইতে পারে না। সরস্বতী বলে—ব'স দেখ; কেমন রঙ বল তোমার বউয়ের, আমি পছন্দ ক'রে দি দেখ। আমার মত গোরা রঙ?

লোকটা একবার মুচকি হাসিয়া বলে—না!

—তবে? কচি কলাপাতার মত শ্যামলা? না, আরও কালো? কালো জামের মত ঘোর কালো?

শেষ পর্যন্ত তাহাকে সে ঘোর লাল রঙের 'মনচোরা' রেশমী চুড়ি বিক্রী করিয়া ছাড়ে।

আরও একটি ব্যবসা আছে পটুয়ার মেয়েদের। ভদ্র গৃহস্থের বাড়ীর মধ্যে ডাক পড়ে, পুরানো কাপড়ে কাঁথা তৈয়ারী করিয়া তাহার উপর নক্সা তুলিবার জন্য। ছোট-বড় তিন-চার রকমের সূচ হাতে করিয়া তাহারা গৃহস্থের বাড়ীতে যায়, গৃহস্থ কাপড় দেয়, কস্তা দেয়—তাহারা ক্ষিপ্র নিপুণ হাতে কাঁথা তৈয়ারী করিয়া তাহার উপর নক্সা তোলে ঠিক যেন যন্ত্রের মত। নক্সাগুলিও তাহাদের মুখস্থ। লতাপাতা, পাখি, ফুল, খেজুরছড়ি, বরফি কাটা, বৃন্দাবনী, জলতরঙ্গ প্রভৃতি ছক তাহারা চোখ বুজিয়া তুলিতে পারে। পাঁচ বছরের পটুয়ার মেয়ে মা-ঠাকুরমার কাছে উঠানে বসিয়া ধুলোর উপর আঙুল দিয়া নক্সা আঁকিতে শেখে, মুখস্থ করে। গৃহস্থ-বাড়ীর বউ ঝিয়েরা স্পর্শদোষ বাঁচাইয়া দূরে বসিয়া তাহাদের অবলীলায় চালিত সূচের দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে চাহিয়া

থাকে, গ্রাম গ্রামান্তরের দশের বাড়ীর গল্প শোনে। মুখরা পটুয়ার মেয়ে তাহাদের মুখের দিকে চাহিয়া সূচ চালাইতে চালাইতে বলিয়া যায়, কোন্ গ্রামের কোন্ বাড়ীর বউয়ের নূতন চুড়ি হইয়াছে, সে চুড়ির প্যাটার্ন কি; কাহার বাড়ীর বউয়ের হাতের চুড়ি হঠাৎ অন্তর্হিত হইয়াছে; কোন্ বাড়ীর গিন্নীর কণ্ঠস্বর কুরুক্ষেত্রের কোন্ শঙ্খের মত; কোন্ বাড়ীর বধূর কথাগুলির ধার শাঁখের করাতের মত, ভাল-মন্দ দুই ধারাতেই না কাটিয়া ছাড়ে না —ইত্যাদি ইত্যাদি।

সরস্বতী ইহার উপরে বউদিদি দিদিমণিদের লইয়া ঠাট্টা তামাসা করে; মুচকি মুচকি হাসিয়া ছড়া কাটে, কত নূতন লীলা-রঙ্গ শিখাইয়া যায়। তাহারা তাহাকে গণপতি সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করিতেই—বাস্ আর রক্ষা থাকে না। মুখে কাপড় দিয়া লজ্জার ভাণ করিয়া সেই যে সে হাসিতে আরম্ভ করে সে হাসি আর তাহার শেষ হয় না। অবশেষে সে তাহার সূচগুলি গুটাইয়া লইয়া বলে—আজ আর হবে না দিদিঠাকরুণ, আজ চললাম, কাল আসব। দুষমনের হাড়ের দাঁত, ও আর আজ বারণ শুনবে নাই।

সরস্বতী চলিয়া গেলে, মেয়েরা কঠোর সংযমে শ্লীলতায় উগ্র হইয়া উঠে, সকলেই একবাক্যে বলে—সরস্বতীর মরণই ভাল! বৃদ্ধ হইলে কি হয়, সে তো স্বামী, তাহার নামে ওই হাসি!

সরস্বতীর হাসি কিন্তু তখনও থামে না, সে হয়তো পথ চলিতে চলিতে তখনও আপন মনে হাসে, অথবা বাড়ী ফিরিয়া চিত্রাঙ্কন-রত গণপতিকে হাসিতে হাসিতেই বলে—বাবুদের মেয়েরা কি বলছিল জান?

পট হইতে মুখ তুলিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া গণপতি মৃদু হাসিয়া প্রশ্ন করে—কি বলছিল?

মুখে কাপড় দিয়া তাহারই দিকে আঙুল দেখাইয়া সরস্বতী বলে—তোমার কথা শুধাছিল।

হাতের তুলিটা একবার নামাইয়া রাখিয়া সকৌতুকে গণপতি প্রশ্ন করিল—কি শুধাছিল?

—বলছিল—। খুব গম্ভীর হইবার চেষ্টা করিয়া সরস্বতী আরম্ভ করিল—বলছিল—। কিন্তু আর সে বলিতে পারিল না।

—কি বলছিল?

একখানা কাচের বাসন যেন অকস্মাৎ সঙ্গীতময় ঝনাৎকারে ভাঙিয়া পড়িল

—খিল খিল করিয়া হাসিয়া গড়াইয়া পড়িয়া সরস্বতী বলিল—শুধোছিল, বুড়াকে বিয়ে করলি কেনে?

কৌতুকহাস্যে গণপতির মুখ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, সে বলিল—তু কি বল্লি?

—বল্লাম? বল্লাম—বুড়া হ'লে কি হয় গো ঠাকরুণ, দাম যে বুড়ার লাখ টাকা। জান না, মরা হাতি লাখ টাকা? তা, ই তো মরা লয় বুড়া। গণপতি মানে গণেশ—আর গণেশের যে শুঁড় আছে গো!

গণপতি হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল—বারবার ঘাড় নাড়িয়া তারিফ করিয়া বলিল—বড়ই বুলেছিস রে সরস্বতী—খুব বুলেছিস তু। বুড়া হাতী! গণপতি হ'ল গণেশের নাম! গণেশের মাথায় গজের মুণ্ডু! বাঃ!

সরস্বতীও পা ছড়াইয়া বসিয়া মৃদু হাসিতে আরম্ভ করিল।

গণপতি হঠাৎ তুলি লইয়া সরস্বতীর ছড়ানো পা দুইখানির একখানি বাঁ হাতে ধরিয়া বলিল—তুলি দিয়া তোর পায়ে আলতা পরায়ে দি দেখ!

ক্ষণিকের জন্য সরস্বতীর ভ্রূ কুঞ্চিত হইয়া উঠিল; পরক্ষণেই সে মিশি-দেওয়া দাঁতের ঝিলিক হানিয়া হাসিতে আরম্ভ করিল, বলিল—ইহারা এলে বুলে দিব কিন্তু!

গণপতি কোন উত্তরই দিল না। ইহারা অর্থে পাড়ার নাতিসম্পর্কিত তরুণের দল। নিত্য সন্ধ্যায় তাহারা এখানে নামাজ পড়িতে আসে, নামাজ সারিয়া প্রহরখানেক রাত্রি পর্যন্ত তাহারা আড্ডা জমাইয়া হৈ-চৈ করিয়া কাটায়। নাতি সকলে একদিক হইয়া সরস্বতীকে রহস্যবাণে বিপর্যস্ত করিতে চেষ্টা করে—সরস্বতী একা তাহাদের বাণ কাটিয়া তাহাদিগকে বাণবিদ্ধ করিতে চেষ্টা করে। বুড়া গণপতি বসিয়া মৃদু মৃদু হাসে—প্রয়োজন হইলে মধ্যস্থতা করিয়া বিচার করিয়া দেয়।

পটুয়ারা ধর্মে ইসলামীয়, কিন্তু আচারে ব্যবহারে নামে পুরা হিন্দু। তাহারা নামাজও পড়ে, আবার হিন্দুর ব্রত আচারও পালন করে, হিন্দুর অখাদ্যও খায় না। দেব-দেবীর প্রতিমা গড়ে, পটের উপর হিন্দুর পুরাণ-কথার ছবি আঁকে; সেই পট দেখাইয়া লীলা-গান করিয়া ভিক্ষা করে। জাতি জিজ্ঞাসা করিলে বলে, ইস্লাম। চাষবাসের বালাই নাই; ভিটা, চলিবার পথ, গৃহস্থের দুয়ার—এ তিন ছাড়া মাটির সহিত সম্বন্ধ নাই। সেই বলিয়াই

সরস্বতীর মত মেয়েরও তাহাদের সমাজে সাজা নাই, কিন্তু তাহাদের রসনা তো মানুষেরই রসনা—সুতরাং নিন্দা না থাকিয়া পারে না; সরস্বতীর নিন্দায় পটুয়া-পাড়া ভরিয়া উঠিল। কিন্তু দিগন্তের ওপারের বিদ্যুৎ-চমকের মত কথাটার চকিত আভাস পাইলেও প্রাণঘাতী বিদ্যুৎ-শিখার সংস্পর্শ বা মেঘ-গর্জনের ধ্বনি সরস্বতী ও গণপতির প্রত্যক্ষ গোচরে কোনও দিন আসিল না। একদা সে বিদ্যুৎ-শিখার উত্তাপ এবং গর্জন প্রথম প্রত্যক্ষ করিল সরস্বতী। সে-দিন হাটের পথে সরস্বতীর সঙ্গিনী ছিল তাহারই সমবয়সী একটি মেয়ে, তাহার বাড়ীর সান্ধ্যমজলিসের নিয়মিত সভ্য এক নাতির পত্নী। পথে নির্জন মাঠে ছুতা করিয়া ঝগড়া বাধাইয়া মেয়েটি বিদ্যুৎ-শিখার মতই জ্বলিয়া উঠিল, তীক্ষ্ম চীৎকারে সরস্বতীকে বলিয়া দিল—কালামুখী, কলঙ্কিনী, গলায় দড়ি দি গা তুই, গলায় দড়ি দি গা!

সরস্বতী হাসিয়া আকুল হইল, বলিল, গলায় দড়ি দিব কি বল্, শাওড়া গাছের ডালে দড়ি বাঁধিতে গিয়া ভূতের ভয় লাগে; মনে পড়ে যায় তোর বরকে!

সঙ্গিনী মেয়েটা একেবারে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। সে সরস্বতীর সঙ্গ ছাড়িয়া বিপথে ভিন্ন গ্রামের পথ ধরিল।

বাড়ী ফিরিয়া মুখে কাপড় দিয়া হেলিয়া দুলিয়া হাসিয়া সরস্বতী গণপতিকে বলিল—কি এনেছি দেখ!

গণপতি কৃষ্ণলীলার পট আঁকিতেছিল, সে বিস্ময় প্রকাশ করিল না, মৃদু হাসিয়া বলিল—কি?

—এই দেখ! বলিয়া সে ডালা খুলিয়া দেখাইল।

—আরে বাপ! এত ধানী-লঙ্কা কি হবে রে?

—পাড়াতে বিলাব।

—কেনে?

সরস্বতী হাসিয়া ভাঙিয়া পড়িল। তারপর কোনরূপে আত্মসম্বরণ করিয়া সকল কথা বলিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল—বলব, আমার হাতের গাছের লঙ্কা। লঙ্কা খেলে টিয়া পাখিতে খুব ভাল বুলি বলে। তোমরা খেয়ে দেখো, তোমরাও বুলি বলবে ভাল!

গণপতি মুগ্ধ হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া ছিল, ঠোঁটে তাহার কৌতুকভরা মৃদু হাসি। সরস্বতী বলিল—কি? কথা বলছ না যে? 'বুড়া

হাতির মাথায় দিলাম জাপানেরই বাড়ি'—না কি গো? বলিয়া সে আবার মুখে কাপড় দিয়া হাসিতে আরম্ভ করিল।

গণপতি বলিল—তার চেয়ে চিটে-কদমা দিলি না কেনে 'দুষ্টু সরস্বতী'? লোকের দাঁতে দাঁতে লেগে গিয়া আর খুলত না!

উ'হু! সরস্বতীর কথাটা পছন্দ হইল না।

কিছুক্ষণ পর গণপতি সরস্বতীকে ডাকিয়া বলিল—দেখ।

সে নূতন পটের নূতনতম অধ্যায়ের ছবিটি তাহাকে দেখাইল। যমুনার ঘাটে একটি মেয়ের মুখের কাছে আর একটি মেয়ে তর্জনী তুলিয়া চোখ পাকাইয়া দাঁড়াইয়া আছে।

কৃষ্ণলীলার পটের মধ্যে এ ছবি কোনো কালে সরস্বতী দেখে নাই, সে সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল—ই আবার কি হ'ল গো গুণিন?

গণপতি বাঁ-হাতে পটখানি তুলিয়া ধরিয়া ডান হাতের তর্জনীনির্দেশে ছবি দেখাইয়া গাহিল—

কুটিলার চসকু দুটি তারা হেন জ্বলে,
দন্ত কিড়িমিড়ি করি রাধিকাকে বলে—
"কালামুখী কলঙ্কিনী রাই লো!
তোর মতন কুল-মজানী গোকুলে আর নাই লো!"

সরস্বতী মাটিতে গড়াইয়া পড়িয়া হাসিতে আরম্ভ করিল। অনেকক্ষণ ধরিয়া সে হাসিল, তারপর উঠিয়া বসিয়া ঘাড় ঘুরাইয়া ফিরাইয়া ছবিখানি দেখিতে আরম্ভ করিল। বলিল—কুটিলের নাকটা কিন্তুক আর টুকচা তুলে দিতে হ'ত বাপু! এমনি—ক'রে!

বলিয়া সে নিজেই নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া দেখাইয়া দিল। গণপতি হাসিল। সরস্বতী আবার মন দিয়া ছবিখানি দেখিতে আরম্ভ করিল। আবার সে ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিল—কোন্ দোকানের রঙ আনছ বুল দেখি? সব রঙ কেমন মেটে মেটে খস্‌খসে লাগছে।

গণপতি বলিল—ধুলা পড়েছে রে, রঙের দোষ নাই। পথের ধারে ঘর—ফাগুন মাসের কাঁচা সড়ক—গাড়ীতে গাড়ীতে পথের ধুলা উড়ছে!

এ কথাতেও সরস্বতীর হাসি।

—তোমার মাথাটা কি হয়েছে গো! হি-হি-হি-হি! পাকা চুলের ডগায় ডগায় মেটে মেটে ধুলা—ঠিক কদম ফুল!

ওই মেয়েটির রাগের কারণ আছে। উহার স্বামী ঘনশ্যাম পটুয়াই গণপতির নাতি-সম্প্রদায়ের মধ্যে সরস্বতীর সর্বাপেক্ষা প্রিয়জন! ঘনশ্যাম রাজমিস্ত্রীর কাজ করে দু পয়সা উপার্জনও করে। যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে গোটাকয়েক নূতন কাজ পটুয়াদের পুরুষেরা গ্রহণ করিয়াছে। আগে তাহারা পট আঁকিত —পট দেখাইয়া গান করিত বিনা-পটেও মন্দিরা বাজাইয়া পুরাণের পালা গান করিত, প্রতিমা গড়িত, পুতুল গড়িত রাজমিস্ত্রীর কাজ করিত, যাহারা সূক্ষ্ম কাজ পারিত না—তাহারা মাটির ঘর তৈয়ার করিত। এখন তাহারা দেওয়ালে তেল-রঙ দিয়া লতাপাতা ফুল আঁকে—কাঠের উপর রঙ ও বার্নিশের কাজও করে। কেহ কেহ তাঁতের কাজও করে। ঘনশ্যাম রঙ-মিস্ত্রীর কাজ শিখিয়াছে, এখান ওখান করিয়া বড়লোকের বাড়ীতে রঙের কাজ করে। শহর-বাজার হইতে সরস্বতীর পাতি জরদাটি সে নিয়মিত জোগাইয়া থাকে; রুপালী জরদা, কিমাম, কখনও বা আর দুই-চারিটা শখের জিনিসও আনিয়া দেয়।

ঘনশ্যাম তাহাকে বলে—রাঙাদিদি।

সরস্বতী মিশি-দেওয়া দাঁতের ঝিলিক হানিয়া হাসিয়া তাহাকে ডাকে—কেলোসোনা।

ঘনশ্যামের রঙ কালো। নামকরণ করিয়া দিয়াছে গণপতি নিজে।

সেদিন সরস্বতীর বিলানো ধানী লঙ্কার ঝাল গোটা পাড়ায় একটা জ্বালা ধবাইয়া দিয়াছিল। নাতিদের দল মুখ ভার করিয়াই আসিয়া বসিল। ঘনশ্যামের সমাদরটা সকলের মনেই এতদিন গোটা ধানী লঙ্কার মত সরস রহস্যের আবরণে জ্বালা প্রচ্ছন্ন রাখিয়া লুকানো ছিল। আজ সরস্বতীই সেগুলি ভাঙিয়া ভিতরের বিষ বাহির করিয়া দিয়াছে। ঘনশ্যামও আসিয়াছে। তাহার মনটাও ভাল নাই. তাহার স্ত্রী আজ তাহার সহিত চরম বচসা করিয়া ছাড়িয়াছে।

গণপতি নূতন পট দেখাইতেছিল। সরস্বতী রান্না করিতে করিতে অভ্যাসমত সরস রহস্যবাণগুলি নিক্ষেপ করিতেছিল। কিন্তু প্রতিপক্ষের দল আজ তেমন সাড়া দিতেছে না। সরস্বতীর জলের অভাব হইয়াছিল সে ঘড়াটা কাঁখে লইয়া দাঁড়াইয়া বলিল—আলোটা কেউ দেখাবে হে নাগরেরা?

একজন বলিল—তোমার কেলোসোনা যাক।

—তাই এস হে, তুমিই এস ভাই।

ঘনশ্যাম উঠিয়া দাঁড়াইল। একজন বলিল—যাবে তো কেলোসোনা, মজুরি কি দিবা গো রাঙাদিদি?

দাওয়া হইতে উঠানে নামিয়া সরস্বতী ঘুরিয়া দাঁড়াইল, বলিল—মজুরি কিসের হে? বেগার দিয়া কে কোন্ কালে মজুরি পায়?

—উ'—হু! ঘনশ্যাম বেগার লয়।

—বেগার লয়?

—না। উ হ'ল গিয়া কেলোসোনা; কালো রঙের সোনা. সোনার পাথরবাটি, উ কেনে বেগার হবে?

সরস্বতী খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল, বলিল—তা বটে! বল হে কেলোসোনা কি লিবা মজুরি?

ঘনশ্যাম কিছু বলিবার পূর্বেই একজন বলিয়া উঠিল—

"সব সখীকে পার করিতে লিব আনা আনা,
শ্রীমতীকে পার করিতে লিব কানের সোনা!"

অপর একজন সঙ্গে সঙ্গেই বলিয়া উঠিল—'তোমাকে রাঙাদিদি আর বুলব না ঠাকরুণদিদি—বুলব 'বিনোদিনী'। 'কেলোসোনা নাম রাখে রাধা বিনোদিনী'। তোমার নাম হ'ল 'বিনোদিনী'।

গণপতি হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিল, বলিল—তুমি বড় ভাল বুলেছ হে লাতি; এ মজলিসে কল্কে তোমারই আগে পাওনা! লাও কল্কে লাও।

হুঁকা সমেত কল্কেটি সে তাহার দিকে আগাইয়া দিল।

সরস্বতী খিল খিল করিয়া হাসিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল, সে উচ্ছল হিল্লোলে ঘাটের দিকে ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—তবে বাঁশী লাও হে কেলো-সোনা, ঘাটের ধারে তুমি বাজাইবা—আমি জল ফেলব আর জল ভরব।

সরস্বতীর এই নির্লজ্জতায় সমস্ত নাতি-সম্প্রদায়ও আজ স্তম্ভিত হইয়া গেল। ঘনশ্যামের সহিত গোপন প্রেমের কথাটা এমন ঘোষণা করিয়া স্বীকার করিয়া লওয়ায় তাহাদের সর্বাঙ্গ রি রি করিয়া উঠিল। একজন গণপতিকে বলিল—তোমাকে আমরা খাতির করি—ভালবাসি; কিন্তু তুমি এইবার গলায় দড়ি দিয়া মর! ছি!

গণপতি উত্তরে নাতি-সম্প্রদায়কে গণনা করিতে আরম্ভ করিয়া দিল, সকলে বিস্মিত হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। গণনা শেষ করিয়া অত্যন্ত দুঃখিত ভাবেই বুড়া বলিল—হ'ল না ভাই। তোমরা পাঁচের অনেক বেশী,

আট জনা। পাঁচ হ'লি না হয়—বউয়ের নাম দিতাম দ্রৌপদী—তোমরা হতে পাণ্ডব।

কথা শেষ করিয়া বুড়া মৃদু মৃদু হাসিতে আরম্ভ করিল।

নাতির দল কয়েক মুহূর্ত নীরবে বসিয়া থাকিয়া নীরবেই একে একে উঠিয়া চলিয়া গেল।

সরস্বতী ঘাট হইতে ফিরিল উচ্চ কণ্ঠে হাসিতে হাসিতে। ঘনশ্যাম নীরবে আলোটি নামাইয়া দিয়া হতভম্বের মত দাঁড়াইয়া রহিল। গণপতি বলিল—বস হে কেলোসোনা!

ঘনশ্যাম ঢোক গিলিয়া বলিল—রাত অনেক—না—বসব না। বলিতে বলিতে সে চলিতে আরম্ভ করিল। সরস্বতীর হাসি আরও বাড়িয়া গেল।

গণপতি কোন প্রশ্ন করিল না, সে তামাক সাজিতে বসিল। সরস্বতী এবার মুখে কাপড় দিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল—বুলে, তালাক দাও বুড়াকে, নিকা কর আমাকে!

গণপতি চকিত হইয়া মুখ তুলিয়া সরস্বতীর মুখের দিকে চাহিল, পরক্ষণেই সেও মৃদু মৃদু হাসিতে আরম্ভ করিল।

পরদিন হইতে নাতি-সম্প্রদায় গণপতির বাড়ীতে নামাজ পড়িতে আসা বন্ধ করিল; অপর এক প্রৌঢ় পটুয়ার বাড়ীতে তাহারা নামাজের আস্তানা গাড়িল। অভিরাম পটুয়া পয়সায় গণপতি অপেক্ষা কম নয়, সে ভাল রাজ-মিস্ত্রী, সৌখীন নক্সার কাজ সে ভালই করে। কিন্তু কুলকর্মে রাজের কাজটা পটুয়া সম্প্রদায়ের নিকট কৌলীন্যজনক নয়। অভিরাম নামাজপ্রার্থীদের পুরোভাগে দাঁড়াইবার অধিকার এমন অপ্রত্যাশিতভাবে পাইয়া খুশী হইয়া উঠিল। সে শুধু জল তামাকের ব্যবস্থা করিয়াই ক্ষান্ত হইল না, প্রত্যহ এক বাণ্ডিল বিড়ির ব্যবস্থা পর্যন্ত করিল! ডুগি-তবলা, মন্দিরা কিনিয়া পালা-গানের মহড়ার আড্ডাও খুলিয়া দিল অভিরাম।

কেবল ঘনশ্যাম আসা ছাড়িল না। এই লইয়া পটুয়াদের রমণী-সমাজ একেবারে শতমুখী হইয়া উঠিল। তাহারা সরস্বতীর সহিত এক সঙ্গে ব্যবসায়ে যাওয়া পর্যন্ত বন্ধ করিল। কিন্তু সরস্বতীর তাহাতে কিছু আসিয়া গেল না। চুড়ি-পুতুলের পসরা চাপাইয়া সে একাই গ্রামগ্রামান্তর ঘুরিয়া আসিত। প্রতিবেশিনীদের মুখে মুখে তাহার কলঙ্ককাহিনী অঞ্চলময় ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, ফলে হাটে তাহার পসরার সম্মুখে ভিড় জমিয়া উঠিতে

আরম্ভ করিল মধুমক্ষিকার ঝাঁকের মত। নির্জন পথে-প্রান্তরেও দুই একজন ক্রেতার পর্যন্ত অভাব হইত না। সরস্বতী সেইখানেই চুড়ি পুতুলের পসরা নামাইয়া বসিত। তাহার রাঙাদিদি নামটা পর্যন্ত সকলের জানা হইয়া গিয়াছে, ক্রেতারা হাসিয়া ডাকে—রাঙাদিদি!

সে বলে—কি লিবা লাও লাতি!

ঘনশ্যাম ইহাতে একদিন রাগ করিল—না রাঙাদিদি, ছি!

সরস্বতী কথায় জবাব দিল না, হাসিয়া সোরগোল তুলিয়া ফেলিল।

ঘনশ্যাম আবার বলিল—হেসো না, ইটা হাসির কথা লয়!

পরমুহূর্তেই মুখে কাপড় দিয়া উচ্ছ্বসিত হাসির আবেগে সে ভাঙিয়া পড়িল।

ঘনশ্যাম রাগ করিয়া চলিয়া গেল। দুই দিন সে আসিল না পর্যন্ত। তৃতীয় দিনে সরস্বতী পসরা মাথায় করিয়া দুই ক্রোশ দূরবর্তী গোপালপুরের পথ ধরিল। ওই গ্রামেই ঘনশ্যাম এখন জমিদারের পুরানো বাড়ীখানা নূতন করিয়া রঙ করিতেছে। বাবুরা নাকি শহর হইতে এখানে আসিয়া বাস করিবেন। গ্রামে কাহারও বাড়ী সরস্বতী যায় না, গেলে মেয়েরা তুমুল ঝগড়া বাধাইয়া তোলে।

প্রকাণ্ড বড় বড় থামওয়ালা জমিদারের সদর কাছারী; ফটকের দুই পাশে জমানো চুন-বালিতে গড়া দুইটা সিংহ। সরস্বতী ফটকের দুয়ারে দাঁড়াইয়া মুখ টিপিয়া হাসিয়া হাঁকিল—চা—ই, রে—শমী—চুড়ি—

হাঁক সে আর শেষ করিতে পারিল না, খিল খিল করিয়া হাসিয়া সারা হইয়া গেল! কিন্তু সে হাসিতে তাহার অকস্মাৎ ছেদ পড়িয়া গেল। জমিদারের কাছারী-বাড়ীর দরজায় দাঁড়াইয়া কুড়ি-বাইশ বছরের সোনার বরণ যেন কোন্ রাজার ছেলে!

ঘনশ্যামও বাহির হইয়া আসিয়াছিল, সে অন্তরালে দাঁড়াইয়া বার বার হাত ইসারা করিতেছিল—পালাও, পালাও!

সরস্বতীর তখন ঘনশ্যামের ইসারা দেখিবার ও বুঝিবার অবসর ছিল না, বিস্ময়বিস্ফারিত মুগ্ধ নেত্রে সে ওই রাজার ছেলের দিকে চাহিয়া ছিল!

ছেলেটি রাজারই ছেলে, জমিদারের বড় ছেলে; সম্প্রতি পড়াশুনার শেষ পরীক্ষা দিয়া গতকাল এখানে আসিয়াছে, এখানে কিছুদিন বিশ্রাম করিবে। ছেলেটি ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিল—কি চাই?

—চুড়ি, রেশমী চুড়ি আছে, লিবেন?

ছেলেটি সশব্দে হাসিয়া উঠিল, বলিল—চুড়ি নিয়ে কি করব?

সরস্বতী অপ্রতিভ হইয়া গেল—কিন্তু পরমুহূর্তেই সে উত্তর খুঁজিয়া পাইল, বলিল—বউরাণীর হাতে পরায়ে দিব।

—বউরাণী নেই। চুড়ির দরকার নেই।

—পুতুল, পুতুল লিবেন?

—তাই বা নিয়ে কি করব?

—টেবিলে সাজায়ে রাখবেন। সায়েবেরা লিয়া যায় আমাদের পুতুল।

সরস্বতী পসরা নামাইয়া বসিল, সম্ভ্রমভরেই বোধ করি, কিন্তু জীবনে বোধ হয় এই প্রথম মাথায় সে ঘোমটা টানিয়া দিল। তারপর বাহির করিল মাটির পুতুল—কেশবতী, কঙ্কাবতী মালিনী, গোয়ালিনী, ঘোড়া, বাঘ, সিংহ।

রাজার ছেলে মুগ্ধ বিস্ময়ে বলিয়া উঠিল—বাঃ! এ পুতুল তোমরা নিজেরা গড়?

—আজ্ঞা হ্যাঁ গো!

ঘোড়াটি তুলিয়া লইয়া দেখিয়া শুনিয়া তরুণ জমিদার বলিল—এটা ঘোড়া নাকি?

—আজ্ঞা হ্যাঁ। পক্ষীরাজ ঘোড়া। পক্ষীরাজ আকাশে উড়ে কিনা! ই ঘোড়া তো লয়।

—ঠিক কথা। কত দাম নেবে বল তো?

সরস্বতী মুচকি হাসিয়া মাথার ঘোমটাটা আরও একটু টানিয়া দিয়া বলিল —ওরে বাপরে! দাম আমি বুলতে পারি,—না লিতে পারি! আপনি দিবেন বক্‌শিস। আপনারা হাত ঝাড়লে তাই আমাদের পর্বত।

জমিদারের ছেলেটি একটি টাকা সরস্বতীর সম্মুখে ফেলিয়া দিল। সরস্বতীর মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, পুতুলের দাম দু'পয়সা হিসাবে সাতটা পুতুলের জন্য চৌদ্দ পয়সার বেশী কেউ দিত না; সে টাকাটা কুড়াইয়া কপালে ঠেকাইয়া আঁচলের খুঁটে বাঁধিল। টাকা বাঁধিয়াও সে উঠিল না, আবার আরম্ভ করিল—পট লিবেন না? পট?

—পট?

—আজ্ঞা হাঁ, রামলীলা, কেষ্টলীলা. গোরলীলা! সায়েবেরা কিনে লিয়ে যায় আজ্ঞা!

—ও! পট! তোমরা পট আঁক নাকি? কিন্তু নতুন পট তো চলবে না, পুরনো পট চাই, আছে তোমাদের?

—আজ্ঞা, আমার মরদ খুব পুরানো নোক, ষাট বছরের বুড়ো—তারই আঁকা পট আছে।

—তোমার মরদ—মানে তোমার স্বামী? ষাট বছরের বুড়ো?

—আজ্ঞা হাঁ গো। সরস্বতী মুখ হেঁট করিয়া হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজিয়া খুক খুক করিয়া হাসিতে আরম্ভ করিল।

ঘনশ্যাম আড়ালে দাঁড়াইয়া প্রথম হইতেই সমস্ত শুনিতেছিল, সরস্বতীর চাপা হাসির শব্দে তাহার সর্ব-অন্তর ঘৃণায় রি-রি করিয়া উঠিল।

পরদিন দ্বিপ্রহরে আবার মিষ্ট কণ্ঠের উচ্চধ্বনি ধ্বনিত হইয়া উঠিল—চা—ই, রে—শমী চুড়ি—

জমিদার-বাড়ীর কাছারী ঘরের জানালায় রাজার ছেলে আসিয়া দাঁড়াইল। —পট এনেছ?

মাথার পসরা কাঁখে নামাইয়া—মাথায় ঘোমটা টানিয়া সরস্বতী হাসিয়া বলিল—রাজার হুকুম, না এনে পারি? বাপ রে!

—তবে? রেশমী চুড়ি বলে হাঁকলে যে?

—চাই—পট—বলতে কেমন লাগে যে! বলিয়া সে খালি হাতটায় কাপড় টানিয়া মুখে চাপা দিয়া হাসিতে আরম্ভ করিল।

—কই, আন তোমার পট, এই ঘরেই নিয়ে এস।

ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া পসরা নামাইয়া সরস্বতী বলিল—খুব ভাল পট এনেছি, গৌরলীলার পট।

—গৌরলীলার পট বুঝি খুব ভাল?

—গৌরলীলার পট আপনার লাগবে ভাল। গৌরচাঁদের মত বরণ আপনার, তেমুনি রূপ—

—বল কি!

—হ্যাঁ। আপনকার নাম দিয়েছি আমি গৌরচাঁদ। এই দেখেন—বলিয়া পট খুলিয়া সে সুরে আরম্ভ করিল—

সোনার গৌর যায় পথ আলো করি
যুবতীরা লাজে যায় মরমেতে মরি—
হায় রে এরে কেউ বাঁধতে লারে।

ত্রিশ টাকায় তিনখানা পট বিক্রী করিয়া সরস্বতী রঙ্গভরে বিপুল উচ্ছ্বাসে হেলিয়া দুলিয়া ঘরে ফিরিল। নোট তিনখানা গণপতির সম্মুখে ফেলিয়া দিয়া বলিল—লাও, আমার গৌরচাঁদের কেমন দরাজ হাত দেখ। পরমুহূর্তেই মুখে কাপড় দিয়া হাসি আরম্ভ হইয়া গেল। হাসিতে হাসিতে বলিল—বুলেছি বাবুকে। রাগ করে নাই। বুললাম, আপনার নাম দিয়েছি আমি গৌরচাঁদ। তা মুখখানা হয়্যা উঠল সিন্দুরে মেঘের পারা।

গণপতিও হাসিল—আজ কিন্তু তাহার হাসি ম্লান। সে বলিল—কিন্তুক গৌর-প্রেম ইয়ারা যে সইবে না বুলছে। মেয়েগুলান তো শাঁখের মত গলা বার করেছে। কেলোসোনা তোমার ধুয়া তুলেছে—মলে ফেলব না।

সরস্বতী মুখে কাপড় দিয়া হাসিয়া বলিল—বাবারে—তবে তো ভয়ে আমি মরে গেলাম। ভেবো নাই তুমি, তুমার আগে আমি মরব। তুমি আবার একটা নিকা করবে—টুকটুকে—চম্পাবতীর পারা বরণ।

গণপতি হাসিয়া বলিল—না রে রাঙাবউ, দেহ আমার ভাল নাই।

সরস্বতী হাসিল—বিষণ্ণ হাসি, বলিল—সেও তুমি ভেবো নাই।

গণপতি আর কিছু বলিল না।

পরদিন দ্বিপ্রহরে আবার গোপালপুরের পথে হাঁক উঠিল—চাই রেশমী চুড়ি!

গণপতি মিথ্যা কথা বলে নাই। কিন্তু সরস্বতীর চোখে তাহা পড়ে নাই। গণপতির শরীর ভিতরে ভিতরে শূন্যগর্ভ হইয়া উঠিয়াছিল। দিনদশেক পরেই একদিন সরস্বতী ওই গোপালপুর হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, তুলি হাতে করিয়াই অর্ধসমাপ্ত পটের সম্মুখে গণপতি নিস্পন্দ নিথর হইয়া পড়িয়া আছে। একটা দুর্দমনীয় কম্পনে থর থর করিয়া সে বসিয়া পড়িল।

গণপতি মরিল, কিন্তু সে বাঁচিয়া থাকিতে যে আশঙ্কা করিয়াছিল সে আশঙ্কা মিথ্যা হইয়া গেল! তাহার নাতির দল ছুটিয়া না আসিয়া পারিল না। কিন্তু একটি মেয়েও আসিল না সরস্বতীকে সান্ত্বনা দিতে।

গণপতির সৎকার শেষে নাতিরা আসিয়া বহুদিন পরে আবার রাঙাদিদির দাওয়ায় কিছুক্ষণ বসিয়া তবে বাড়ী গেল।

দিন তিনেক পরে।

ঘনশ্যাম সকালেই আসিয়া দাওয়ায় বসিল—কই, কি হচ্ছে গো?

সরস্বতী হাসিয়া বলিল—এস লাগর এস।

বিনা ভূমিকায় ঘনশ্যাম বলিল—কি বলছ বল, এইবার?

মুখে কাপড় চাপা দিয়া সরস্বতী বলিল—কিসের গো?

—নিকার কথা। কি বলছ বল দেখি?

—উঁ—হু। সতীন নিয়া ঘর করতি লারব আমি!

—উকে যদি তালাক দি?

—হুঁ—তবে করব নিকা।

—দেখিয়ো!

—হুঁ গো! আমার কেলোসোনার দিব্যি। হ'ল তো?

—কিন্তু তুমি এমন ক'রে বেড়াতে পাবে নাই।

—বেশ!

কথায় কিন্তু বাধা পড়িল; নাতি-সম্প্রদায়ের অন্যতম নাতি দ্বিজপদ আসিয়া উপস্থিত হইল—কই? রাঙাদিদি কই?

—এস, এস, ভাই এস। সরস্বতী হাসিয়া অভ্যর্থনা করিল।

ঘনশ্যাম উঠিয়া গেল। দ্বিজপদ বসিয়া বলিল—তারপরে?

হাসিয়া সরস্বতী উত্তর দিল—আমার কথাটি ফুরালো, নটে গাছটি মুড়ালো। হা নটে তুই—

অপ্রতিভ হইয়া দ্বিজপদ হাসিয়া বলিল—ধ্যেৎ—

—কেনে—ধ্যেৎ কেনে?

—বুড়া দাদু তো গেলো, তুমি কি করবে—শুধাতে এলাম—তা—না—

—বুড়া মরেছে—আমি নেকা করব।

—হুঁ—তা—

—উঁ—হু। সতীন নিয়া আমি ঘর করতে লারব হে, তুমি উঠে যাও।

—আমি যদি তালাক দিই?

—তখন এস; পিঁড়ি পেতে রাখব আমি। এখন উঠ—আমি যাব গোপালপুর, [illegible] পুতুলের বরাত আছে।

সে ডালা সাজাইয়া দুয়ারে তালা দিয়া বাহির হইয়া গেল। তালা দিতে গিয়া সে একটা দীর্ঘনিশ্বাস না ফেলিয়া পারিল না। বুড়া ওই ঠাঁইটিতে বসিয়া ছবি আঁকিত। তালাচাবীর অভ্যাস তাহার নাই।

স্তব্ধ দ্বিপ্রহর।

গোপালপুরের পথে হাঁক উঠিল—চা—ই, রেশমী চুড়ি!

কিন্তু জমিদার-বাড়ীর জানালা আজ খুলিয়া গেল না। কোথাও এতটুকু শব্দ হইল না, বাতায়ন-পথগুলি সবুজরঙের কপাটে ভাঁজ মিলাইয়া নীরন্ধ্র রুদ্ধ!

গৌরচাঁদ চলিয়া গিয়াছে।

পটুয়াপাড়ার প্রায় প্রতিঘরেই একটা অবরুদ্ধ কান্না গুমরিয়া মরিতেছিল। তরুণী বধূগুলি গোপনে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতেছে; কিন্তু কেহ কাহারও কান্নার কথা জানে না। তাহাদের স্বামীরা তাহাদিগকে তালাক দিতে বদ্ধ-পরিকর হইয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু আশ্চর্যের কথা—সরস্বতী না মরিয়াও তাহাদিগকে রেহাই দিল।

সকালে উঠিয়া সকলে দেখিল—সরস্বতী নাই, কোথায় চলিয়া গিয়াছে। নাতিরা সকলেই পরস্পরের সন্ধানে চাহিয়া পরস্পরকে দেখিয়া নিশ্চিন্ত হইল; তাহারা সকলেই আছে—সে-ই নাই।

সকলেই ছুটিল—তালাকের আর্জি ফিরাইয়া আনিতে। মেয়েরা চোখের জল মুছিয়া গালিগালাজে শতমুখী হইয়া উঠিল।

সরস্বতী বলিয়া তাহাকে কেহ চেনে না। শহরে রাঙাদিদির চুড়ি ও মাটির পুতুলের দোকান বিখ্যাত।

পাকা আমের মত গৌরবর্ণা প্রৌঢ়া রাঙাদিদির খরিদ্দারেরা নিত্য তাহার জিনিস কেনে। সাত-আট বছরের ছেলেমেয়েরা নিত্য পুতুল ও চুড়ি ভাঙে, নিত্য কেনে।

—কি চাই ভাই, পক্ষীরাজ ঘোড়া? কালকেরটা রাক্ষসে খেয়ে নিয়েছে?

—কি দিদি—আজ কি পরবে? মনচোরা না নীলমানিক?

লোকে বলে, বুড়ী পটুয়ানীর অগাধ পয়সা।

ব্রাঞ্চ লাইনের ছোট একটি স্টেশন।

লাল কাঁকর-বিছানো মাটির-সঙ্গে-সমতল প্লাট্ফর্ম, তাও একটা। প্লাটফর্মের কোলে পয়েণ্টিং করা ছোট একখানি ঘরে স্টেশন-রুম, বাকীটা একটা টিনের শেড, সেই শেডের মধ্যেই ইঁট দিয়ে ঘেরা একখানা পার্শেল-রুম, তার পাশে এক টুকরো ঘরের দরজার মাথায় লেখা "জেনানা"।

স্টেশনের পিছন দিকে চা ও খাবারের স্টল। রেলের লাইসেন্স-প্রাপ্ত ভেণ্ডারের স্টল। স্টেশনের দেওয়ালের গায়ে টিনের চালা নামানো হয়েছে। তার পরেই গুডস শেডের সাইডিং লাইন। ওখান থেকেই চলে গিয়েছে সোজা উত্তর মুখে লাল মাটির গ্রাম্য রাস্তা। ইউনিয়ন বোর্ডের কল্যাণে দু'পাশে নালা কাটা হয়েছে, দড়ি ধ'রে বেশ সোজা লাইনে নয়, সাপের দাগের মত আঁকাবাঁকা করেই কাটা, তবু তাতেই খানিকটা সম্ভ্রান্ত চেহারা হয়েছে গ্রাম্য বাবুর মত। গ্রামের লোকে বলে স্টেশন-রোড, ইউনিয়ন বোর্ডের খাতাতেও তাই লেখা আছে।

স্টেশন-সীমানা বা এরিয়া সামান্য। বুকিং অফিস, রেলওয়ে-লাইসেন্স প্রাপ্ত ভেণ্ডারের চায়ের স্টল, মাল-গুদাম, দুটো মাত্র শাণ্টিং লাইন। বাস্—স্টেশন-এরিয়া শেষ। স্টেশন-সীমানার পরেই রাস্তার দু'পাশে খানকয়েক ঘর, একখানায় পান-বিড়ি-সিগারেট আর চা-খাবারের দোকান। দু'খানায় কয়লার ডিপোর গদী। একখানায় স্টেশন-ভেণ্ডারের বাসা। এদের পাশে এক বর্ধিষ্ণু ভদ্রলোকের পাকা বাড়ী। বাকীটা ফাঁকা। বড় বড় বটগাছের ছায়া-ঢাকা তকতকে জায়গা। এইখানে গ্রামান্তরের গাড়ী এসে আড্ডা নেয়। এখান থেকে খানিকটা গিয়ে গ্রামের বসতি।

সকালে আপ ডাউন দু'টো ট্রেণ। এখানেই ক্রশিং হয়। লোকে বলে 'মীট' হয়। ট্রেণ দু'টো চলে গিয়েছে। স্টেশন-শেডের মধ্যে স্বল্প কয়েকটি লোক। অধিকাংশই স্থানীয়। যাত্রীর মধ্যে একটা খ্যামটা নাচের দল। দুটি তরুণী, একটি বুড়ী ঝি, পুরুষ তিনজনের একজন হারমোনিয়ম-বাজিয়ে,

একজন বেহালাদার, একজন বাজায় ডুগি-তবলা। তাদের ট্রেণ বেলা দুটোয়। মেয়ে দু'টির একটি কালো, দীর্ঘাঙ্গী, সে সেইখানে বসেই চুল বাঁধছে। অপরটি দেখতে সুন্দরী, সে একখানা বেঞ্চে ঘুমুচ্ছে। হারমোনিয়ম-বাজিয়েটি বেশ ফ্যাশন-দুরস্ত ছোকরা, সিগারেট মুখে সে প্লাটফর্মের এধার থেকে ওধার পায়চারী ক'রে ফিরছে।

একটা অন্ধ ছেলে বসে আপন মনেই ঢুলছিল। কুৎসিত চেহারা। চোখ দুটো সাদা, সামনের মাড়িটা অসম্ভব রকমের উঁচু, চারটে দাঁত বেরিয়ে আছে, হাত-পাগুলো অপুষ্ট অশক্ত। পরণে একখানা মোটা সুতোর খাটো ময়লা কাপড়। মাথার চুলের পিছন দিকটা অত্যন্ত বিশ্রী ভাবে ছোট ক'রে কাটা। একটা ডুবকি হাতে নিয়ে আপন মনেই সে দুলছে, মধ্যে মধ্যে হাসছে, মধ্যে মধ্যে ঠোঁট নাড়ছে, আপন মনেই কথা বলছে বুঝা যায়। মধ্যে মধ্যে চঞ্চল হয়ে উঠছে। কিছু শোনবার চেষ্টা করছে। কখনও জোরে নিশ্বাস নিয়ে কিছু শুঁকতে চাচ্ছে। জন কয়েক কুলি স্টেশনের স্টলের কাছে বসে আছে, গল্প-গুজব করছে, মধ্যে মধ্যে স্টলের উনোন থেকে কাঠি জ্বালিয়ে বিড়ি ধরাচ্ছে। নিভে যাচ্ছে, আবার ধরাচ্ছে।

প্লাটফর্মের প্রান্তে দাঁড়িয়ে হারমোনিয়ম-বাজিয়ে ছোকরা শিষ দিচ্ছিল। এখনও ঘণ্টা পাঁচেক এখানে কাটাতে হবে। নিতান্ত বৈচিত্র্যহীন স্থান। দেখবার কিছু নাই। এমন কি তার সঙ্গে তরুণী দু'টিকে দেখে ঈর্ষান্বিত হবার মত তরুণ ভদ্রগণের পর্যন্ত অভাব এখানে। চৈত্রের শেষ; সামনে খোলা শস্যহীন মাঠে আকাশ থেকে মাটি পর্যন্ত পাতলা ধোঁয়ার একটা ছিলকে পড়েছে যেন। মধ্যে মধ্যে তাও যেন কাঁপছে।

স্টেশন-ঘরে কোকিল আছে। কোকিল ডাকছে স্টেশনের মধ্যে।

বিস্মিত হ'ল হারমোনিয়ম-বাজিয়ে। পাপিয়াও আছে না কি?—'চোখ গেল' ডাক ক্রমেই চড়ছে।

কি বিপদ! চিড়িয়াখানা না কি? ভেড়া ডাকছে! আরে দিনে শেয়াল ডাকে! হারমোনিয়ম-বাজিয়ে অদম্য কৌতূহলের আকর্ষণে ফিরল স্টেশনের দিকে। ও হরি! ও, অন্ধ ছোঁড়াটা! ছোঁড়াটা কখন ডুবকি বাজিয়ে গান ধরেছে।

গলাখানি তো চমৎকার মিঠে! ও বাবা! শুধু গলাই মিঠে নয়, রসিকও খুব। গানখানা সত্যিই রসিকের উপযুক্ত।

'চোখে ছটা লাগিল,
তোমার আয়না-বসা চুড়িতে।
মরি, মরি, বলিহারি—চোখে যে আর
সইতে নারি,
ঝিকিমিকি ঝিলিক নাচে,
হাতের ঘুরি-ফিরিতে।'

বেশ জমে উঠেছে এরই মধ্যে। ছোকরা উপু হয়ে ব'সে ডুবকি বাজিয়ে গান গেয়ে চলেছে, দন্তুর মুখে একমুখ হাসি, তালে তালে দুলছে। কুলীর দল তার দিকে ফিরে বসেছে। হারমোনিয়ম-বাজিয়ের সঙ্গিনীদের মধ্যে কেশপ্রসাধনরতা কালো মেয়েটির বেণী-রচনারত হাত দু'খানি থেমে গিয়েছে, যে ঘুমুচ্ছিল সে ঘুম ভেঙে উঠে বসেছে, তার সদ্য ঘুমভাঙা বড় বড় চোখ দু'টিতে স্মিত কৌতুকোজ্জ্বল দৃষ্টি। বুড়ী ঝি-টা দোক্তা সহযোগে পান চিবুচ্ছিল বেশ আরাম ক'রে, তার পান চিবুনো বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

'রিণিঠিণি রিণিঠিণি, চুড়ি আবার
তোলে ধ্বনি,
আমার প্রাণের ব্যায়্লা (বেহালা)
বাজে তোমার চুড়ির ছড়িতে!'

গানের গতি দ্রুত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ছোঁড়াটার দোলার মাত্রাও দ্রুততর হচ্ছে। উল্টে প'ড়ে না যায়। ওপাশে বেঞ্চের উপর সদ্য-ঘুম-ভাঙা মেয়েটি উঠে বসল। চুল বাঁধছিল কালো মেয়েটি, সে মুচকে হেসে বললে—মরণ।

ছোকরার তখন মাতন লেগেছে।—

'হায়—হায়, আমি যদি হতেম চুড়ি,
কাঞ্চন নয়, কাচ-বেলোয়ারী
থাকতেম তোমার হাতটি বেড়ি
জেবন (জীবন) সফল করিতে।
হায় হায়, থাকত না খেদ মরিতে।'

তেহাই দিয়েই সে গান শেষ করলে।

শ্রোতার দল উচ্ছ্বসিত কলরবে বাহবা দিয়ে উঠল। প্রশংসায় পরিতৃপ্ত

অন্ধ দস্তুরের মুখ হাসিতে ভরে গেল। একজন শ্রোতা একটা জ্বলন্ত বিড়ি ওর হাতে সন্তর্পণে ধরিয়ে বললে—নে, খা।

—বিড়ি?

—হ্যাঁ। খা।

হেসে অন্ধ বললে—কে সিগারেট খাচ্ছে। একটা দ্যান না কেনে গা!

দোকানী বলে উঠল—বেটা আমার বালকদাসী। "আমার নাম বালকদাসী, ভালমন্দ খেতে ভালবাসি!" সিগারেট খাবে! একটা সিগারেটের দাম কত জানিস্?

—আমার গানের বুঝি দাম নাই?

নে, নে খা। এই নে। এবার হারমোনিয়ম-বাজিয়ে একটা সিগারেট বা'র ক'রে দিলে তাকে।

সিগারেটটি নিয়ে সে সবিনয়ে বললে—পেণাম বাবুমশায়! ঘোড়া দিলেন, চাবুক দ্যান। 'দেশলাই' জেবলে দ্যান!

দেশলাই জেবলে দিলে হারমোনিয়ম-বাজিয়ে। ওর সাদা ছাউনীপড়া চোখে আলোক শিখার প্রতিবিম্ব পড়ে না। উত্তাপ অনুভব করে সে।

অন্ধ সিগারেট টানে প্রাণপণে। সে টানের শক্তি-প্রয়োগে ওর মাথা ঘাড় থরথর ক'রে কাঁপে। দম ফুরিয়ে এলে তবে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে ছোঁড়াটা ধূমরুদ্ধ কণ্ঠে বলে—আঃ!

সকলে হাসে তার ভঙ্গী দেখে। হারমোনিয়ম-বাজিয়ে বাবুটি বললে—তুই তো বেশ গান গাইতে পারিস্ রে! এ্যা!

—হ্যাঁ ভালো! বুঝলেন বাবুমশাই, সবাই বলে ভালো। তা'—। একটু চুপ ক'রে থেকে একটু হেসে বললে—খুব ভালো ক'রে গাইলে, মানে পান-মন সমম্পন ক'রে গাইলে মোহিত ক'রে দিতে পারি। বুঝলেন!

এবার তরুণী দু'টি খিল-খিল ক'রে হেসে উঠল। সে হাসির শব্দে চমকে উঠল অন্ধ। হাতের সিগারেটটা প'ড়ে গেল মাটিতে। মাটির উপর আঙ্গুলের প্রান্ত দিয়ে অনুভব ক'রে সে সিগারেটটা খুঁজতে খুঁজতে বললে—হাসছে? কে? কারা? তারপর মৃদুস্বরে ডাকলে—মলীন্দ।

'মলীন্দ' ওই কুলীদের একজন, সে বললে—কি?

শোন, বলি। সিগারেটটা হাতের ইসারায় ঠিক গোড়ার দিক ধ'রে তুলে নিলে।

—কি?

—স'রে আয় কানে কানে বলব।

—কি? বল?

—মেয়েছেলেতে হাসছে। ভদ্দনোক লয়?

—হ্যাঁ। বদ্দমানের।

—হুঁ। ঠিক বুঝতে পেরেছি আমি।

—কি ক'রে বুঝলি? অবিশ্বাসের হাসি হাসলে মলীন্দ।

—বুঝলাম গলার রজ্ (আওয়াজ) থেকে?

—কিন্তু ভদ্দলোক জানলি কি ক'রে। মলীন্দ প্রশ্ন করলে।

হেসে বললে অন্ধ—চুড়ির শব্দতে আর মিষ্টি সুবাস থেকে। অনেকক্ষণ থেকেই ও দুটো পাচ্ছিলাম, মনে মনে সন্দ লাগছিল। ছোটনোক হ'লে গায়ে ঘাম-গন্ধ ওঠে। কাচের চুড়িতে এমন মিঠে শব্দ ওঠে না। সোনার চুড়ি আছে হাতে, লয়?

—হ্যাঁ।

নীরবে সিগারেট টানতে টানতে অন্ধ বার বার জোরে নিশ্বাস টানে ওই মিষ্ট গন্ধ নেবার জন্য। হঠাৎ সে বললে—তা'—। ঠাকরুণরা হাসছেন, আপনাদিগে বলছি—

কালো মেয়েটি মুখরা, চপলা। খোঁপায় কাঁটা আঁটছিল সে। ঘাড়টি ঈষৎ ফিরিয়ে অন্ধের দিকে চেয়ে বললে—আমাদের বলছ?

—হ্যাঁ, আপনারা হাসলেন কেনে?

কালো মেয়েটিই এবার মুখ টিপে হেসে বললে—সে আমরা নই, অন্য লোকে।

—অন্য নোকে? অন্ধ ঘাড় নেড়ে মৃদু হেসে বলে—উঁহু।

—উঁহু কেন? অন্য লোকেই তো হাসলে।

ছোকরা এবার একটু বেশী হেসে বললে—শিঙেতে বাঁশী বাজে না ঠাকরুণ, ক্যানেস্তারায় তবলার বোল ওঠে না।

—ও মা গো! মেয়েটি বিস্ময়ে কৌতুকে চোখ বিস্ফারিত ক'রে সঙ্গিনীর সঙ্গে দৃষ্টিবিনিময় করলে।

সুন্দরী তরুণীটির মুখেও মৃদু হাসির রেখা ফুটে উঠেছিল। কিন্তু সে হাসির চেহারা যেন ভিন্ন রকমের। সে এবার বললে—আমরা হেসেছি বলে তুমি রাগ করছ নাকি?

—রাগ? অন্ধ হেসে বললে—ওরে বাপ রে, আপনকাদের ওপর কি রাগ করতে পারি মশায়? তবে হাসলেন কেনে, তাই শুধালাম, বলি—অন্যায় কিছু বললাম না কি?

—হারামজাদা! দোকানী বলে উঠল, ওরে শুয়োর, হাসছেন তোমার 'মোহিত' শুনে।

—কেনে, মোহিত ক'বে দিতে পারি না আমি?

—খুব হয়েছে থামো!

—কেনে?

—কাকে কি বলছিস্ জানিস্?

অন্ধ এবার সঙ্কুচিত হয়ে গেল।

—ওঁরা হলেন কলকাতার গাইয়ে, কলের গান শোন নাই হারামজাদা। সেই রকম গাইয়ে, বড় বড় বাইজী! বেটা পঙ্ক্ষীরাজ ওঁদিকে মোহিত ক'রে দেবেন!

অপরাধীর মত সে এবার বললে—তা হ'লে তো অপরাধ হয়ে যেয়েছে।

—হ্যাঁ, তা হয়েছে।

কালো মেয়েটি চুল বাঁধা শেষ ক'রে গামছা কাঁধে ফেলে স্যুটকেশ খুলে সাবান বা'র ক'রে নিয়ে বললে—কাছেই পুকুর-ঘাট, নেয়ে আসি আমি।

অন্ধ হাতের সিগারেটটা ফেলে দিলে ছুঁড়ে। উপবের দিকে মুখ ক'রে অদ্ভুত ভঙ্গিতে নিঃশব্দে হাঁ ক'রে হাসতে লাগল—নাকের ডগাটা তার ফুলে ফুলে উঠছিল। অত্যন্ত হাস্যকর এবং কুৎসিত সে মুখভঙ্গি।

দোকানী বললে—দেখ দেখ হারামজাদার মুখ দেখ। এই হারামজাদা পঙ্ক্ষে!

অন্ধের নাম 'পঙ্ক্ষী'। পঙ্ক্ষে আকর্ণ-বিস্তার নিঃশব্দ হাসি হেসে বললে—ভারী সুন্দর বাস উঠছে সিংজী। পরাণ একেবারে মোহিত ক'রে দিলে।

সুন্দরী মেয়েটী বললে—তোমার সেই মোহিত করা গান যদি গাও তবে তোমাকে ওই সাবানখানা দিয়ে যাব।

মাথা চুলকে পঙ্ক্ষী বললে—দিয়ে যাবেন? গান গাইলে?

—হ্যাঁ।

—কিন্তুক। একটু চুপ ক'রে থেকে পঙ্কী বললে—আমার আস্পদ্ধা হয়ে যেয়েছে আজ্ঞে। গান কি আপনকাদের ছামনে গাইতে পারি আমি?

—কেন? তুমি তো ভালো গান গাইতে পার। ভারী সুন্দর গলা তোমার!

—ভালো লেগেছে আপনকার? অভ্যস্ত নিঃশব্দ হাসিতে মুখ ভ'রে গেল পঙ্কীর।

কালো মেয়েটি বললে হারমোনিয়ম-বাজিয়েকে—এস আমার সঙ্গে। ঘাটে একটু দাঁড়াবে।

পঙ্কী বললে—একটা কথা বলব ঠাকরুণ?

স্নিগ্ধ হাসি হেসে সুন্দরী মেয়েটি বললে—বল।

—রাগ করবেন না তো?

—না না! বল।

পঙ্কী কিন্তু চুপ ক'রে রইল। তারপর হঠাৎ বললে—নেতাই, মলিন্দ! চলে গেলি না কি? নেতাই?

—কেনে, নেতাইকে কেনে? দোকানের দরজা বন্ধ করতে করতে দোকানী বললে—জল খাবে না সব? বাড়ী যাবে না?

হেসে পঙ্কী বললে—আপনিও দোকানে তালা দিছেন লাগছে!

—হুঁ দিলাম। জল খাবি তো আয়—আমি যাচ্ছি বাড়ী।

—উঁহু। ক্ষিদে নাই আজ।

সাড়ে দশটা পার হয়ে গিয়েছে। চৈত্র মাসে এবার এরই মধ্যে চারিদিক ধূলিধূসর এবং উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। স্টেশনে টিনের উত্তাপের প্রাখর্যে মধ্যে মধ্যে কটাং কটাং শব্দ উঠছে। লাইনের জোড়ের মুখেও শব্দ উঠছে।

সুন্দরী তরুণীটি এক দৃষ্টিতে অন্ধ পঙ্কীর দিকে চেয়ে রয়েছে। পঙ্কী স্তব্ধ হয়ে বসে আছে। কখনও কখনও মুখ তুলছে, কিন্তু পরমুহূর্তেই ঘাড় নামাচ্ছে।

মেয়েটি বললে—কই বললে না তো?

—আজ্ঞে?

—কি বলবে বলছিলে?

—বলছিলাম—! পঙ্ক্ষী লজ্জিত অপরাধীর মত হেসে ঘাড় নামালে।

—বল।—ব'লে মেয়েটি প্রতীক্ষা ক'রে থাকে। প্রতীক্ষার মধ্যেই সে অন্যমনস্ক হয়ে ধূলিধূসর দিগন্তের দিকে চেয়ে থাকে এক দৃষ্টিতে। পঙ্ক্ষী ঘাড় তোলে মধ্যে মধ্যে. আবার ঘাড় নামায় এই অবসরের মধ্যে। হঠাৎ সে বলে ফেললে—বলছিলাম কি—?

ঠিক এই সময়েই মাথার উপর টিনের শেডের উপর শব্দ উঠল অত্যন্ত জোরে। মেয়েটি চমকে উঠল—কি রে বাবা?

—উঁ আজ্ঞে—। বিজ্ঞের মত হেসে পঙ্ক্ষী বললে—রোদের তাতে টিনে শব্দ উঠছে।

—তাই না কি? রোদের তাপে টিনে শব্দ ওঠে?

—হ্যাঁ। এ এখন সেই সন্ধে বেলা পর্যন্ত উঠবে। এই দেখুন—এ শব্দ কিন্তু তাতের নয়! কাক বসল চালে।

মেয়েটি বেরিয়ে গিয়ে দাঁড়ালো প্লাটফর্মের উপর। কৌতূহল হ'ল তার। সত্যিই কাক বসেছে। সে বিস্মিত হয়ে ফিরে এসে দাঁড়াল—পঙ্ক্ষীর কাছে—পঙ্ক্ষী চঞ্চল হয়ে উঠল। কয়েকবার স্ফীত হয়ে উঠল নাসারন্ধ্র, মৃদুস্বরে সবিনয়ে বললে—বলছিলাম কি আজ্ঞে—।

মেয়েটি দুটি আঙুল ওর চোখের সামনে নাড়ছিল।

পঙ্ক্ষী বললে—বলব মশায় নির্ভয়ে?

মেয়েটি আঙুল সরিয়ে নিলে পঙ্ক্ষীর নিষ্পলক চোখের সামনে থেকে। —বলবে—বল। বার বারই তো বলতে বলছি!

—আপুনি একটি গান যদি গাইতেন। কথা অর্ধসমাপ্ত রেখে, নিঃশব্দ হাসিতে বিস্ফারিত মুখে সে মাথা চুলকাতে লাগল।

মেয়েটি হাসলে।—গান শুনবে?

মাটিতে হাত বুলিয়ে অনুভব ক'রে পঙ্ক্ষী মেয়েটির পায়ের আঙুলের প্রান্ত স্পর্শ ক'রে বললে-আপনাদের চরণ কোথা পাব বলেন? গানই বা শুনব কি ক'রে? তবে—। একটু নীরব থেকে উপরের দিকে দৃষ্টিহীন মুখ তুলে বললে--সাধ তো হয়। মনিষ্যি তো বটে। আর গান শুনতে ভালোবাসি আমি।

কি মনে হ'ল মেয়েটির, করুণা হয় তো, হয় তো খেয়াল, বললে—আচ্ছা।

বলেই আবার চিন্তিত মুখে বললে—হারমোনিয়ামটা যে দেখি অনেক জিনিষ চাপা পড়েছে।

—হারমণি?

—হ্যাঁ?

—হারমণি থাক। আপুনি এমনি গান। আস্তে আস্তে গান। রোদ বেজায় চড়েছে। শুধু গলায় আস্তে আস্তে গান, ভারী ভালো লাগবে।

কল্পনাটি বড় ভালো লাগল মেয়েটির। ঠিক বলেছে অন্ধ। সে গান ধরলে মৃদুস্বরে।—

'কালা তোর তরে কদমতলায় চেয়ে থাকি।
কভু পথের পরে, কভু নদীর পারে
চেয়ে চেয়ে ক্ষয়ে গেল আমার
কাজল-পরা জোড়া আঁখি।'

পঙ্ক্ষীর সর্বাঙ্গ যেন অসাড় হয়ে গিয়েছে। মস্তিষ্কের মধ্যে শিরায় উপশিরায় ওই গানের ধ্বনি-ঝঙ্কার বীণের বহুতন্ত্রী ঝঙ্কারের মত ধ্বনি তুলে সমস্ত চেতনাকে আচ্ছন্ন ক'রে দিয়েছে তার।

গান শেষ হয়ে গেল। অন্ধকে গান শুনিয়ে মেয়েটির ভারী তৃপ্তি হ'ল। ঈষৎ হেসে সে প্রশ্ন করলে—কেমন? ভালো লাগল?

—আজ্ঞে? চকিত হয়ে উঠল পঙ্ক্ষী। তার অসাড় নিস্পন্দ শরীরে মুহূর্তে চেতনার প্রবাহ বয়ে গেল।

—ভালো লাগল?

পঙ্ক্ষী বললে—জেবন ধন্য হ'ল আমার, ঠাকরুণ।

মেয়েটি এবার হেসে ফেললে।

—হাসছেন? তা'—। একটু চুপ ক'রে থেকে পঙ্ক্ষী বললে—তা' এমন গান জেবনে কোথা শুনতাম বলেন! পঙ্ক্ষীর কথাগুলির মধ্যে একটি বেদনার সুর ছিল তার স্পর্শে মেয়েটি আর হাসতে পারলে না। চুপ ক'রে গেল। কোন কথাও খুঁজে পেলে না।

পঙ্ক্ষী বললে—একটি পেণাম করব আপনকাকে।

—প্রণাম? কেন?

—ভারী সাদ হচ্ছে।

লোভ হ'ল মেয়েটির। মুগ্ধদৃষ্টি, অজস্র প্রশংসা, প্রেম-গুঞ্জন, অনেক

পেয়েছে সে এবং পায়। কিন্তু প্রণাম? মনে পড়ল না তার। নিজেদের সমাজের ছোটরা অবশ্য প্রণাম করে। কিন্তু এ প্রণামের দাম অনেক বেশী বলে মনে হ'ল তার। সে প্রতিবাদ করলে না। নীরবে দাঁড়িয়ে রইল।

পঙ্ক্ষী হাত বুলালো তার পায়ের উপর, তারপর মেয়েটির দু'খানি পায়ের উপর নিজের মুখখানি রাখলে।

মেয়েটির ভারি ভালো লাগল।

মেয়েটি পায়ে উষ্ণ নিশ্বাস অনুভব করলে, পঙ্ক্ষীর বিকৃত চোখ থেকে জল ঝ'রে তার পায়ে লাগছে। তবু সে পা সরিয়ে নিলে না। ধূলিধূসর দিগন্তের দিকে অর্থহীন স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে সে চুপ ক'রেই দাঁড়িয়েছিল, হঠাৎ প্রশ্ন করলে -তোমাব কে কে আছে বাড়ীতে? মা—মা আছে? বাপ আছে?—শুনছ?..... ওঠ! ওঠ? অনেক প্রণাম করা হয়েছে। ওঠ। ওঠ।

—আরে এই বেটা! এই! ও হচ্ছে কি? এই! হারমোনিয়ম-বাজিয়ে এবং সেই কালো মেয়েটি স্নান সেরে ফিরে এসেছে। হারমোনিয়ম-বাজিয়ে ধমক দিলে পঙ্ক্ষীকে।

কালো মেয়েটি বললে--মরণ!

সুন্দরী তরুণীটি মৃদুস্বরে আবার বললে—ওঠ! ওঠ!

এবার পঙ্ক্ষী উঠল। তার দিকে চেয়ে কালো মেয়েটি এবং হারমোনিয়ম-বাজিয়ে একসঙ্গে হেসে উঠল। পঙ্ক্ষীর চোখের জলে ভিজে মেয়েটির পায়ের আলতা অন্ধের মুখময় লেগেছে। গালে, নাকে, কপালে. ঠোঁটে, মুখময় লাল রঙ।

মেয়েটি বললে -মুখটা মোছ। গোটা মুখে তোমাব লাল বঙ লেগেছে।

—লাল রঙ?

—হ্যাঁ, আলতা লেগেছে।

—আলতা?

—হ্যাঁ, ঠোঁটে, মুখে, গালে, নাকে--মুছে ফেল।

—থাকুক আজ্ঞে।

কালো মেয়েটি বললে সঙ্গিনীকে—নে নে ওর সঙ্গে আর ন্যাকামী করতে হবে না। ওদিকে দেখে এলাম ভাত হয়েছে। নেয়ে নিবি তো নেয়ে আয়। সুন্দর জল পুকুরের।

—কত দূর?

পঙ্ক্ষী উঠে দাঁড়াল।—এই কাছেই আজ্ঞে। কাছেই। চলেন আমি নিয়ে যাচ্চি। আসুন।

—তুমি?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, কাণাদের পথঘাট মুখস্থ। ঠিক নিয়ে যাবে। যা না। কালো মেয়েটি একটু হেসে বললে—নিশ্চিন্দি চান করবি, ও বসে থাকবে ঘাটে।

সত্য কথা। দিব্য পথে পথে চলে পঙ্ক্ষী। মধ্যে মধ্যে পা বুলিয়ে অনুভব ক'রে নেয়। স্টেশন-রাস্তার ধারে প্রথম বটগাছটার তলার ছায়ায় এসে বলে—এই বটতলা এয়েচে। আসেন এই বাঁ ধারে।

একটু অগ্রসর হতেই পুকুর দেখা যায়। কালো কাজলের জল।

মেয়েটি বললে—তোমার নাম কি?

—আমার নাম? আমার নাম 'পঙ্ক্ষে'। 'পঙ্ক্ষী' আর কি।

—পঙ্ক্ষী?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। ছেলেবেলায় পাখীর মতন চিঁ চিঁ ক'রে চেঁচাতাম কিনা! কাণা বলে মা হেনস্তা করত। ভূঁয়ে পড়ে চেঁচাতাম।

—মা বাবা আছে তোমার?

—হ্যাঁ। যাই আমি বাড়ী মাঝে মাঝে। বাবা আমার নোক ভাল। বাবার নাম—এখানে—। হঠাৎ কথায় ছেদ ফেলে দেয় নিজেই—উপরের দিকে মুখ তুলে বলে—হ হ। মরালের বড় ঝাঁকটা এসেছে লাগছে।

মেটে রঙের বুনো হাঁসের একটা প্রকাণ্ড ঝাঁক সত্যই মাথার উপর পাক দিচ্ছিল, তাদের পাখার ডাক ধরেছে আকাশে।

মেয়েটিও আকাশের দিকে চেয়ে দেখলে।

পঙ্ক্ষী বললে—তার অর্ধসমাপ্ত কথা শেষ করছে সে।—বাবার নাম এখানে সবাই জানে। কৃত্তিবাস বাগ্দীর নাম—।

বাবার নাম কৃত্তিবাস। অন্ধ অপরিণত অপুষ্টাঙ্গ ছেলের চীৎকার শুনেই তার নামকরণ করেছিল—পঙ্ক্ষী। ভালো মিষ্ট গৌরবজনক নাম রাখার প্রয়োজনই অনুভব করেনি কোন দিন।

পঙ্ক্ষী বললে। ঘাটের ধারে বসেছিল সে, মেয়েটি ঠাণ্ডা জলে গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে তার কথা শুনছিল। পঙ্ক্ষী বললে—আমার এক দিদি আছে। দিদি

আমাকে ভালোবাসত, কোলে নিত। তা'—এই আপনকার মতন বয়েস হবে তার।

আমার মত? ঈষৎ হেসে মেয়েটি বললে—আমার বয়েস কি ক'রে বুঝলে তুমি?

সলজ্জ হাসি হেসে মাথা চুলকে পঙ্ক্ষী বললে—তা' আপনি আমার চেয়ে এই খানিক বড় হবেন। তার বেশী নন। একটু চুপ ক'রে থেকে বললে—গলার রজ (আওয়াজ) শুনে বুঝতে পারি কি না খানিক-আধেক। আপনার গলা এখনও বাঁশের বাঁশীর মত। খাদ মেশে নাই। তা ছাড়া—

পঙ্ক্ষী থেমে গেল। সে বলতে পারলে না কথাটা। পায়ের উপর মুখ রেখেছিল সে, কোমল মসৃণ স্পর্শ এখনও সে যেন অনুভব করছে।

কথাটা পাল্টে বললে—এখান থেকে বাড়ী আমার ক্রোশ চারেক হবে। বছর খানেক আগে মা একদিন খুব মেরেছিল। তা' দিদি বললে—পঙ্ক্ষে, তুই তো গান গাইতে পারিস্, তা ভালো বাজারে-জায়গায় যা না কেনে। গান গাইবি, ভিখ করবি। কথাটা মনে লাগল আমার। দিদিই একদিন আমার হাত ধ'রে এখানে রেখে গেল। সেই অবধি—। নিঃশব্দে হেসে সে চুপ ক'রে গেল।

হঠাৎ এক সময় বলে উঠল—আপনকার গানের ওইটুকুন ভারী সোন্দর। সেই কি—কালা তোমার যখন বাজে বাঁশী। বলতে বলতে সে সুরেই গাইতে আরম্ভ করলে।—

ঘর-কন্না সব ভুলে যাই ছুটে যে আসি।
আমার গা-ঘষা হয় না, আমার কেশ-বাঁধা হয় না,
আরও হয় না কত কি!

মেয়েটি সাবান মাখছিল--বিস্ময়ে তার হাত থেকে সাবানখানা পড়ে গেল। অবিকল সুরে নির্ভুল গানখানি গাইছে পঙ্ক্ষী।

—আঃ, নাইতে আর লাগে কতক্ষণ? ওদিকে যে ট্রেণের সময় হয়ে এল। হারমোনিয়ম-বাজিয়ে ডাকলে ঠিক এই সময়ে। ঘাট থেকে তাকে দেখা যাচ্ছে। ব্যস্ত হয়ে ডাকতে এসেছে।

সত্যই স্টেশনে টিকিটের ঘণ্টা বেজে উঠল।

ট্রেণ চলে গেল। খ্যামটার দলটিও চলে গেল। দোকানী সিং ট্রেণের প্যাসেঞ্জারদের চা-সরবৎ, জলখাবার বিক্রী শেষ ক'রে ডাকলে—পঙ্ক্ষে! পঙ্ক্ষে!

পঙ্কের সাড়া পাওয়া গেল না! গেল কোথায়?

দোকানী ওকে সত্যই ভালোবাসে। দোকানীর স্ত্রীও ভালোবাসে। যেদিন পঙ্কীর কোথাও অন্ন না জোটে সেদিন দোকানী ডেকে খেতে দেয়। দু'টোর ট্রেণ গেলেই দোকানী একবার পঙ্কীর খোঁজ করে। পঙ্কীর সাড়া পাওয়া গেল না। বোধ হয় গ্রামের মধ্যে গোবিন্দ-বাড়ীতে গিয়েছে প্রসাদের জন্য, কিম্বা গিয়েছে চণ্ডীতলায়। চণ্ডীতলায় পণ্ডপর্বে বলি হয়—পঙ্কে হিসেব রাখে কবে অমাবস্যা, কবে চতুর্দশী, কবে অষ্টমী, কবে সংক্রান্তি, সেদিন সে চণ্ডী-তলায় যাবেই। নিশ্চয় দু'জায়গার এক জায়গায় গিয়েছে সে। দোকানী আপনার দোকানের কাজে মন দিলে। দু'টোর ট্রেণের পর আবার চারটেয় আসবে আর একখানা ট্রেণ।

চারটের ট্রেণ এল, চলে গেল। দোকানী এবার ব্যস্ত হয়ে উঠল—পঙ্কে এখনও ফিরল না কেন? সে গেল কোথায়? ট্রেণে খ্যামটার দলের সঙ্গে চলে গেল না কি?

সত্যই তাই। পঙ্কী চুপি চুপি ট্রেণে চেপে পড়েছিল। বেঞ্চের তলায় ঢুকে শুয়েছিল। জংশন স্টেশনে নেমে কিন্তু ভিড়ের মধ্যে তাদের হারিয়ে ফেললে।

ব্রাঞ্চ লাইনের গার্ড ড্রাইভার সবাই পঙ্কীকে চেনে। তারা বললে—তুই এখানে?

আকর্ণ-বিস্তার হাসি হেসে সে বললে—হ্যাঁ। এখানেই এলাম। বলি একবার ঘুরে ফিরে আসি। একটু চুপ ক'রে থেকে হাসিটা আরও একটু বিস্তৃত ক'রে বললে—নতুন জায়গা দেখতে শুনতে তো সাধ হয়!

হেসে দত্তবাবু গার্ড বললে—বেশ, দেখা তো হ'ল, এইবার চল।

ফিরে যেতে কিন্তু পঙ্কীর কেমন লজ্জা হ'ল। সে বললে—না। থাকব এইখানে দু'দিন দশ দিন।

—থাকবি?

—হ্যাঁ। এখানকার বাজারটা কি রকম দেখি একবার। উত্তর শুনে হেসে দত্ত গার্ড চলে গেল। কয়েক মুহূর্ত পরেই পঙ্কীর একটা কথা মনে হ'ল। —গাড বাবু! গাড বাবু! গার্ড বাবুকে সে বলতে চাইছিল এখানকার স্টেশন-মাস্টার, জমাদার, স্টলওয়ালা, এদের কাছে তার জন্যে একটু বলে দেবার জন্য।

গার্ডবাবুর সাড়া পাওয়া গেল না। গার্ড তখন স্টেশনের ভিতরে।

কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে পঙ্কী চলতে আরম্ভ করলে। ঠিক এসে উঠল স্টলের সামনে।

—কি ভাজছেন দোকানীমশায়? সিঙাড়া কচুরী?

দোকানী তার দিকে চেয়ে বললে—সরে বস!

সরেই একটু বসল পঙ্কী। তারপর সে তার ডুবকীতে আঙুলের ঘা দিয়ে আরম্ভ করলে—ও কালা!

দত্ত গার্ডকে প্রয়োজন হ'ল না। নিজেকে নিজেই চিনিয়ে নিলে পঙ্কী। দোকানী, স্টেশন-মাস্টার, জমাদার, জমির উপর পাতা লাইন, সিগন্যালের তার, বাজার, পথ, ঘাট, সব তার পরিচিত হয়ে গেল। কালীমায়ের স্থান, গৌরাঙ্গের আখড়ার পথও তার মুখস্থ। জংশনের সারি সারি রেললাইন প্রায় অনায়াসেই পার হয়ে যায় সে। প্রথমে এসে একটুখানি দাঁড়ায়, লোকের সাড়া পেলে জিজ্ঞাসা করে—কে বটেন গো? লাইনে গাড়ী রয়েছে না কি?

লোক না থাকলে—কান পেতে শোনে ইঞ্জিনের শব্দ শোনা যায় কি না। তারপর এগিয়ে এসে লাইনের উপর পা দেয়। স্পর্শ ক'রে বুঝে নেয় চলন্ত ট্রেণের গতিবেগ তার মধ্যে প্রবাহিত হচ্ছে কি না। পঙ্কী বলে—ভয় লাগলে শিরদাঁড়া যেমন যেমন শির-শির করে, তেমনি শিরশিরিনি বয় লাইনে। সন্দেহ হ'লে লাইন ছেড়ে সে ওভারব্রিজের দিকে যায়, এক পাশের রেলিং ধ'রে স্বচ্ছন্দে পার হয়ে যায় সে। সিঁড়ির সংখ্যা তার মুখস্থ।

ডুবকীর সঙ্গে এখন একটা হাঁড়ি শুদ্ধ রেখেছে। আঙুল দিয়ে বাজিয়ে অনেক পরীক্ষা ক'রে কিনেছে। হাঁড়ি বাজিয়ে গান করলে লোক জমে বেশী।

মধ্যে মধ্যে স্টেশন-ঘরেব দরজায় গিয়ে বসে। বসবার সময়টি তার দুপুর বেলায় একটা থেকে আড়াইটার মধ্যে। এ সময়টায় মাস্টারবাবুরা ব'সে গল্প-গুজব করে। সে শোনে। গল্পের মধ্যে ছেদ পড়লেই বলে—মাস্টাববাবু!

—কি রে ব্যাটা? এসেছ তো!

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—তা' কি বলছ?

—আজ্ঞে! মাথা চুলকায় পঙ্কী।

—কি জিজ্ঞাস্য? বর্ধমান কত দূর? কত ভাড়া?

—আজ্ঞে না, বলছিলাম বলি—। হাসির ভঙ্গীতে দন্তুর পঙ্কী আরও

একটু দন্ত বিস্তার ক'রে বাবুদের কাছ থেকে উৎসাহ-বাক্য প্রত্যাশা করে। পায় সে উৎসাহ বাক্য।

—কি বলছিলে? বর্ধমান শহরটা কেমন? কত বড়?

—হ্যাঁ। আরও একটু বেশী দন্তবিস্তার করে সবিনয়ে!

—বর্ধমান যাবি? দেব একদিন চড়িয়ে গাড়ীতে?

পঙ্ক্ষী চুপ ক'রে থাকে। সম্মতি জানাতে শঙ্কিত হয়। গাড়ী-ঘোড়া, লোকজন, গলি-ঘুঁজি, প্রকাণ্ড বড় শহর—তার মধ্যে কোথায়—?

টেলিগ্রাফের যন্ত্রটা শব্দ ক'রে ওঠে, ওদিকে টেলিগ্রাফের ঘণ্টা বাজে ঠিন—ঠিন। বাবুরা ব্যস্ত হয়ে ওঠে। পঙ্ক্ষী উঠে আসে। ভাবতে ভাবতে প্লাটফর্মের ধারে গিয়ে দাঁড়ায়। কাছেই টেলিগ্রাফের পোস্টে বাতাসের প্রবাহে শব্দ ওঠে, গায়ে-লাগানো মাইল-লেখা লোহার প্লেটটা অত্যন্ত দ্রুত শব্দ ক'রে কাঁপে। পঙ্ক্ষী ধীরে ধীরে টেলিগ্রাফ-পোস্টে কান লাগিয়ে দাঁড়ায়। পোস্টের গায়ে আঙুল বাজিয়ে বলে—টরে-টক্কা, টরে-টক্কা, টক্কা-টক্কা টরে। তারপর বলে—হ্যালো! হ্যালো ঠাকরুণ, বর্ধমানের ঠাকরুণ। আমি পঙ্ক্ষী। গান গাইছি আমি। "ও তোর তরে কদমতলায় চেয়ে থাকি!"

দিন যায়। এক বৎসর হয়ে গেল। পঙ্ক্ষী জংশনেই রয়েছে। টাকা পয়সা কিছু জমেছে তার। দোকানীর কাছে রাখে তার কিছু অংশ। দোকানী জানে ঐ তার সব। কিন্তু পঙ্ক্ষী তার উপার্জনকে ভাগ করে। কিছু নিজের কাছে রাখে। বাকীটা রাখে কাঠে-ঘেরা ছোট্ট চোর কুঠুরীর মত জেনানা ওয়েটিং রুমের এক কোণে মাটিতে পুঁতে। জংশন হলেও ব্রাঞ্চ লাইনের প্লাটফর্মটা পাকা নয়। জেনানা ওয়েটিং রুমটার মেঝেও কাঁকরমাটির মেঝে। তার উপর রাখে তার বিছানাটা। বিছানা একখানা বস্তা। রাত্রে ওইখানে বস্তা বিছিয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে প'ড়ে থাকে।

বর্ধমানের নাতিকটা কমে গিয়েছে। "কালা তোর তরে—" গানখানা সে গায়, লোকে তারিফ করে, পঙ্ক্ষী সবিনয়ে হাসে, কিন্তু আর সেই চৈত্র-দুপুরে গেঁয়ো স্টেশন-প্লাটফর্মে নরম দু'খানি পায়ের উপর মুখ রেখে প্রণাম করার কথা মনে পড়ে না। সেই মিষ্টি প্রাণমাতানো গন্ধের কথাও মনে পড়ে না, মনে পড়ে না ঠিক নয়, মনে পড়ে কিন্তু বুকের ভেতরটা তেমন 'আকুলি' ক'রে ওঠে না।

কত দিন পর। অনেক দিন।

হঠাৎ সেদিন সমস্ত শরীরে তার শির শির ক'রে কি বয়ে গেল। লাইনের উপর ট্রেণ গেলে যেমন শব্দে-স্পর্শে শিহরণ জাগে। সেই গান! সেই গলা! আজ আর গান শুধু নয় গানের সঙ্গে যন্ত্র বাজছে। স্টেশনের ঘরের সামনে ঠাকরুণ গান করছে। "কালা তোর তরে—!"

পঙ্ক্ষী প্রায় ছুটে এসে দাঁড়াল। বেশ বুঝতে পারলে ঠাকরুণের সঙ্গে অনেক লোক রয়েছে। ছোট ছেলেও রয়েছে।

গান শেষ হতেই সে হাত জোড় ক'রে বললে—ঠাকরুণ!

—কে রে তুই?

—আজ্ঞে যে ঠাকরুণ গান গাইলেন তাকেই বলছি আমি।

সঙ্গে সঙ্গে হাসির হুল্লোড় প'ড়ে গেল। একজন বললে—মরণ!

আবার গান আরম্ভ হ'ল। "চোখে ছটা লাগিল—" পঙ্ক্ষীর বুক একেবারে দুলে উঠল। তার সেই গান। নিতাই কবিয়ালের কাছে সে শিখেছিল, ঠাকরুণ শিখেছিল তার কাছে।

গান শেষ হ'ল!

—আমাকে চিনতে পারলেন না ঠাকরুণ। আমি পঙ্ক্ষী—।

—এই ব্যাটা, এই। ভাগ!

ভাগিয়ে দিলেও সে এবার সঙ্গ ছাড়বে না। সে সজাগ হয়ে বসে থাকে। ট্রেণের ঘণ্টা পড়ল। যাত্রীর দলটি আসর গুটিয়ে নিলে। একজন বললে—গ্রামোফোনটা ভাল ক'রে বন্ধ করিস্। রেকর্ডগুলো বাক্সের মধ্যে পুরে নে।

গাড়ী এল, চলে গেল। স্টেশন স্টাফ, স্টলওয়ালা বিস্মিত হ'ল—পঙ্ক্ষী নাই।

আরও অনেক কাল পর। অনেকগুলি বৎসর চলে গিয়েছে। পঙ্ক্ষীর চুলে সাদা ছোপ পড়েছে। দন্তুর মুখের দাঁত পড়েছে কয়েকটা। কানে শোনার শক্তি কমে' এসেছে। লাইনে পা' দিয়ে দূরে ট্রেণ আসছে কি না আর ধরতে পারে না।

পঙ্ক্ষী এক তীর্থক্ষেত্রে পথের ধারে বসে ভিক্ষা করে। গানও আর তেমন গায় না। বলে—অন্ধজনে দয়া কর বাবা। অন্ধকে একটি পয়সা দাও মা। মা লক্ষ্মী জননী!

মা-জননীরা যখন যায় তখন পঙ্ক্ষী বেশী আকুলতা প্রকাশ করে। জুতোর শব্দ থাকে না—অথচ খস-খস শব্দ ওঠে গরদের কাপড়ের, পূজার ফুলের গন্ধ ওঠে, পঙ্ক্ষী বুঝতে পারে মা-লক্ষ্মীরা আসছেন।

যেদিন ভিক্ষে কম হয় সেদিন গান করে।

সেদিন সে গান গাইছিল। "চোখে ছটা লাগিল—" গাইতে আজকাল ভালো লাগে না। ভক্তিরসের গানই বেশী গায়। 'কালা তোর তরে' গানখানা মাঝে মাঝে গায়। সেদিন গাইছিল সে ওই গানখানাই।

গান শেষ হতেই একজন হেসে বললে—খুব গেয়েছিলে গানখানা রকর্ডে। ঘাটে মাঠে হাটে ছড়িয়ে গেল।

নারী-কণ্ঠের অতি মৃদু হাসির শব্দ শুনতে পেলে পঙ্ক্ষী। মেয়েটি বললে—গাইলাম, কিন্তু কালা শুনলে কই?

—ওই তোমার এক ঢং! আর তীর্থে কাজ নেই। চল ফিরে চল।

—নাঃ। বয়স অনেক হ'ল। অন্ধকার হয়ে আসছে দুনিয়া। আর—

অসহিষ্ণু পঙ্ক্ষী বলে উঠল—কিছু দয়া হবে মা? অন্ধ—

তার হাতে এসে পড়ল কি একটা।

পুরুষটি বললে—আধুলি; পয়সা নয় রে বেটা।

—আধুলি?

—হ্যাঁ।

আধুলি? মেকী নয় তো? হাত বুলিয়ে—মাটিতে ফেলে শব্দ পরখ ক'রে নিলে পঙ্ক্ষী। তারপর পরম কৃতজ্ঞতাভরে হাত বাড়িয়ে মেয়েটির পায়ে হাত বুলিয়ে প্রণাম করলে।

তারা চলে গেল। পায়ের শব্দ উঠল।

পাখীরা ডাকছে। দিন বোধ হয় শেষ হ'ল। পঙ্ক্ষীও উঠল।

ঘাসের ফুল

রাণীগঞ্জ-টাইলে ছাওয়া উত্তর-দক্ষিণে লম্বা বাংলোটা কলিয়ারীর আপিস। আপিসের উত্তরেই পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা খড়ে-ছাওয়া বাংলোটা কলিয়ারীর বাবুদের মেস্‌। বাংলো দুটোর কোলে প্রকাণ্ড বড় খোলা মাঠখানায় অতুল পায়চারি করিতেছিল। চারিদিক অন্ধকার। 'পিট' গুলার মুখে বয়লার-গুলোর চিমনীর মাথায় শুধু আগুনের শিখা হু হু করিতেছে। আর এখানে-ওখানে কুলিদের কেরোসিনের কুপী খদ্যোতের মত কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে। মেসের একটা ঘরে কুলি-রিক্রুটার চন্দ্রকান্ত হুঁকা টানিতে টানিতে সার্ভেয়ারকে বলিতেছিল—আমার ভাই ষোল আনার মধ্যে সাড়ে পনের আনা মিছে কথা . ...সে আমি মিছে কথা বলব না।

বড় টেবিলটার উপরে খনির ম্যাপখানায় নূতন একটা লাইন টানিতে টানিতে সার্ভেয়ার উত্তর দিল—হুঁ—তা নইলে চাকরি থাকবে কেন? আলোটা একটু বাড়িয়ে দেন ত চন্দ্রবাবু। চশমা নইলে আর চলছে না।

পাশের ঘরে লেবার রেজিষ্ট্রার সীতাপতি আপন মনে একখানা ছবি আঁকিতেছিল। সম্মুখে গম্ভীর ভাবে আর একজন বসিয়া আছে স্থাণুর মত—চোখের পলক পর্যন্ত পড়ে না।

তার পাশের ঘরে বৃদ্ধ কম্পাউণ্ডার চশমা-চোখে স্ত্রীকে পত্র লিখিতেছিলেন —"এখানে 'বৃষ্টি খুবই হইয়াছে। ওখানে 'বৃষ্টির অবস্থা কিরূপ পত্রপাঠ জানাইবে। চাষ-আবাদের অবস্থা বুঝিয়া ধান্যগুলি ধার দিবার ব্যবস্থা করিবে।"

আর একখানা ঘরে লটারীর টিকিট কেনা হইতেছিল। ম্যানেজারের নামে একখানা লটারীর টিকিট-বই আসিয়াছে—সেইখানা হেডক্লার্ক বাবু লইয়া বিক্রয় করিতেছেন। আট আনা করিয়া টিকিটের দাম। প্রথম পুরস্কার পাঁচ হাজার টাকা। কালীপদ একটা ছদ্মনাম খুঁজিয়া সারা হইয়া গেল। হেডক্লার্ক বাবু কলম ধরিয়া বসিয়াছিলেন—বলিলেন—কি নাম দেবে বল হে কালীপদ?

কালীপদ বলিল—শ্রীবৎস—কি বলেন? ও নামে শনির দৃষ্টিও চলে না।......দাঁড়ান, দাঁড়ান,—মহালক্ষ্মী কেমন হবে বলুন দেখি?

একেবারে এ-পাশের ঘরে একটি সুরূপ তরুণ হারমোনিয়ম লইয়া গলা সাধিতেছিল—'কি ঘুম তোরে পেয়েছিল হতভাগিনী!' ছেলেটি কলিয়ারীর মালিকদের থিয়েটারে নায়িকা সাজে। এখানে চাকরিও তার সেই জন্য। বেতন বাইশ টাকা ছিল—এখন দুই টাকা কমিয়া হইয়াছে কুড়ি।

পাশের বারান্দায় স্টোরকিপার অমূল্য কুলিদের তেল মাপিতে মাপিতে বলিল—তুমি একটা যাত্রার দলে ঢুকে পড়, বুঝলে বিনোদ। মোটা মাইনে হবে। কেন কুড়ি টাকায় পড়ে আছ বল দেখি! গান থামাইয়া বিনোদ বলিল—ভারি চুক হয়ে গেছে গুদোম-বাবু! সেবার বীণাপাণি অপেরা আমাকে সাধাসাধি করলে। বলে—পঁয়ত্রিশ টাকা মাইনেতে তুমি ঢোক—তার পর ছ-মাস পরে পঞ্চাশ ক'রে দেব। তিন বছরে এক-শো টাকা। তা যাত্রার দল ব'লে আর—!

অমূল্য বলিল—আমি একটা দোকান করব ভাই। বেগুনী-ফুলুরী কলাই-সেদ্ধ, বুঝলে। বউ ক'রে দেবে, একটা ছোঁড়াকে দিয়ে বিক্রী করাব। ভারি লাভ।

গুটিতিনেক ছেলেমেয়ে ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া বিনোদের বিছানায় ঝাঁপাইয়া পড়িল। একটি মেয়ে বলিল—বাড়ীতে গান করতে হবে বিনোকাকা। চল, মা ডাকছে।

অপর মেয়েটি নাকিসুরে বলিল—ধরে নিয়ে যাব হ্যাঁ।

ছোট ছেলেটি তখন হারমোনিয়মের রিড চাপিয়া ধরিয়া একটা বেসুরের সৃষ্টি করিয়া ফেলিয়াছে। বিনোদ হাসিয়া বলিল—চল্ চল্ যাই। চিরুনীটা কোথায় রাখলেন গুদোমবাবু? আমার আবার ডিউটি আছে—তা চল, দু'খানা গান গেয়েই চলে আসব।

প্রথম মেয়েটি বলিল—বই নিয়ে যেতে বলেছে মা।

কুঠীর মালিকদের কয়েক জন এখানে সপরিবারে বাস করেন। বিনোদকে মাঝে মাঝে বাসার ভিতর গান শুনাইতে হয়, রেলের বাবুদের লাইব্রেরী হইতে উপন্যাস আনিয়া যোগানোও তাহার একটা কাজ। নিজেই হারমোনিয়মটা লইয়া বিনোদ চলিয়া গেল। গুদামবাবু বলিলেন—দেখলে হে বাবুর চুল আঁচড়ানো?

বিনুর ঘরের অংশীদার বিনোদের পরিত্যক্ত চিরুনীখানা লইয়া চুল আঁচড়াইতে আঁচড়াইতে বলিল—হুঁ।

তার পর আয়নাখানায় নানা ভঙ্গিতে মুখ দেখিয়া বলিল—বেশ আছে বাবা। আর থাকবে না-ই বা কেন বল? চেহারা ভাল, গলা ভাল।

স্টোর-বাবু ফিক করিয়া হাসিয়া বলিলেন—বই যোগায়—সেটা বল। আর মেঝেনগুলোকে দেখেছ! টাইমবাবু বলতে পাগল!

অতুল ভাবিতেছিল হেন্‌রী ফোর্ড জীবন আরম্ভ করিয়াছিল কাঠের মিস্ত্রী রূপে—এডিসন নামে একটি ছেলে খবরের কাগজ বেচিত। অতুল এখানে আসিয়াছে দেড় শত মাইল পায়ে হাঁটিয়া—পথে—বর্ষার নদী—তখন দু'কূল পাথার. সেই নদী সে সাঁতার দিয়া পার হইয়া আসিয়াছে। পারের পয়সা দিতে গেলে খাবারের পয়সার অভাব পড়িবার সম্ভাবনা ছিল। আজ সে কলিয়ারীর ম্যানেজার হইতে চলিয়াছে। এক বৎসর পরে মাইনিং পরীক্ষা দিবে।

অদূরে একটা আলোর পিছনে দুইজন বাবু আসিতেছিল। একজন উচ্চ-কণ্ঠে অনর্গল বকিয়া চলিয়াছে। অতুল বুঝিল। ম্যানেজার আসিয়া বলিলেন—এই যে অতুলবাবু, আপনাকেই খুঁজছিলাম আমি। আজ খাদে বারুদ জ্বলে গেছে। ক্রমশঃই খাদ গরম হয়ে উঠছে—এখন ফায়ার না হয়।

অতুল মৃদুস্বরে প্রশ্ন করিল—গান-পাউডার জ্বলে গেল?

ওভাবম্যান খাটো মানুষ, কিন্তু শক্তিশালী দৃঢ়দেহ। সে কথা কয় যেন বক্তৃতা করে। হাত-পা নাড়িয়া অভিনয় করিয়া প্রত্যেক কথাটি বুঝাইয়া দেওয়া তাহার স্বভাব। সে বলিয়া উঠিল—আজ্ঞে হ্যাঁ। দক্ষিণ দিকের মেন গ্যালারীর পাশে—৫৮ নং সুঁদের মধ্যে—দেওয়ালে--হেই—এতখানি এক চাঙড় কয়লা জমে আছে। ঠাণ্ডারাম সর্দার বললে—বাবু ওই কয়লাটা দেগে দি। টোটা তোয়ের ক'রে ঠাণ্ডারামকে নিয়ে গেলাম দেখতে—বলি নিজের চোখে একবার দেখে দি। হঠাৎ গুঁড়ি হইয়া ওভারম্যান বলিল--ঠাণ্ডারাম বারুদের জায়গা নামিয়ে রেখে—। আবার খাড়া হইয়া হাত তুলিয়া বলিল—আমাকে দেখাইতেছে—বলে বাবু —ঐ চাংটা—আর ইদিকে অমনি ফ্যাঁস ক'রে নিয়ে নিয়েছে তখন। সঙ্গে সঙ্গে আলোয় একেবারে দিন দীপ্যমান!

একটু থামিয়া তাড়াতাড়ি হাত কয় পিছাইয়া গিয়া ওভারম্যান আবার

আরম্ভ করিল—আমি তখন হঠ্‌তে লেগেছি। বুঝতে পেরেছি কিনা। ঠান্ডা বেটা কিন্তু হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে।

হাঁ করিয়া বুদ্ধিহীনের অভিনয় করিয়া সে থামিল। তার পর আপনার বাঁ-হাতখানা খপ্‌ করিয়া চাপিয়া ধরিয়া বলিল—খপ্‌ ক'রে বেটার হাতটা ধরে হিড় হিড় ক'রে আনলাম টেনে।

তার পর সে পাণিপথক্ষেত্রে বিজয়ী আমেদ শা'র মত গম্ভীর ভাবে নীরব হইল।

ম্যানেজারটি সাদাসিধা মানুষ—বুদ্ধির মত আকারেও স্থূল। ভদ্রলোক বলিলেন—কি করা যায় অতুলবাবু?

অতুল চিন্তা করিয়া বলিল—ও 'পিট'টায় কাজ বন্ধ ক'রে দিন।

ম্যানেজার বলিলেন—কিন্তু যদি ফায়ারই হয় ধর।

হাসিয়া অতুল বলিল—ফায়ার ত হবেই।

মহাচিন্তান্বিত ভাবে ম্যানেজার বলিলেন—তা হ'লে?

—সে আর আমরা কি করব? আপনি এখানে যাঁরা মালিক আছেন তাঁদের জানান—আর হেড আপিসেও টেলিগ্রাম ক'রে দিন। তা হলেই খালাস।

ম্যানেজার বলিলেন—তাই ত' হে—কলিয়ারীটা আমার নিজের হাতে তৈরি করা—

অতুল হাসিয়া বলিল—চল্‌লাম আমি তিন নম্বর পিটে। আমার ডিউটি আছে।

প্রকান্ড লোহার বিম্‌—র‍্যাফ্‌টারে ছাঁদাছাঁদি করিয়া একটা অতিকায় কঙ্কালের মত গীয়ারহেড্‌টা দাঁড়াইয়া আছে। তাহারই তলে বিরাটকায় সাড়ে তিন-শো ফুট গভীর একটা কূপ মাটির বুক ভেদ করিয়া নামিয়া গেছে। ওপাশে ইঞ্জিন শেড। তাহার পাশেই দুইটা বয়লারের বুকের ভিতর রাবণের চিতা জ্বলিতেছে। ইঞ্জিন-শেডের বিপরীত দিকে আর একটি ছোট শেড। এটা পিট-ক্লার্কদের আপিস। একদিকে ছোট একখানি বেঞ্চ—মধ্যে একটি টেবিল—এপাশে একখানা চেয়ার। টেবিলের উপর একটা হ্যারিকেন চারিপাশের বিপুল অন্ধকারের মধ্যে অসহায় ভাবে জ্বলিতেছিল। শেডের বাহিরেই একটা লোহার ঠেঙোর উপরেই এক চাপ কয়লা দাউ দাউ করিয়া পুড়িতেছে।

সেই আগুনে সেঁকিয়া একটি কুলির মেয়ে তাহার ভিজা ঝুড়িটা শুকাইয়া লইতেছিল। চেয়ারে অতুল চুপ করিয়া বসিয়া আছে। ও-পাশের বেঞ্চে

বিনোদ—সেই ছেলেটি একখানা খাতায় কুলিদের উঠা-নামার হিসাব করিতেছিল। ওই ওর কাজ। লেবার-রেজিস্ট্রার পদবী। বিনুর পাশে বসিয়াছিল শ্যামাপদ—দু-নম্বর ওভারম্যান। সে বলিয়া উঠিল—এই মাগী, ঝুড়িটো কি পোড়ায়ে দিবি না কি?

এদিকে পিটমাউথে ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল—ঘং-ঘং-ঘং। খাদের তল হইতে সঙ্কেত হইতেছে, লোক উঠিবে।

উপরের 'টালোয়ান' ঘণ্টার সঙ্কেতে উত্তর দিয়া হাঁকিল—হো—ই। এ সঙ্কেত ইঞ্জিন-ড্রাইভারকে।

বিপুল শব্দে ইঞ্জিন গতিশীল হইয়া উঠিল। ইঞ্জিনের গতির সঙ্গে গীয়ারহেডের চাকা বাহিয়া মোটা তারের দড়ায় ঝুলানো একটা লোহার খাঁচা সন্ সন্ শব্দে অন্ধকূপের গর্ভে নামিয়া গেল—সঙ্গে সঙ্গে পাশের আর একটা দড়া উপরে উঠিয়া আসিতেছিল। সেই দড়া বাহিয়া একটা কেজ পিটের মুখে সশব্দে আসিয়া লাগিল।

খাঁচার মধ্যে চারজন লোক।

বিনু প্রশ্ন করিল—কারা বটিস রে?

উত্তর হইল—আমরা গো—ভক্তার দল। নারায়ণ ভক্তা।

খাঁচার মধ্য হইতে বাহির হইয়া আসিল—জলসিক্ত কয়লার কালিতে সর্বাঙ্গ-ঢাকা বীভৎস কালো মূর্তি। জ্বলন্ত কয়লার আলোয় মনে হয় যেন প্রেত! নগ্নপ্রায়—পরনে শুধু একটা কৌপীন. কাঁধে গাঁইতি, হাতে একটা কেরোসিনের ডিবিয়া। মেয়েদের হাতে ঝুড়ি। কয়লার কালিতে কালো দেহের মধ্যে সাদা দুইটা চোখ দেখিয়া ভয় হয়। কথা কহিলে দেখা যায় সাদা দাঁত। শেডের বাহিরে গিয়া তাহারা উপরের দিকে মুখ তুলিয়া দাঁড়ায়। অতুল ভাবিতেছিল ম্যানেজারশিপ পরীক্ষায় সে প্রথম হইবে। তাহাতে তাহার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। খনি-বিজ্ঞান তাহার সম্পূর্ণ আয়ত্ত হইয়াছে। এই যে আগুন—পৃথিবীর বুকের ভিতর লক্ষ লক্ষ টন কয়লার স্তরের মধ্যে যে বিরাট অগ্নিদাহ—যে আগুন জলে নিভিবে না—সে আগুন নিভাইবার উপায় সে আবিষ্কার করিয়াছে। কিন্তু কেন সে নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া পরের উপকার করিতে যাইবে! তাহার জীবনের মূল্য পঞ্চাশ টাকা নয়।

ঘং—ঘং—!

আবার সঙ্কেত হইল। একটা কেজ নামিয়া গেল, একটা উঠিয়া আসিয়া

পিটের মুখে দাঁড়াইল—ঘটাং! কেজটার মধ্যে কয়লা বোঝাই টব-গাড়ী—লেবার-রেজিস্ট্রার প্রশ্ন করিল, কি বটে কয়লা না স্লাক?

ওভারম্যান একজন কুলিকে বলিতেছিল—ওরে ইয়া—কি নাম তোর? গুরুচরণা—শুন্‌ শুন্‌ ইধারে শুন্‌। হোই—হুঁসিয়ার!

ছোট লাইনের উপর কয়লাভর্তি টবগাড়ীটা ঠেলিয়া দিয়া টালোয়ান হাঁকিয়া উঠিল। সশব্দে গাড়ীটা লাইন বহিয়া চলিয়া গেল।

ওদিকে পিটের মুখে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বাজিতেছিল। কেজ ওঠে-নামে। গুরুচরণ বলিতেছিল—আমাকে খাদে নামতে বলছেন না-কি?

ওভারম্যান বিরক্তিভরে বলিল—না—বলছি গুরুপুত্তুর আমার হেঁথাকে বসেন দয়া ক'রে—আমি পা পূজো করব।

লেবার-রেজিস্ট্রার বিনু খাতা লিখিতে লিখিতে গুন্‌ গুন্‌ করিয়া গান করিতেছিল—'ওহে সুন্দর তুমি এসেছিলে আজি প্রাতে।'

অতুল মনে মনে একটু হাসিল। সত্যই বেশ আছে ছেলেটি, বাড়ীতে মায়ের ছেঁড়া কাপড়ে হয়ত চোখের জল মুছিবার স্থান নাই—আর ও পোশাক পরিয়া রাণী সাজে। দুই টাকা মাইনে ওর কাটা যায়—আর ও বাড়ীর ভিতর গান শুনাইয়া কৃতার্থ হইয়া যায়। কয়লার হিসাব লিখিতে ও গায় 'সুন্দর তুমি!'... ..

নীচে খাদের তলদেশ হইতে অন্ধকূপ বাহিয়া অতি ক্ষীণ মানুষের সাড়া ভাসিয়া আসিল।

ওভারম্যান বলিল—হাঁকা-হাঁকা-হাঁকা!

পিটের মুখে টালোয়ান দুইজন একটু ঝুঁকিয়া সাড়া দিল—ও—ই!

অতুল একটু অন্যমনস্ক হইয়া চারিপাশের অন্ধকারের দিকে চাহিল। চারিদিকের কলিয়ারীতে কয়লার চাপ গভীর অন্ধকারে রাত্রির অঙ্গে দূষিত ক্ষতের মত ধ্বক্‌ ধ্বক্‌ করিয়া জ্বলিতেছে।

ঘং—ঘং—ঘং।

এবার উঠিয়া আসিল আর কয়েকজন কুলি। বিলাসপুর অঞ্চলের অধিবাসী। মেয়েদের অঙ্গে মোটা মোটা রূপদস্তার গহনা—হাতে তাগা, গলায় হাঁসুলি, পায়ে বাঁক, নাকে বেসর, কব্জীতে একহাত কাঁসার চুড়ি।

আবার খানিকটা বিরাম। ইঞ্জিন স্তব্ধ, 'কেজ'টা নিথরভাবে ঝুলিতেছে। শুধু বয়লারটা স্টীমের শক্তিতে কাঁপে—সে কম্পনের আঘাত বায়ুস্তর বহিয়া

শেডের খাপরার চালে আসিয়া চালের মধ্যেও কম্পন তোলে। চালের খাপ্‌রা-গুলা কাঁপে—ছোট একটা জানালা—সেটাও ভূমিকম্প-বিক্ষুব্ধের মত থরথর করিয়া কাঁপে। অবসর পাইয়া কেজম্যান, 'টালোয়ান' কড়ি গুণিয়া 'রেজিং'-এর হিসাব করে।

যেখানে লোহার ঠেঙোটায় কয়লার চাপ জ্বলিতেছিল সেখানে কুলিরা দুই-চারিজন করিয়া আসিয়া জমিতেছিল। ইহারা এইবার খাদের নীচে নামিবে। একটা কেরোসিনের ডিবের আলোতে একটা তরুণী বিড়ি ধরাইয়া দপ করিয়া আলোটা নিভাইয়া দিল। সে বলিল—দে, নামাই দে বাবু। ক-ত ব'সে রইব?

অতুল চিন্তা করে, এ ওদের নেশা না, ক্ষুধার প্রেরণা?

বিনু বলিল—এখন খাদে গিয়ে ত ঘুমুবি। তার পব সেই রাতে কাজে লাগবি। ঘরে ঘুমুলেই ত পারিস।

তরুণীটি হাসিয়া বলিল—তবে তু একটি গান কর বাবু।

ওভারম্যান বলিল—তু নাচবি বল।

সে খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল—মালকাটা যে মারবে বাবু ধুমাধুম—গতর ভেঙে দিবে আমার। লইলে—

তার পর অকস্মাৎ এক বুড়ীকে ধরিয়া বলে—এই দেখ্‌ ই নাচবে। ইয়ার মালকাটা মরে গেইচে।

আশপাশের তরুণীর দল হাসিয়া ভাঙিয়া পড়িল। ওপাশে জ্বলন্ত কয়লার ধারে বসিয়া একটা আঠারো-উনিশ বৎসরের ছেলে অকারণে জ্বলন্ত চুল্লীটায় ঢেলা মারিতেছিল। দূরে এই কুঠিরই সাইডিং লাইনের উপর লোকোমোটিভের বাঁশী তীক্ষ্ণস্বরে বাজিয়া ওঠে। অতুল পিছন ফিরিয়া চাহিল। দক্ষিণে বহুদূরে রেলওয়ে জংসনের ইয়ার্ডে অগণিত বিজলী বাতি সারি সারি স্থির খদ্যোতের মত জ্বলিতেছে। এ-পাশে বয়লারের চোঙ হইতে ঊর্ধ্বমুখী আগুনের শিখা সাঁপের জিভের মত লক্‌-লক্‌ করিতেছে। শিখার মাথায় অন্ধকারের চেয়েও গাঢ়-কৃষ্ণ রাশি রাশি ধোঁয়া ফুলিয়া ফুলিয়া ভাসিয়া চলিয়াছে। মধ্যে মধ্যে শিখার মাথায় হাজারে হাজারে আগুনের ফুল্‌কি ফুলঝুরির মত ধোঁয়ার রাশি ভেদ করিয়া ঊর্ধ্বে উঠিতেছে, বুদ্বুদের মত নিভিয়া যাইতেছে।

এদিকে তিন মিনিট চার মিনিট অন্তর কেজ ওঠে, নামে। একদিকে দলে দলে কুলি ওঠে, অন্যদিকে দলে দলে নামে। মানুষের দুর্দান্তপনায় বোবা রাত্রি অস্থির হইয়া ওঠে।

বিনোদ চমকিয়া উঠিল—কে তাহাকে ছোট একটা ঢেলা ছুড়িয়া মারিয়াছে। লোহার 'কেজ'টা সন্ সন্ শব্দে নীচে নামিয়া গেল। কূপের মধ্যে খিল্ খিল্ হাসি অতি ক্ষীণতর হইয়া মিলাইয়া গেল।

রাত্রি প্রগাঢ় হইয়া আসিয়াছে।

খাদের মুখে সবারই চোখে ঘুম জড়াইয়া আসে। যন্ত্রগুলারও যেন ঘুম পাইয়াছে। কেজ—ইঞ্জিন স্তব্ধ—শুধু বয়লারের স্টীমের শব্দ ফ্যাঁস—ফ্যাঁ—স। কেজ্ম্যানটাও বেদীর উপর বসিয়া ঢুলিতেছিল। ওভারম্যান দেওয়ালে ঠেস দিয়া গাঢ় নিদ্রামগ্ন—নিশ্বাস সশব্দ হইয়া উঠিয়াছে। বিনোদ টেবিলের উপর মাথা রাখিয়া তন্দ্রামগ্ন।

অতুলের মাথাও ঝিম্ ঝিম্ করিতেছিল। হেন্‌রী ফোর্ড কি এডিসনের নাম এখন মনের মধ্যে নাই। মনে পড়ে বাড়ীর কথা—মা'কে মনে পড়ে। ইচ্ছা হয়, ছুটি লইয়া একবার বাড়ী যাইতে হইবে। অতুল একটা বিড়ি ধরাইল। ধোঁয়াটা ছাড়িতে ছাড়িতে বিনোদের মুখের দিকে চাহিয়া মনে হইল ঠোঁটে যেন মৃদু হাসি ফুটিয়াছে। হয়ত স্বপ্ন দেখিতেছে।

মেসের কোলাহল নীরব। ক্যাশিয়ার হয়ত স্বপ্নের ঘোরে ক্যাশ মিলাইতেছে। ম্যানেজার হয়ত আগুনের স্বপ্ন দেখিতেছে। কালীপদ হয়ত পাঁচ হাজার টাকার প্রাইজটার খরচের বিলি ব্যবস্থা করিতেছে।

ঘং—ঘং—ঘং। সঙ্কেতের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল।

কলিয়ারীর চৌকীদার এক চোখ কাণা সেম্‌রা হাঁক দিয়া চলিয়াছে—হো—হো—ও—হো।

টালোয়ান বা কেজ্ম্যান সজাগ হইয়া পিটের মুখে গিয়া সঙ্কেত করিয়া ইঞ্জিন-ড্রাইভারকে হাঁকিল। ইঞ্জিন চলিতে আরম্ভ করিল।

ওভারম্যানের ঘুম ভাঙ্গিয়াছিল—সে তন্দ্রারক্ত চোখে বলিল—চাকরে আর কুকুরে সমান। চাকরি মানুষে করে?

বিনোদও কখন সোজা হইয়া বসিয়াছে—সে মেসের নিস্তব্ধতার দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—এরা বেশ ঘুমুচ্ছে, নয়?

কেহ কোন উত্তর দিবার পূর্বেই সশব্দে কেজটা আসিয়া পিটের মুখে আবদ্ধ হইয়া গেল। কেজ হইতে বাহির হইয়া আসিল পিটক্লার্ক বাবু।

সে বলিল—খাদের অবস্থা বড় খাবাপ অতুলবাবু। বড় গরম হয়ে উঠেছে খাদ।

অতুল বলিল—সে আর আমি কি করব?

—খাদে মালকাটারা টিকতে পারছে না।

অতুল নির্বিকারভাবে বলিল—ম্যানেজার বাবুকে খবর দিচ্ছি।

—ওদিকে ক'টা সুদে ত ধোঁয়ায় ভর্তি—আর উত্তাপ কি! ভেতরে কয়লাতে আগুন লেগেছে মনে হ'ল।

অতুল বলিল—সেগুলো বাদ দিতে বলেছি।

—হ্যাঁ, সেগুলো বাদই আছে। কিন্তু ক্রমশঃ এগিয়ে আসছে মনে হচ্ছে যে! একবার নীচে যেতে হবে মশায়। এ সব ত আমার ডিউটি নয়!

অতুল হাসিয়া বলিল—বেশ আমি নীচে যাচ্ছি। আপনি আর ওভারম্যান বাবু বরং ম্যানেজারকে সব জানিয়ে আসুন। টালোয়ান, ঘণ্টা দাও নীচে।

গ্যাস বাতিটা জ্বালিয়া লইয়া সে কেজের মধ্যে গিয়া দাঁড়াইল।

উপরের শব্দ পিছনে ফেলিয়া অতল গহ্বরের মধ্যে কেজ্‌টা সন্‌ সন্‌ শব্দে নীচে নামিয়া চলিয়াছিল। পিটের গাঁথনি দ্রুতবেগে চলিয়াছে। মাথার মধ্যে কেমন একটা অনুভূতি রন্‌ রন্‌ করিয়া উঠিল। প্রথমদিনের কথা মনে করিয়া অতুল একটু হাসিল। এখন এ অনুভূতি তাহার অভ্যাস হইয়া গেছে। প্রথম তলার খাদটা পার হইয়া গেল। যে কেজটা উপরে উঠিতেছিল সেটা পার হইয়া গেল। কোন্‌ সাঁওতালের মেয়ে ওই কেজে বসিয়াই গান গাহিতে গাহিতে উপরে উঠিয়া গেল। সে সুর ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে—ইঞ্জিনের শব্দও আর শোনা যায় না। দুই পাশে পিটের গা বহিয়া জল ঝরিতেছে। নীচের জল-ঝরার শব্দ ক্রমশঃ স্ফুটতর হইয়া আসিল।

কেজের গতি মন্দ হইয়া আসিয়া সশব্দে কেজটা এইবার থামিয়া গেল।

উপরে পিটের মুখে ও-কেজ্‌টাও সঙ্গে সঙ্গে থামিল। বিনোদ স্তব্ধ ভাবে বসিয়াছিল—সে বলিল—উঠে এলি যে তুই?

কেজ হইতে বাহির হইয়া আসিল সেই মেয়েটি। মেয়েটির নাম চুড়কী। চুড়কী বলিল—যে ধুঁয়ো আর গরম খাদে—পাঁলায়ে এলম। তারপর ফিক্‌ করিয়া হাসিয়া বলিল—তুর গান শুন্‌তে এলম।

বিনোদ বিরক্তিভরে বলিয়া উঠিল—ভাগ্‌ এখান থেকে। শেডের কয়লার ধুলার উপরেই আঁচল বিছাইয়া চুড়কী শুইয়া পড়িল। বলিল—তুর ভারি গুমোর হইছে, লয় গো বাবু!

বিনোদ কোন উত্তর দিল না।

চুড়কী আপন মনেই বলিল—তুর চেয়ে আমি ভাল গান জানি। শুনবি। সম্মতির অপেক্ষা না রাখিয়া সে নিজের ভাষায় গান আরম্ভ করিয়া দিল। গান করিয়া সে নীরব হইল। কিছুক্ষণ পর আবার সে বলিল—আকাশে হুই যি তারাটি দিপ্‌ দিপ্‌ করছে—ওইটি ভুক্কো তারা লয় গো বাবু?

বিনোদ তবুও কোন উত্তর দিল না। চুড়কী এবার উঠিয়া আসিয়া তাহার কাছে বসিল, বলিল—একটি গান তু কেনে বলবি না বাবু? সোবাই তুর গান শুনে-ছে। আমাকে আমার মাঝি শুনতে দেয় না। বলে কি জানিস—বলে—তু বাবুকে ভালো-বেসে ফেলবি।

বিনোদের ক্রমে যেন নেশা ধরিয়া আসিতেছিল। তাহার নবজাগ্রত যৌবন অহঙ্কৃত হইয়া উঠিল। সে হাসিয়া বলিল—গান ত আমি তোকে শোনাব—তুই কি দিবি আমাকে?

চুড়কী যেন চিন্তিত হইয়া পড়িল। তারপর বলিল—একটি ক'রে রাঙা জবাফুল তুকে আমি রোজ দিব।

বিনোদ বলিল,- ধেৎ, জবাফুল নিয়ে কি করব আমি?

—কেনে কানে পরবি -লয়ত চুলে গুঁজবি। তু আমাকে রোজ গান বলবি, হোক্‌।

প্রকাণ্ড একটা টানেলের মধ্য দিয়া অতুল চলিয়াছিল। দু'পাশে কয়লার নিবিড় কঠিন স্তর। গ্যাসের আলোকের প্রতিচ্ছটায় কয়লার তীক্ষ্ণ সূক্ষ্ম কোণগুলি ছুরির মত চকচক করিয়া উঠিতেছে। হাতের আলোটা তুলিয়া অতুল তাহাতে একটা বিড়ি ধরাইতে গেল। কিন্তু নিশ্বাসের ফুৎকারে আলোটা নিভিয়া গেল। অন্ধকার! কোথাও কোন সাড়া নাই, শব্দ নাই। ধোঁয়ার উত্তাপে শ্বাস-প্রশ্বাস লইতে কষ্ট বোধ হইতেছে। অদ্ভুত—বিচিত্র! পকেট হইতে দেশলাই বাহির করিয়া অতুল আবার আলোটা জ্বালিয়া ফেলিল। টানেলটা একটু বাঁকিয়া গিয়াছে। বাঁকটা ফিরিয়া দূরে ধোঁয়ার মধ্যে জ্বলন্ত অঙ্গারের মত শিখাহীন কয়টা দীপ্তি দেখা গেল। মানুষের কথার আওয়াজ পাওয়া যাইতেছিল—কে আবার বাঁশীও বাজাইতেছে। টানেলের পাশে পাশে কুলিরা দিব্য শয্যা বিছাইয়া দিয়াছে। দু'টি ছেলে আপন মনে বাঁশী বাজাইতেছিল। কতকগুলি মেয়ে গান করিতেছে। অতুল পশ্চিমের গ্যালারীর দিকে মোড় ফিরিল। এইদিকেই আগুন। উত্তাপ—ধোঁয়া ক্রমশঃ বাড়িয়া

উঠিতেছে। অতুল দাঁড়াইল। তাহার জীবনের অনেক দাম। সে ফিরিয়া আসিয়া বলিল—তোরা সব পিটের মুখের কাছে গিয়ে ব'স, ম্যানেজার এলে কাজে লাগবি।

অবস্থা দেখিয়া মালিক মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। ম্যানেজার ভাবিয়া আকুল হইয়া উঠিলেন। অতুল বলিল—আমি পারি। অবশ্য যে-জায়গায় আগুন লেগেছে সেখানটা চিরদিনের মত বাদ যাবে। কিন্তু বাকী খাদ নিরাপদ হবে।

মালিক তাহার হাত ধরিয়া বলিলেন—তাই করুন যত খরচ হয়, কোন ভাবনা নাই।

অতুল দ্বিধাহীন পরিষ্কারভাবে বলিল—কিন্তু কি স্বার্থে আমার জীবন বিপন্ন ক'রে আপনার উপকার করব? আমার পারিশ্রমিক কি দেবেন বলুন।

মালিক অবাক হইয়া গেলেন। তাঁহার মনে পড়িল, কয় বৎসর পূর্বের ছিন্নবাস উপবাসক্লিষ্ট একটি ছেলের কথা। সেদিন তিনি দয়াপরবশ হইয়া তাহাকে একটি চাকরি দিয়াছিলেন। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া তিনি বলিলেন—এ-কথাটা আপনার কাছ থেকে প্রত্যাশা করিনি অতুলবাবু।

অতুল হাসিয়া বলিল—বোধ হয় আপনি আমাকে আশ্রয় দিয়ে চাকরি দিয়েছিলেন সেই কথা ভাবছেন। কিন্তু এই যে এতদিন আপনার এখানে রয়েছি, বিনা পরিশ্রমে কোন দিন ত আপনার কাছে বেতন আমি নিই নি। আমি পরিশ্রম করেছি তার পারিশ্রমিক আপনি দিয়েছেন। খাঁটি বিনিময়—দান নয়। আজ পর্যন্ত আমি আমার কর্তব্যে এক বিন্দু অবহেলা করিনি।

মালিক বলিলেন—কি চান আপনি?

অতুল বলিল—একজন বড় মাইনিং ইঞ্জিনিয়ার যা নিত তাই নেব আমি। অবশ্য আমার মাইনে পঞ্চাশ টাকা বাদ দেবেন তা থেকে।

মালিক রাজী হইলেন। বলিলেন—তাই পাবেন।

অতুল বলিল—কণ্ট্রাক্ট ঠিক বিধান মতে হওয়া দরকার। কাগজেকলমে একখানা চিঠি দিতে হবে আমাকে।

তাও হইয়া গেল। অতুল বলিল—ফায়ার ব্রিক্স্ আর ফায়ার-ক্লে দরকার। যে গ্যালারীগুলোতে আগুন হয়েছে ওগুলো বন্ধ ক'রে দিতে চাই আমি।

মালিক প্রশ্ন করিলেন—তাতে কি হবে?

অতুল হাসিয়া বলিল—তাতেই আগুন নিভবে, স্যর। নইলে জলে খাদ

ভর্তি ক'রেও নিববে না। যেদিন জল মেরে কাজ আরম্ভ করবেন সেইদিনই আবার গ্যাস হতে শুরু করবে।

ইঞ্জিনটা আজ নিস্তব্ধ—খাদ বন্ধ। শুধু স্টীমের শব্দের সঙ্গে পাম্পিং-এর শব্দ উঠিতেছিল অলসভাবে।

লরীর শব্দে কলিয়ারীটা মুখরিত হইয়া উঠিল। লরীতে জিনিসপত্র আসিতেছিল। বিপুল উদ্যমে দ্রুতবেগে উদ্যোগ আয়োজন শেষ হইয়া গেল। কিন্তু কাজ আরম্ভ করিয়া গোল বাধিল। কুলিরা কেহ নামিতে চায় না। কুলি-রিক্রুটার কুলিদের বড় প্রিয়। সে দুয়ারে দুয়ারে ফিরিয়া আসিয়া বলিল—আজ্ঞে কেউ নামতে চাইছে না। বলছে, বিনা দম লিয়ে আমরা মরে যাব বাবু। উ আমরা লারব। কতকগুলো কুলি কাল রাত্রে ভয়ে পালিয়ে গিয়েছে।

হাফপ্যাণ্টের পকেটে হাত দুইটা পুরিয়া দিয়া অতুল বলিল—দু-টাকা ক'রে হাজরী দেব—চার ঘণ্টা কাজ। ফের আপনি গিয়ে বলুন।

রিক্রুটার চলিয়া গেল। অতুল নিজেই ফায়ার-ব্রিক্‌স্ বোঝাই একটা টবগাড়ী পিট দিয়া ঠেলিতে ঠেলিতে বলিল—ইডিয়ট কোথাকার? টাকায় দুনিয়া কেনা যায়—মানুষ কি দুনিয়ার বাইরে?

তারপর নিজেই ঘণ্টার সঙ্কেত করিয়া হাঁকিল—হো—ই! ইঞ্জিন চলিতে লাগিল।

মেসের ঘরে ঘরে বাবুদের ব্যস্ততার সীমা নাই। কার কখন ডাক পড়িবে কে জানে। কালীপদ লটারীর টিকিটের নম্বরটা ভুলিয়া গিয়াছে। সার্ভেয়ার বাবু প্ল্যান খুলিয়া বসিয়া আছেন। কতদূর গ্যাস আগাইয়া আসিল, দাগের পর দাগ টানিতেছেন। বিনুর হারমোনিয়মটা বন্ধ। কেরাণী সীতাপতির ছবির খাতা বাক্সে বন্ধ হইয়া আছে—রঙের বাটিগুলা শুকাইয়া গেছে। স্টোর-বাবু জিনিস জমা করিয়া আয় খরচ লিখিয়া হাঁপাইয়া উঠিয়াছে। বিনোদ খাদে নামিবার পোশাক পরিতেছিল। ঘরের উত্তর দিকে খোলা মাঠ। উত্তর দিকের জানালা হইতে কে বলিল—একটি গান কর্ কেনে বাবু।

বিনোদ ফিরিয়া দেখিল চুড়কী। শুধু চুড়কী নয় আরও দুই-তিনটি মেয়ে। বিনোদ বিরক্ত হইয়া উঠিল। এই কুশ্রী কালো বর্বর মেয়েগুলোর

অত্যাচারে তাহার গ্লানির আর পরিসীমা নাই। নানা জনে নানা কথা বলে। নিজেরও ঘৃণা বোধ হয়। সে কহিল—যা যা বিরক্ত করিস না।

আর একটি মেয়ে বলিল—রাগ কর্‌ছিস্‌ কেনে বাবু? একটি গান শুনায়ে দে আমরা চলে যাই।

একজন বলিল—চুড়কী তুর লেগে জবাফুল এনেছে। দে গে—চুড়কী বাবুকে ফুলটি দে।

চুড়কী জবাফুলটি ছুড়িয়া বিনোদের বিছানায় ফেলিয়া দিয়া বলিল—লে বাবু কানে উটি পর। বড়া ভাল লাগবে তুকে।

বিনোদের ইচ্ছা করিল ফুলটাকে ছিঁড়িয়া ছুড়িয়া ফেলিয়া দেয়। কিন্তু তাও সে পারিল না। এইটা তাহার একটা অক্ষমতা—সে তাহা জানে। রূঢ়-ভাবে কাহাকেও আঘাত করিতে সে পারে না! বিব্রত হইয়া বিনোদ অনুরোধ করিয়া বলিল—পালা বাপু তোরা এখন। জ্বালাস নে আমায়. খাদে যাব দেখ্‌ছিস্‌ না।

আশ্চর্যান্বিত হইয়া চুড়কী বলিল—খাদ ত পুড়ে গেইছে তুদের।

—তোদের মাথা হয়েছে। তোরা কাজ করবি না—আর তোদের কাজ আমাদিগে করতে হচ্ছে।

চুড়কী বলিল—সত্যি বলছিস্‌ তু? খাদে গেলে মরে যাবি না?

আপন মনেই হাসিয়া বিনোদ বলিল—আচ্ছা বোকা জাত বটে বাপু।—মরে কেন যাব? এই ত আমি চল্‌লাম। তোদিকে দু-টাকা তিন টাকা ক'রে হাজরী দেবে। আসবি তোরা?

একটি মেয়ে বলিল—হাঁ—বাবু সত্যি—তিন টাকা ক'রে দিবি তুরা? আর মরে যাব নাই?

—না—না—না। কতবার বলব তোদের বল!

চুড়কী বলিল—তু থাকবি ত বাবু খাদে? না—আমাদিগে ফেলে দিয়ে পালিয়ে আসবি?

—ভ্যালা বিপদ বাবা। ওরে পালিয়ে আসবার যো কি? চাকরি যাবে যে।

নিজেদের ভাষায় কি সব বলাবলি করিয়া চুড়কী বলিল—মালকাটাদিগে বলি গা বাবু। তুকে কিন্তুক গান শুনাতে হবেক্‌।

তারপর সঙ্গীদের পানে চাহিয়া বলিল—দেলা বোঁ! অর্থাৎ—চল চল।

বর্বর কালো মেয়েগুলি নাচিতে নাচিতে, ছুটিতে ছুটিতে চলিয়া গেল।

কিছুক্ষণ পর কয়জন মাঝি আসিয়া প্রশ্ন করিল—সত্যি তুরা তিন্ টাকা ক'রে দিবি!

অতুল বলিল—তাই পাবি।

—হাঁ বাবু—তুরা আমাদের সাথে রইবি ত?

হাসিয়া অতুল বলিল—তোদের পাশে আমি দাঁড়িয়ে থাকব। তা-ছাড়া রাজমিস্ত্রী থাকবে, অন্য বাবুরা থাকবে। তোরা একা থাকবি না।

বেশ্ বাবু তবে আমরা নামব। মাঝিন্‌দের নামতে দিবি ত?

অতুল জানিত এই মাঝিন্‌দের ফেলিয়া ইহারা কোথাও যায় না। রাজ-সিংহাসন পাইলেও না। সে হাসিয়া বলিল— বেশ তারাও নামবে।

ম্যানেজার ক্ষীণ ভাবে প্রতিবাদ করিলেন—সে যে বে-আইনী হবে অতুলবাবু।

কেজ ব্রেকটা খুলিতে খুলিতে অতুল বলিল– নেসেসিটি হ্যাজ নো ল'। আইন মানতে গেলে খাদ পুড়তে দিতে হবে।

তারপর হাঁকিল—হো—ই—ই'টার গাড়ী লাও।

অন্ধকার খাদের তলে মানুষের কর্মকোলাহলের আর বিরাম ছিল না। উপরেও তাই। খাদের মুখে খাজাঞ্চী বাক্স লইয়া বসিয়া আছে। সঙ্গে সঙ্গে কুলিদের বেতন মিটিয়া যাইতেছে। শেডের মধ্যে বসিয়া বৃদ্ধ ডাক্তার। গীয়ার-হেডের চাকা দুইটা অবিরাম ঘুরিতেছে। ঘং—ঘং—ঘং।

নীচে হইতে সঙ্কেত আসিতেছে লোক উঠিবে।

টালোয়ান ইঞ্জিন-ড্রাইভারকে সঙ্কেত করিল, হো—ই। মিনিট দুই পরেই বিপুল শব্দ করিয়া কেজটা উপরে আসিয়া লাগিল। একজন বাবু একটি কুলি ও একজন কামিনকে লইয়া নামিল। মেয়েটির বুকে ব্যথা ধরিয়া শ্বাস লইতে কষ্ট হইতেছে। অক্সিজেন-সিলিণ্ডারের চাবি আল্‌গা করিয়া দিয়া টিউবটা মেয়েটির নাকের কাছে ডাক্তার ধরিয়া বলিল—ভয় নাই।

নীচে হইতে আবার সঙ্কেত আসিল—ঘং—ঘং—ঘং।

আবার লোক উঠিয়া আসিয়া বলিল. মাটি—মাটির গাড়ী জল্‌দি চালাও।

মাটির গাড়ী লইয়া কেজ নামিল।

খাজাঞ্চী হিসাব করিতেছিল—তিন দু-গুণে ছয়—এই লে মাঝি, ছ-টাকা হাজরী তোদের।

খাদের নীচে লাইন ধরিয়া মাটি-বোঝাই টব গাড়ীটা চলিতেছিল ধীরে ধীরে; একজন আসিয়া ঠেলিয়া সেটার গতি দ্রুত করিবার চেষ্টা করিল। আরও ভিতরে, যেখানটায় আগুন লাগিয়াছে সেখানে গ্যালারীর মুখে মুখে গাঁথনি উঠিতেছিল। বিশ-পঁচিশ মিনিট অন্তর লোকে স্থান পরিবর্তন করিতেছে। গ্যাসে শ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল, বিবর্ণ পাংশু মানুষগুলি টলিতে টলিতে অক্সিজেন-সিলিণ্ডারের ফনেলের মুখে আসিয়া দাঁড়াইতেছিল। অতুলের পিঠে ডুবুরীদের মত ছোট একটা অক্সিজেন-সিলিণ্ডার বাঁধা, তাহার দুইটা নল নাকের কাছে শ্বাস-প্রশ্বাসে সাহায্য করিতেছে। সে অনবরত ঘুরিয়া ঘুরিয়া গ্যালারীর মুখে মুখে ফিরিতেছিল।

সে বলিল—জল্‌দি—জল্‌দি—আর মাত্র তিনটে গ্যালারী। চালাও ভাই, চালাও। দেরি হ'লে সব নষ্ট হবে। গ্যাস-সব ঐ গ্যালারী দিয়ে বেরুতে আরম্ভ করবে।

বিনোদ একটা গ্যালারীর মুখে দাঁড়াইয়াছিল। চুড়কী বহিতেছিল কাদা, তাহার মাঝি ইঁট যোগান দিতেছিল। কাদার পাত্র ফেলিয়া দিয়া চুড়কী বলিল—লারব আর আমি। সে হাঁপাইতেছিল। বিনোদ বলিল—যা-যা ঐখানে যা। বাতাস নিয়ে আয়।

—হঠ্‌ যাও—হঠ্‌ যাও। ইঁটাকে গাড়ী যাতা হ্যায়।

বিনোদ সরিয়া দাঁড়াইল, হড় হড় শব্দে গাড়ীখানা চলিয়া গেল।

—কাদা—কাদা—ফায়ার-ক্লে। অতুল হাঁকিতেছিল।

ওপাশ হইতে কে হাঁকিল, আদ্‌মী গির গিয়া হিঁয়া। জল্‌দি লে যাও।

অতুল দ্রুতবেগে বিনোদের পাশ দিয়া যাইতে যাইতে বলিতেছিল—আর দুটো—আর দুটো গ্যালারী!

ধোঁয়ার পরিমাণ যেন বৃদ্ধি পাইতেছে। বিনোদের কষ্ট হইতেছিল। সে একটু সরিয়া আসিয়া ২৫ নম্বর গ্যালারীর মুখে দাঁড়াইল। স্থানটি অপেক্ষাকৃত নির্জন। ওদিকে ২৮ নম্বরে কাজ চলিতেছে। ২৭ নম্বর বন্ধ হইলেই যুদ্ধের শেষ হয়। ধরণীগর্ভে আগুন শ্বাসরুদ্ধ হইয়া মরিয়া যাইবে। কে তাহার চোখ চাপিয়া ধরিল। বিনোদ এক ঝট্‌কায় তাহাকে ফেলিয়া দিয়া আপনাকে মুক্ত করিয়া লইল। ক্রোধের আর তাহার সীমা ছিল না। চুড়কী পড়িয়া গিয়াও খিল্‌ খিল্‌ করিয়া হাসিয়া উঠিল। জুতার ডগায় চুড়কীর মুখে একটা ঠোক্কর মারিয়া বিনোদ বলিল—লাথি মেরে তোর মুখ ভেঙে দেব আমি।

চুড়কী ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি বিনোদ সেখান হইতে পলাইয়া গেল। যাইতে যাইতে সে আবার ফিরিয়া চাহিল।

ধোঁয়ায় বাষ্পে ভাল করিয়া দেখা গেল না। কিন্তু অস্ফুট কান্নার শব্দ সে যেন তখনও শুনিতে পাইতেছিল। বিনোদ ফিরিল। ডাকিল—চুড়কী—এই চুড়কী—কাজে যা—উঠে যা।

—না—আমি যা-ব না। তু কেনে আমাকে লাঁথায় মেলি?

ওদিক হইতে হড় হড় শব্দে টব-গাড়ী আসিতেছিল, যে ঠেলিয়া আনিতেছিল—সে হাঁকিল—হো—হো—ই—হঠ্ যাও।

বিনোদের আর সাহস হইল না। সে পলাইয়া আসিল। সিলিণ্ডারের মুখে অক্সিজেন লইবার অছিলায় পিটের মুখে সে দাঁড়াইয়া রহিল। হুড় হুড় শব্দে টব-গাড়ীতে যন্ত্রপাতি ফিরিয়া আসিতেছে। কাজ বোধ হয় শেষ হইয়া আসিয়াছে। কয়জনে কাহাকে ধরাধরি করিয়া লইয়া আসিল।

—ঘণ্টি মারো টালোয়ান ঘণ্টি মারো জল্দি। পাঁচ আদ্মি গির্ গিয়া।

পিছনে পিছনে আবার একজন আসিল। বিনোদ প্রশ্ন করিল—কি—ব্যাপার কি হে?

—আর কি? গ্যাস একদিক দিয়ে জোর ধরেছে। পিছিয়ে আসতে হ'ল?

—ক' নম্বর পর্যন্ত পেছুতে হ'ল?

সন্ সন্ শব্দে কেজ্‌টা উঠিয়া গেল. উত্তর আর শোনা গেল না। বিনোদ দ্রুতপদে খাদের মধ্যে আগাইয়া গেল।

বন্ধ হইতেছিল পনেরো নম্বরের মুখ।

অতুল কাহাকে বলিতেছিল—উপায় নাই—বাবোটা গ্যালারী ছেড়ে দিতে হ'ল।

বিনোদ চীৎকার করিয়া উঠিল,– গাঁথনি ভাঙো। ভেতরে লোক।

তাহার মুখটা চাপিয়া ধরিয়া অতুল বলিল—গেট্ আউট।

বিনোদ সকরুণ দৃষ্টিতে চাহিয়া আর একবার বলিল—চুড়কী—

বাধা দিয়া অতুল বলিল—ওপরে যাও তুমি। তারপর ইংরেজীতে একটা চিরকুট লিখিয়া হাতে দিয়া বলিল—ক্যাশিয়ারকে দাও গে।

ক্যাশিয়ার কাগজখানা পড়িয়া কুড়িটি টাকা বিনোদের হাতে দিয়া বলিল,—তোমার মাইনে। এক ঘণ্টার মধ্যে কলিয়ারী ছেড়ে যাও। ছটু সিং!

—হুজুর! ছট্টু সিং সেখানে হাজিরই ছিল।

—এক ঘণ্টার মধ্যে বাবুকে কুঠীর সীমানা থেকে বের ক'রে দেবে।

নীচে তখন কাজ শেষ হইয়া আসিয়াছে। অতুল রুমালে কপাল মুছিতে মুছিতে আপন মনেই বলিল—হি লাভ্‌স হার।—প্রকাশ ক'রে ফেলবে। ফুল্‌! জানে না যে-সম্পদ বাঁচল তাতে ওই মেয়েটির মত হাজার স্ত্রী-পুরুষের জীবিকার সংস্থান হ'ল। প্যাকিং দাও—ফায়ারক্লের প্যাকিং দিয়ে দাও—যেন এক বিন্দু গ্যাস না আসে।

আগুন থামিয়া গেছে। আবার কলিয়ারী তেমনি চলে। কেজ ওঠে নামে। রাত্রিতে কুলি-কামিন ভিড় করিয়া আসে, বাবুরা নাম লেখে।

টালোয়ান হাঁকে—হো—ই।

ইঞ্জিন চলে—কেজটা নামিতে থাকে।

না রী

ডাক্তারখানার সামনে একখানা ট্যাক্সী এসে দাঁড়াল। শব্দ ক'রে ধোঁয়া ছেড়ে বন্ধ হয়ে গেল ইঞ্জিন।

ডাক্তার প্রেসক্রুপশন লিখতে লিখতে মুখ তুললেন। ওই ইঞ্জিন বন্ধ করার শব্দেই ডাক্তার বুঝলেন ডাক্তারখানাতেই কেউ এল মোটরে ক'রে। যুদ্ধের বাজারে পেট্রোল র‍্যাশন এবং মোটরের দুষ্প্রাপ্যতায় মোটর এসে থামলে ঔৎসুক্য একটু হয় বৈ কি! বিশেষজ্ঞ বড় বড় ডাক্তার যাঁরা—বত্রিশ-চৌষট্টি-একশো যাঁদের ফি—তাঁদের দরজার কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু মাঝারি খ্যাতিসম্পন্ন ডাক্তার, আট টাকা যাঁর বাড়ীতে ফিস্ এ বাজারে যাঁরা মোটরে চ'ড়ে আসেন, তাঁর দরজায় না এসে তাঁকে তো তাঁরা বাড়ীতেই ডাকতে পারেন। আরও একটু বিস্মিত হলেন ডাক্তার, একা একটি মেয়ে নামছে। ডাক্তার পর মুহূর্তেই আবার চোখ নামিয়ে প্রেসক্রুপশন লিখতে আরম্ভ করলেন। ডাক্তারের কাছে লোকের যাওয়া আসার ভঙ্গিটা বিচিত্র। এবং রোগ বিশেষতঃ রোগীর বিষয়ে ডাক্তারদের মন প্রায় নির্বাণের কোঠাবাড়ীর সিঁড়ির মাথায় এসে পেঁছেছে। বিস্ময়ও নাই, ঔৎসুক্যও নাই। রোগী আসে, ডাক্তার দেখেন—টেম্পারেচার, হার্ট, লাংস, জিভ, পেট; কয়েকটা প্রশ্ন করেন. প্রেসক্রুপশন লেখেন, কি খাবে বলে দেন। তার পর আর একজনকে বলেন, আপনার কি?

আড়ষ্ট মুখে বোল টেনে লোকটি বলে, অসহ্য বেদনা।

—বেদনা তো বটে। কোথায়?

লোকটি মুখ উঁচু ক'রে সামনের একটি মাত্র দাঁতের কাছে আঙুল নিয়ে গিয়ে বলে—ডাঁ-ট।

গোটা 'ত' বর্গটাই উচ্চারণ করতে গেলে দাঁতের সঙ্গে জিভের স্পর্শ প্রয়োজন। তাই জিভকে তালু পর্যন্ত এনে সন্তর্পণে দ কে ড এবং ত কে ট বলে কাজ সারেন। ডাক্তার বলেন, ডেণ্টিষ্টের কাছে যান। তার পর বলেন, নাড়ুন তো আঙুলে ক'রে দেখি।

আঙুল দিয়ে দাঁত নাড়তে নাড়তে ভদ্রলোক 'হুঁ-হুঁ' ক'রে ওঠেন।

ডাক্তার বলেন—প্রফুল্ল, দাঁত-তোলা যন্ত্রটা দাও তো?

শিউরে ওঠেন ভদ্রলোক—না-না।

—তবে এলেন কেন আমার কাছে?

—একটু কোকেন।

—দিচ্ছি। হাঁ করুন। আর একটু, হ্যাঁ—। এমন ক'রে হাত দেবেন না। হাত সরান। ব্যস্ হয়ে গেছে। জল দিয়ে কুল্লু করুন। দাঁতটা ফেলে দিন ধরুন। —এই তুমারা কেয়া? আঁ?

—পেটমে বহুত দরদ। পা'খানা যাচ্চে বাবু। জ্বরভি হইয়েছে—

—হুঁ। দেখি? উতারো, গায়ের কাপড়া উতারো। পেট টিপে দেখেন, হাত দেখেন।—পা'খানার সময় পেট কামড়ায়? আম আছে?

—হাঁ বাবু।

—রক্ত আছে?

—হাঁ বাবু। তাজা রক্ত নিকলাচ্ছে।

—কতবার পা'খানা গিয়েছ?

—দশ-বারো দফে। একটু ভেবে আবার বলে,—বেশী হোবে বাবু।

—হুঁ। ডাক্তার প্রেসক্রপশন লেখেন।—খুব সাবধানে থাকবে। খারাপ বেমার। ব্যাসিলারী ডিসেণ্ট্রী! শক্ত জিনিস কিছু মৎ খাও। ছানার জল, বার্লি, ডাবের জল এই খাবে। —আপনার?

ভদ্রলোক বলেন—সেই যে পরশু আমার মেয়েকে নিয়ে এসেছিলাম। কমলা।

—কোন্ মেয়েটি বলুন তো?

—আমার মেয়ে।

—হ্যাঁ। কোন্ মেয়েটি? বয়স কত? অসুখ কি?

—কমলা বলে মেয়েটি। পনের-ষোল বছর বয়স। বুকে বেদনা জ্বর।

—ওঃ। হুগলী থেকে অসুখ নিয়ে এসেছে?

—হ্যাঁ।

—কি খবর? কেমন আছে?

—কমেনি কিছু। জ্বরটা একটু বেশী হয়েছিল বরং।

—হুঁ! কই, এনেছেন?

—না। বলেন তো ওবেলা আনব।

—আনবেন। প্লুরিসি হয়েছে আপনার মেয়ের। ভাল চিকিৎসার দরকার। ক্যালসিয়াম ইনজেকশন দিতে হবে। না হ'লে ভবিষ্যতে খারাপ হতে পারে।

—খারাপ হ'তে পারে?

—হ্যাঁ। টি-বি-তে দাঁড়াতে পারে।

ভদ্রলোক স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন।

ডাক্তার আর একজনকে বলেন—আপনার?

—আমার বাড়ীতে একবার যেতে হবে।

—বারোটার পর। ঠিকানা রেখে যান কম্পাউণ্ডারের কাছে। —এই তোর কি রে? এ্যাঁ? তোর তো সেই সাতখানা রোগ। ওষুধ খাচ্ছিস্? কই দেখি, আয়।

এ পাড়ারই একজন দরিদ্র রুগ্ন ব্যক্তি।

—আর মদ খাচ্ছিস্?

—আজ্ঞে না।

ডাক্তার চোখের পাতা টেনে দেখলেন। লিভার টিপলেন—লাগে?

বেশ কাতর মুখভঙ্গি ক'রেও লোকটি বললে—আজ্ঞে, আগের চেয়ে কম।

—হুঁ! ওষুধ নিয়ে যা। মদ খেলে কিন্তু বাঁচবি না তুই।

প্রেসক্রিপশন লিখতে বসলেন ডাক্তার। ঠিক এই সময়ে ট্যাক্সীটা এসে দাঁড়াল। ডাক্তার একবার চোখ তুলে দেখলেন। একটি মেয়ে নামল—একা। বিস্ময়ে মুহূর্তের জন্য ডাক্তারের ললাটে প্রশ্নের ক'টি রেখা জেগে উঠল। তার পরই তিনি আবার প্রেসক্রিপশনে মন দিলেন।

মেয়েটি এসে পরিচিতের মত সপ্রতিভভাবে মেয়েদের জন্য নির্দিষ্ট কাঠের পার্টিসন দিয়ে ঘেরা ঘরটির মধ্যে ঢুকে বসল। অল্পবয়সী লম্বা গড়নের মেয়েটির আবির্ভাবে রোগীর দলও একটু উৎসুক, এমন কি খানিকটা প্রফুল্ল হয়ে উঠল যেন। কচি কলাপাতা রঙের শাড়ীর রঙের প্রতিচ্ছটার আভায় তাদের চোখে যেন প্রসন্নতা এনে দিলে খানিকটা।

ডাক্তার আর একজনকে জিজ্ঞাসা করলেন—আপনার?

সে বললে— ভদ্রমহিলাটিকে দেখে নিন আগে। ট্যাক্সীটা দাঁড়িয়ে রয়েছে।

ডাক্তার বললেন—সেই ভাল।

চেম্বারে ঢুকে ডাক্তার বললেন—আপনার কি?

মেয়েটি হাসলে। ডাক্তার বিস্মিত হলেন। মেয়েটির হাসির জন্যে নয়।

মুখখানা অত্যন্ত পরিচিত বলে মনে হচ্ছে। মেয়েটির সুন্দর মুখে দুই গালে ঠিক এক জায়গায় দুটি প্রায় সমান আকারের তিল। অত্যন্ত চেনা।

মেয়েটি বললে—রোগী দেখা শেষ করুন। আমার খানিকটা সময় লাগবে।

ডাক্তার সবিস্ময়ে মেয়েটির দিকে চেয়েই দাঁড়িয়ে ছিলেন।

মেয়েটি বললে—চিনতে পারছেন আমাকে?

—ঠিক মনে হচ্ছে না। আপনি—

—আমি আপনি নয়। আমি তুমি। যান রোগীদের বিদায় করুন।

ডাক্তার অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে বেরিয়ে এলেন। কে? কে? কে?

—আমার হাতটা দেখুন ডাক্তারবাবু।

চিন্তাটা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে ডাক্তার তার দিকে চাইলেন—কি তোমার? হাতখানা ধরলেন। —কে? উঁহু। তা কি হয়!

মেয়েটি হেসে বললে—চিনতে পারলেন না আমাকে?

—আপনি—তুমি কে বল তো?

—দেখেই চিনতে যখন পারলেন না, তখন নাম বললে মনে পড়বে?

—মনে হচ্ছে এক জনের কথা। কিন্তু সে কেমন ক'রে হবে? সে তো—

মেয়েটি উঠে ডাক্তারকে প্রণাম ক'রে বললে—বুঝতে পারছি আপনি চিনতে পেরেছেন। আমিই সেই।

—নির্মলা? তুমি—?

তাঁর কথা কেড়ে নিয়ে নির্মলা হেসে বললে—তুমি বাঁচলে কি ক'রে? সশব্দে সে হেসে উঠল; তার পর বলল—আমি বেঁচেছি, নিউমোথোরাক্স ক'রে বেঁচে উঠেছি। যাদবপুরে চৌদ্দ মাস বিছানায় পড়ে ছিলাম। উঠতে দেয়নি। বাঁচার সে এক যন্ত্রণা। সে আবার হেসে উঠল।

ডাক্তারের মুখ প্রসন্ন হাসিতে ভরে উঠল।—বাঃ। ভারী আনন্দ হ'ল তোমাকে দেখে। চমৎকার চেহারা হয়েছে তোমার। আর কোন কমপ্লেন নাই তোমার?

—আপনি দেখুন।

ডাক্তার সযত্নে পরীক্ষা ক'রে দেখলেন।—নাঃ কিছু না। তবু একটা এক্সরে ফটো নিয়ো।

আঁচলের ভিতর থেকে বড় একখানা খাম বার ক'রে মেয়েটি দিলে। —নিয়েছি দেখুন। মাথার ঘোমটা ঈষৎ বাড়িয়ে দিয়ে সে হাসতে লাগল।

ফটোখানা দেখতে দেখতে ডাক্তার বললেন—যাদবপুরেই বেড পেয়েছিলে তা হ'লে?

—হ্যাঁ পেয়েছিলাম। একটু হেসে সে আবার বললে, ফ্রি বেড নয়, পেয়িং বেড।

—পেয়িং বেড! ডাক্তার বিস্মিত না হয়ে পারলেন না।—সে তো—

আবার সে ডাক্তারের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললে—সে তো অনেক খরচ! আবার হাসলে মেয়েটি। আবার বললে—ট্যাক্সী ক'রে এসেছি দেখছেন না? আমার বেশভূষা—গয়না দেখে বুঝতে পারছেন না আমার সে-দিন আর নাই!

ডাক্তার একটু অপ্রতিভের মত বললেন—হ্যাঁ—হ্যাঁ। ভারী আনন্দ হ'ল, ভারী খুসী হয়েছি আমি। কিন্তু—ডাক্তার একটু থামলেন। তার পর আবার বললেন—রমেন তো এখন সেই ফ্যাক্টরীতে চাকরী করছে, তাকে দেখে তো মনে হয় না টাকাকড়ি করেছে যথেষ্ট।

মেয়েটি বললে—ডাক্তারবাবু, লোকে বলে—স্ত্রীলোকের চরিত্র আর পুরুষের ভাগ্য দেবতাতেও বুঝতে পারে না। আমি তো স্ত্রীলোকের চরিত্রে দুর্বোধ্য কিছু দেখি না। স্ত্রীলোকের ভাগ্য বুঝাই কঠিন। পুরুষেরা কাজ ক'রে তার ফল পায়, আমরা ভাগ্যফলেই পুরুষের হাতে পড়ি। বুঝা কঠিন পুরুষের চরিত্র।

ডাক্তার চুপ ক'রে রইলেন একটু। তার পর বললেন—ভারী খুসী হয়েছি তোমাকে দেখে। আচ্ছা, তা হ'লে আজ এসো। আমার আবার বাইরে কল রয়েছে কতকগুলো।

মেয়েটি বললে—বেশ লোক আপনি। আমার রোগের চিকিৎসার কথা কিছু হ'ল না, আর বলছেন তুমি এস!

—আবার কি রোগ তোমার?

মেয়েটি একখানা কাগজ বার ক'রে ডাক্তারের হাতে দিলে। একটি ক্লিনিকের রক্ত পরীক্ষার রিপোর্ট। রোগিণী নির্মলা দেবী। রক্তে উপদংশ বিষ রয়েছে। পরিমাণ—আট দশ।

নির্মলা বললে—আমি এখন—। একটু থামলে। তার পর মৃদু হেসে অকম্পিত স্বরে বললে—আমি এখন—। একটু থেমে বললে—এখন আমি বেশ্যা ডাক্তারবাবু।

অতর্কিতে অল্প-একটু ধাক্কা খাওয়ার মত একটা অনুভূতি অনুভব না ক'রে ডাক্তার পারলেন না। নির্মলা আপনার বাঁ হাতখানি প্রসারিত ক'রে নিজের চোখের সামনে ধরলে, ডান হাত দিয়ে এ হাতের কনুইয়ের ভিতর দিকে সুগৌর-সুডোল হাতের নীল শিরার উপর হাত বুলিয়ে বললে—ইনজেকশন নিয়ে নিয়ে শিরাগুলো সব বসে গেছে।

ডাক্তার ইনজেকশন দিয়ে থাকেন বাঁ হাতে। অবহেলা ক'রে বা অবলীলাক্রমে দিচ্ছেন এটা প্রমাণ করার জন্য নয়, ওটাই তাঁর অভ্যাস। তবে লোকে মনে করে তাই। ইনজেকশনে এমন নিপুণ হাত খুব কম দেখা যায়। প্রায় চোখের পলকে বললে অত্যুক্তি হয় সামান্যই। ডাক্তার সিরিঞ্জের নিড্‌ল বের ক'রে নিলেন। এক টুকরো বেনজুইন ভিজানো তুলা বসিয়ে দিলেন। হেসে বললেন—ব্যস। একটু ব'সে থাক।

ডাক্তার বেরিয়ে এলেন।

ভিতর থেকে নির্মলা ডাকলে—ডাক্তারবাবু!

—কি? অসুস্থ বোধ করছ?

—না।

—তবে? ডাক্তার ভিতরে এলেন।

—আপনার ফি। মেয়েটি দুখানি নোট তুলে দিলে।

একখানি নোট ফেরত দিয়ে ডাক্তার হেসে বললেন—এতেই হবে। এইবার উঠতে পার তুমি। গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে তোমার।

—থাক। মেয়েটি উঠে দাঁড়াল।—একটা কথা।

—বল।

—একটু ড্রিঙ্ক করতে পাব?

—ড্রিঙ্ক? ডাক্তার অবাক্ হয়ে চেয়ে রইলেন নির্মলার দিকে মুহূর্তের জন্য। পর মুহূর্তেই নিজেকে সংযত করলেন তিনি—বললেন—না।

—আমার হ্যাবিট হয়ে গেছে। তা' ছাড়া; সে হেসে বললে—পুরুষ-চরিত্র রহস্যময়- উনি আবার ড্রিঙ্ক না করলে খুসী হন না।

ডাক্তার একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন—না। ও এখন বন্ধ রাখতে হবে।

একটি নমস্কার ক'রে নির্মলা বেরিয়ে গেল।

ডাক্তার একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন নিজের অজ্ঞাতসারেই।

নির্মলা অসঙ্কোচে বললে—আমি—। আমি এখন—। অবলীলাক্রমে বললে—ড্রিঙ্ক করা আমার হ্যাবিট হয়ে গেছে। অসঙ্কোচে—অবলীলাক্রমে। পরক্ষণেই সব ঝেড়ে ফেলে তিনি বেরিয়ে পড়লেন। 'কল' আছে। টি-বি পেশেণ্ট প্রভাকে ক্যালসিয়াম দিতে হবে। ম্যালিগন্যাণ্ট ম্যালেরিয়ার পেশেণ্টটাকে কুইনিন। তিনটে টাইফয়েড কেস। একটা সিগারেট ধরিয়ে গাড়ীতে উঠলেন।

মানুষ বিচিত্র। ডাক্তার ভাবছিলেন সেই কথা সন্ধ্যার সময়।

সন্ধ্যাতেও ডাক্তারখানায় রোগী আসে, কিন্তু সংখ্যায় কম; দু'চার জন। ডাক্তার সন্ধ্যাতে কোট-পেণ্টালুন পরেন না। ধুতি-পাঞ্জাবী প'রে চেয়ারে বসে থাকেন; দু'একটা সিগারেট খান, কখনও সখ হ'লে গড়গড়ায় তামাকও খান। রোগীদের বিদায় ক'রে বই পড়েন। মনোবিজ্ঞানে ডাক্তারের বেশী ঝোঁক। সাইকোলজির বই বেশী পড়েন। চিকিৎসাতেও সাহায্য হয়। এক বন্ধুর স্ত্রী সম্প্রতি মধ্যে মধ্যে দুরন্ত বেদনা অনুভব করছেন বুকে বেদনা উঠলেই ডাক্তার তাকে এ্যাকোয়া অর্থাৎ শুধু জল ইনজেকশন দেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই ভদ্রমহিলা সুস্থ হয়ে উঠে বসেন। এক বিন্দু বেদনা থাকে না। ডাক্তারের ধারণা রোগে যারা ক্রমাগত ভোগে তাদের শতকরা ষাটজনেরও বেশী সংখ্যক লোকের ব্যাধিই মনের ব্যাধি। একটি অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে এইমাত্র বিদায় হ'ল; ছেলেটি প্রায় রোজ সন্ধ্যায় আসে, গল্প ক'রে চলে যায়। সপ্তাহে একবারও অন্ততঃ হৃদ্‌যন্ত্রটি পরীক্ষা করায়; ওর ধারণা ওর হার্টের দুর্বলতা আছে, যে কোন মুহূর্তে তা থেকে কঠিন বিপদ হতে পারে; সেইজন্য ভদ্রলোক বিবাহ পর্যন্ত করলেন না। এবং বুঝিয়েও ডাক্তার ওকে বিশ্বাস করাতে পারলেন না। ডাক্তারের কাছে গল্প করতে আসাটা ওর গল্পের আকর্ষণ নয়, আসল ব্যাপার হ'ল ডাক্তারের সান্নিধ্য লাভ ক'রে খানিকটা আশ্বাস লাভ করা। এতেই যেন তার ডাক্তার দেখান হয়ে যায়। লোকটি চ'লে যেতেই ডাক্তার হাতের বইখানা খুলে বসলেন। শক্তিশালী লেখকের লেখা ভাল বই। সামারসেট মমের ভক্ত তিনি, মমের বই রেজারস্‌ এজ্‌। কয়েক মুহূর্ত পরে মুখ তুলে রাস্তার দিকে অন্যমনস্ক ভাবে চেয়ে রইলেন। রাস্তায় লোকজন অবিরাম চলছে—জনস্রোত। এই দিকেই গঙ্গার ঘাটে যাওয়ার পথ। লোকে ইলিশ

মাছ হাতে নিয়ে আসছে ঘাট থেকে। পুণ্যলোভী মেয়েরা অনেকে এই রাত্রেও গঙ্গাস্নান ক'রে আসছে। বোধ হয় কোন পার্বণ আছে আজ। সেজে-গুজে অনেক মেয়ে গঙ্গার ধারে হাওয়া খেয়েও ফিরছে। দু'-চারটি চতুরা দেহ-ব্যবসায়িনীও সঞ্চরমান শিখার মত অনুসারী পতঙ্গ পিছনে নিয়ে আসছে, সামনেই একটা গলি; সেই গলিতে ঢুকে যাচ্ছে। ঢুকবার সময় এদের একটা বিশেষ ভঙ্গিতে পিছনে ফিরে চাওয়ার অভ্যাস আছে। যেন ঝাপটা মেরে চকিতে ফিরে পিছনের দিকে চেয়ে দেখে নেয়। বোধ হয় অনুসরণকারীকে দেখেও নেয় এবং অভয় দিয়ে আহ্বানও জানায়।

মনে প'ড়ে গেল নির্মলাকে। তার কথাগুলো কানের কাছে বেজে উঠল যেন। আমি এখন—আমি এখন বেশ্যা ডাক্তারবাবু।

সেই মেয়ে। সুদীর্ঘ আট মাস ধ'রে তিনি তার চিকিৎসা করেছিলেন, একদিন কথা মাত্র বলেছিল। একদিন মাত্র।

এক একটা কেস ডাক্তারদের অদ্ভুত ভাবে মনে থাকে।

বিচিত্র ধরণের রোগ, বিচিত্র ধরণের রোগী, বিচিত্র ধরণের রোগীর বাড়ী—এগুলো মনে রেখাপাত করাই স্বাভাবিক। এ ক্ষেত্রে তার কোনটাই এমন কিছু বিচিত্র ছিল না। শুধু রোগিণী ওই নির্মলা মেয়েটির মধ্যে ছিল শান্ত ভাবের এবং সহনশীলতার মাত্রাতিরিক্ততার--কি বলব?—বৈচিত্র্য, হ্যাঁ বৈচিত্র্য বলাই ভাল। ডাক্তার মধ্যে মধ্যে বিস্মিত হতেন, মনে মনে প্রশংসা করতেন।

বৎসর তিনেক হবে। যুদ্ধের প্রথম অবস্থা সেটা। ১৯৪১ সাল। মনে আছে ডাক্তারের. তিন বৎসর আগে সকালে এল একজন অল্পবয়সী ভদ্রলোক। সুদর্শন চেহারার একটি তরুণ, পঁচিশ-ছাব্বিশ বৎসরের বেশী বয়স হবে না। রোগীর ভিড় রয়েছে। সে টেবিলের ওপাশটা ধ'রে দাঁড়িয়ে বললে—ডাক্তারবাবু, আপনাকে একবার আমাদের বাড়ী আসতে হবে।

ডাক্তর তার মুখের দিকে তাকালেন—ভদ্রলোকের মুখে-চোখে উদ্বেগের আকুলতা দেখতে পেলেন।

ডাক্তার কিছু বলবার আগেই সে আবার বললে, এখুনি আসতে হবে একবার দয়া ক'রে। খুব আরজেণ্ট।

—কি কেস? আরজেণ্ট বলছেন? কেসটা কি?

—একটি মেয়ের অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে। মেয়েটি প্রেগনেণ্ট। ফার্ষ্ট প্রেগনেন্সি।

—প্রেগনেণ্ট! যন্ত্রণা কোথায় হচ্ছে?

—পেটে।

—আমি জিজ্ঞাসা করছি—যন্ত্রণাটা কি ডেলিভারী—

—না—না—ডাক্তারবাবু। সে সময় নয় এখন, তা ছাড়া সে যন্ত্রণাও নয়।

—তা হ'লে একটু বসুন। এ'দের কয়েক জনকে দেখে যাব।

জোড়হাত ক'রে সে বললে—না। খুব যন্ত্রণা হচ্ছে। একবার এখুনি আসতে হবে আপনাকে। চোখ তার ছল-ছল ক'রে উঠল।

ডাক্তার আর না বলতে পারলেন না। উঠলেন। সে-ই নিজে নিলে কল-বাক্সটা।

বস্তীর মধ্যে দরিদ্র ভদ্র গৃহস্থের বস্তী। ডাক্তার হাসলেন। বাসীন্দারাই ভদ্র এবং গৃহস্থ। বস্তী কিন্তু বস্তী। খোলার চাল, ছিটেবেড়ার দেওয়াল, সরু স্যাঁতসেঁতে গলি-পথ, মাছি-মশা-দুর্গন্ধ সবই আছে। একখানি ঘর আর সামনে একটু ক'রে বারান্দা নিয়ে এক একটি সংসার, ময়লা হাফ-প্যাণ্ট-পরা অপরিচ্ছন্ন ছেলের দল, কেউ কাশছে, কেঁউ কাঁদছে, কেউ মুড়ি খাচ্ছে, সঙ্কীর্ণ লম্বা মেটে উঠানে কাক এসে নেমেছে, একজন সৌখীন ব্যক্তির একটা লোমওয়ালা কুকুর ঘেউ ঘেউ করছে কাকগুলোকে দেখে; উঠানের এক পাশে ঘেরা-দেওয়া একটা স্নান করবার এবং বাসন মাজবার জায়গা, তার মধ্যে সনাতন পাতকুয়া—কলেরা, টাইফয়েড প্রভৃতি সংক্রামক রোগের ইনকিউবেটার; এসে জমে ওইখানে—মুহূর্তে মুহূর্তে বাড়ে। ওরা ভোগে, মরে। তবু অদ্ভুত এদের জীবনের সহ্যশক্তি। বৈজ্ঞানিক মতে ওদের মরে যাওয়া উচিত—তবু ওরা বেঁচে আছে ওই সহ্যশক্তির জোরে।

তবু বস্তীটা ওরই মধ্যে ভাল। বারান্দা মেঝে সিমেণ্ট করা, সিমেণ্টের সঙ্গে লাল রং মিশিয়ে বস্তী বাসীন্দাদের যাদের কিছুখানি গোপন সৌখীন রুচি আছে—তাদের সেই রুচিকে আকর্ষণ করার চেণ্টা আছে বস্তীর মালিকের। পলকা-হালকা কাঠের সেই সনাতন দরজা, তবু তাতে সবুজ রং ধরানো হয়েছিল প্রথমে। জানালাগুলিও একটু আকারে বড়। দেড় ফুট লম্বা মাপে। কতক-গুলোয় শিক, কতকগুলোয় কাঠ দেওয়া, কেউ কেউ জানালায় পর্দা দিয়েছে। এর দরজাতেও একটা পর্দা ঝুলছিল। আরও দুটি অল্পবয়সী ভদ্রলোক বসেছিল।

ভিতরে একখানা তক্তপোষের উপর শুয়েছিল মেয়েটি। সাদা সায়া-ব্লাউসের উপরে একখানি পরিচ্ছন্ন ধুতি ছিল পরণে, হাতে ছিল দু'গাছি

রুলি, দেখলেই বুঝতে পারা যায় মেয়েটি বিধবা। মুখ ঘোমটায় ঢাকাই ছিল—তবু সে আরও একটু টেনে দিলে ঘোমটা। তার পর স্তব্ধ হয়ে পড়ে রইল। সে স্তব্ধতা, সে শান্ত সহনশীলতা ডাক্তারের ভারী ভাল লেগেছিল। ধপ্‌ধপে বিছানায় পরিচ্ছন্ন শুভ্র পরিচ্ছদে আবৃত মেয়েটির যন্ত্রণার মধ্যেও সেই শান্ত সম্বৃত স্তব্ধ অবস্থার কথা আজ স্মরণ ক'রে ডাক্তারের মনে হ'ল সে অবস্থার সঙ্গে রাত্রের নদীর রূপের অনেকটা মিল আছে—তুলনা চলে বোধ হয়। ডাক্তার অনেক দিন রাত্রে এগারটা-বারোটার সময় গঙ্গার ধারে বেড়ান। নদীর যে নিজস্ব তরঙ্গক্ষুব্ধ গতিশীল রূপ, দিন রাত্রির মধ্যে তার সত্যকার কোন অবস্থান্তর কি রূপান্তর ঘটে না; কিন্তু মানুষের চোখে রাত্রির অস্পষ্টতার মধ্যে তার রূপের পরিবর্তন ঘটে, তখন নদীর তরঙ্গক্ষুব্ধ গতি চোখে দেখা যায় না। মনে হয় শান্ত শুভ্র সুদীর্ঘ জলধারা নিথর হয়ে যেন ঘুমিয়ে পড়েছে! মধ্যে মধ্যে মৃদু আলোড়নে আবর্ত উঠে এখানে ওখানে সেখানে এক-একটা। মেয়েটির অঙ্গ সেদিন মধ্যে মধ্যে যন্ত্রণার আধিক্যে এক একবার অবাধ্য আক্ষেপে জেগে উঠছিল। কুঁকড়ে কুঁকড়ে উঠছিল মেয়েটি। আবার নিজেকে সংযত ক'রে শান্ত স্থির হয়ে শুচ্ছিল।

—কি যন্ত্রণা হচ্ছে আপনার? কোথায় যন্ত্রণা হচ্ছে?

মেয়েটি শান্ত হাতখানি রাখলে লিভারের কাছটায়। ডাক্তার দেখলেন। জ্বর একটু হয়েছে। ডাক্তারের মনে হ'ল, পাকস্থলী এবং মল-স্থলীর মধ্যে গণ্ডগোল কিছু হয়েছে। প্রশ্ন করলেন—কোষ্ঠ পরিষ্কারের কথা।

মেয়েটি ঘাড় নাড়লে। 'না' বললে এটা বুঝা গেল। ডাক্তাব প্রশ্ন করলেন—ক'দিন পরিষ্কার হয়নি?

ভদ্রলোকটি এবার মেয়েটির মুখের কাছে তার কান নিয়ে গেল। মেয়েটির ঠোঁট দুটি ঈষৎ নড়ল। ভদ্রলোকটি বললে—তিন চার দিন চলছে।

ডাক্তার বললেন--এ অবস্থায় পারগেটিভ তো চলবে না। ডুস দিতে হবে। ডুস দিন, কমে যাবে বেদনা। আর একটা ওষুধও দেব।

চিন্তিত মুখে ছেলেটি বললে—ডুস দিতে তো জানি না ডাক্তারবাবু।

হেসে ডাক্তার বললেন—কঠিন কিছু নয়, আপনি ডুসটা নিয়ে আসবেন, আমি বুঝিয়ে দেব। আপনি লেখাপড়া জানেন। দেখিয়ে বুঝিয়ে দিলেই পারবেন।

না ডাক্তারবাবু, এমনিই আমি নার্ভাস হয়ে পড়েছি। আমি—। সে আর কিছু বলতে পারলে না।

ডাক্তার বুঝলেন, ভদ্রলোক অতিমাত্রায় বিচলিত হয়ে পড়েছেন। তিনি বললেন—তা হ'লে আমার কম্পাউন্ডারকে আনতে পারেন; সে দিয়ে দেবে। সে এক্‌স্‌পার্ট লোক। একটা টাকা দিয়ে দেবেন তাকে।।

একটু চুপ করে থেকে সে বললে—মেয়েছেলে, কম্পাউন্ডারবাবু পুরুষ মানুষ—!

অন্য যারা বসেছিল দাওয়ায় তাদের একজন এবার ভেতরে এসে বললে, একজন নার্স আনলেই তো হয়!

—হ্যাঁ—হ্যাঁ। কাছাকাছি নার্স কোথায় পাওয়া যাবে ডাক্তারবাবু?

ডাক্তার বললেন—আসুন আমি চিঠি দিয়ে দেব একখানা। এই তো বড় রাস্তায় চৌমাথাটার উপরেই একটা নার্সের আড্ডা আছে।

আজ ডাক্তার সে কথা মনে ক'রে একটু হাসলেন। সেদিন কিন্তু হাসেন নাই। মন তাঁর খুসীতে ভ'রে উঠেছিল। রোগী দেখতে গিয়ে সর্ব প্রথম তাঁর চোখে পড়ে রোগীর পরিবারের মনোভাব। কোথাও দেখা যায় রোগীর প্রতি ঘরের মানুষের নিদারুণ উদাসীনতা; অবহেলিত অবজ্ঞাত রোগী প'ড়ে থাকে, মাথার গোড়ায় এক গ্লাস জল কোথাও থাকে, কোথাও তাও থাকে না। কোথাও কোথাও এই নিষ্করুণ অবহেলা এমন নিষ্ঠুর ভাবে আত্মপ্রকাশ করতে দেখেছেন ডাক্তার যে. আজও তা মনে অক্ষয় হয়ে আছে তাঁর; ভাবলেও শিউরে ওঠেন তিনি। চাকরদের ক্ষেত্রে অবশ্য এমন প্রায়ই ঘটে। ডাক্তার সেগুলো ধরেনই না। আত্মীয়-স্বজনেরা আপনার জনের বেলায় এই অবহেলা অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখায় বিধবা মেয়েদের রোগশয্যায়। আবার দেখা যায় রোগীর জন্য সমগ্র পরিবারের সে কি ব্যাকুলতা। সকল স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্য প্রতিটি মানুষ ব্যগ্রতায় সস্নেহ চোখে চেয়ে আছে রোগীর মুখের দিকে। তারা যেন সকল কষ্ট, সকল উপসর্গ, সকল রোগ আপনাদের হাত দিয়ে বুক দিয়ে দৃষ্টি দিয়ে মুছে নিতে চায়। অবশ্য অবৈজ্ঞানিক মনোভাবের জন্য অনেক ক্ষেত্রে তারা গণ্ডগোল ঘটায়। তবুও এমন ক্ষেত্রে তাঁর চিকিৎসকের মনও প্রসন্ন হয়ে ওঠে। বর্তমান ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক শিক্ষার অভাব থাকলেও এদের সে অভাব-বোধ সম্বন্ধে সচেতনতা ছিল। ছেলেটির নার্স আনার প্রস্তাবে অত্যন্ত

খুসী হয়েছিলেন তিনি।

ছেলেটি তার সঙ্গে আসতে আসতে বলেছিল—কিছু কি কঠিন দেখলেন ডাক্তারবাবু?

—না-না-না। ডুস দিলেই সেরে যাবে, সামান্য ব্যাপার।

গাঢ়কণ্ঠে ছেলেটি বলেছিল—আমি ছাড়া ওর আর কেউ নেই ডাক্তারবাবু। বিধবা মেয়ে. ওই একটা সন্তান হয়ে যদি বাঁচে তবে জীবনে হয়তো সুখী হবে।

একটি মেয়ে হয়েছিল নির্মলার।

ডাক্তারের মুখে বিচিত্র হাসি দেখা দিল।

ডাক্তারবাবু।—

ডাক্তারের চিন্তাসূত্র ছিন্ন হ'ল। হাতে 'মমের' বইখানা খোলাই আছে। বইখানা রেখে তিনি একটু নড়ে চড়ে বসলেন। একটি প্রৌঢ়া মেয়ে একটি অবগুণ্ঠনবতী মেয়েকে নিয়ে এসেছে। এবার বস্তীর বাসিন্দা। ডাক্তারের জীবনে ডাক্তার যত রোগী দেখলেন তার মধ্যে বস্তী বাসিন্দাই বোধ হয় শতকরা সোত্তর-প'চাত্তর জন। এদিক্‌টায় একটা প্রকাণ্ড অঞ্চল জুড়ে বস্তী। মেয়েদের নিয়ে যারা আসে তারা প্রায় রাত্রেই আসে।

—কি?

—একে একবার দেখুন বাবা! বড় ভুগছে। কুচো-কাঁচা ভাঁড় খুরির মত চারটি ছেলেপুলে। এই-এই-এই একটি কোলে। তার ওপরে এই রোগ।

চেম্বারে ঢুকে ডাক্তার টেনে নামালেন ওপরের ঝোলানো জোরালো আলোটা। রক্তহীন পাংশু একখানি কচি মুখ, চোখের পাতায় অপার্থিব অবসন্নতা ঘনিয়ে রয়েছে মেঘাচ্ছন্ন বর্ষা—অপরাহ্নের মত। ডাক্তার তাঁর ব্যবসায়সুলভ নিরাসক্তির সঙ্গে তাকে দেখতে চেষ্টা করলেন। পরীক্ষার অবশ্য প্রয়োজন ছিল না, চোখের দৃষ্টিতেই তিনি দেখতে পাচ্ছেন নিষ্ঠুর নিষ্করুণ ক্রূর ক্ষয় রোগ, যক্ষ্মা। দারিদ্র্যের আচ্ছাদন তলে অবরুদ্ধ অন্ধকারে তার বাস। রোগ মাত্রেই নিষ্করুণ। তবু সকল রোগের মধ্যে এই রোগটি ক্রূর এবং নিষ্ঠুর। তিলে তিলে হত্যা করে। তিনি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে তাকে পরীক্ষা করলেন। চমকে উঠলেন তিনি। রোগের ধরণটা ঠিক নির্মলার মত ড্রাই প্লুরিসি থেকে যক্ষ্মায় পরিণতি লাভ করছে। একটা দিক যেন ঝাঁঝরা হয়ে গিয়েছে।

নির্মলার কথা মনে করতে করতে ডাক্তার খানিকটা ভাবাবেগে আচ্ছন্ন হয়েছিলেন; নিজের ব্যবসায়সুলভ নিরাসক্তিকে কিছুতেই সজাগ ক'রে তুলতে পারলেন না। চোখে তাঁর জল এসে গেল।

সঙ্গিনী প্রৌঢ়া বললে—ডাক্তারবাবু!

দ্রুত চিন্তার স্রোত বয়ে গেল ডাক্তারের মনের মধ্যে।

দরিদ্র গৃহস্থ ঘরের বধূ; চারটি সন্তানের জননী। বাঁচতে হয়তো পারে নিউমোথোরাক্স্ করলে। নির্মলা বেঁচেছে। আজকের দু' বৎসর সওয়া দু' বৎসর আগে যেদিন তিনি শেষবার নির্মলাকে দেখেছিলেন, এর অবস্থা প্রায় তেমনি, হয়তো কিছু ভাল। নির্মলা বেঁচেছে। এও বাঁচতে পারে সে চিকিৎসায়।

আজ সকালবেলায় নির্মলার মুখ মনে পড়ল—সজীব লাবণ্যে ঝলমল করছে। এক্সরের ফটোটা চোখের সামনে ভেসে উঠল।

ডাক্তার শিউরে উঠলেন সঙ্গে সঙ্গে।

কানের পাশে বেজে উঠল—আমি—। আমি এখন—! আবার বেজে উঠল—ড্রিঙ্ক—একটু—ওটা আমার হ্যাবিট হয়ে গিয়েছে।

প্রৌঢ়া মেয়েটি আবার বললে—ডাক্তারবাবু!

ডাক্তার বেরিয়ে এসে বললেন—এ আমার অসাধ্য বাপু। যক্ষ্মা!

মেয়েটি একটু চুপ ক'রে থেকে বললে—সে বুঝেছি ডাক্তারবাবু। কিন্তু কোন উপায়—

ডাক্তার বললেন—হাসপাতালে অনেক—অনেক খরচ। উপায় আমার জানা নেই বাপু!

ঠিক নির্মলার মত রোগের ধরণটা। অদ্ভুত সাদৃশ্য আছে। প্রথম দিন ধরতে পারেননি ডাক্তার। মেয়েটিও যন্ত্রণার সঠিক স্থান নির্দেশ করতে পারে নাই।—রাত্রেই আবার সেই ছেলেটি এল। অপরিসীম উদ্বেগ ছিল তার মুখে। ডাক্তারবাবু!

—কি? ও, আপনার বাড়ীতেই তো সকালে গিয়েছিলেম আজ। ডুস্ দেওয়া হয়েছে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। কিন্তু যন্ত্রণা তো কমল না ডাক্তারবাবু।

—কমেনি? সে কি? ডাক্তার একটু চিন্তিত হলেন।

—একবার চলুন আপনি। যন্ত্রণাটা উপর দিকে উঠছে বলছে।

কেরোসিন তখনও এমন দুষ্প্রাপ্য হয় নাই। একটি বেশ সৌখীন উজ্জ্বল আলোই জ্বলছিল। দিনের আলো সত্য রূপ ধরিয়ে দেয়, রাত্রে যত উজ্জ্বল আলোই হোক, সে যেন রূপের উপর একটা উজ্জ্বল সূক্ষ্ম আস্তরণ টেনে দিয়ে তাকে বেশী সুন্দর করে দেখায়। রাত্রের নদীর উপর জ্যোৎস্না এবং পাতলা কুয়াসা পড়েছিল বলে মনে হয়। তেমনি ধপধপে পরিচ্ছন্ন মহিমায় আবৃত হয়ে তেমনি নিথর ভাবেই পড়েছিল। এখন সে দেখালে ব্যথাটা বগলের প্রায় নিচেই। জ্বর বেশ একটু হয়েছে।

ডাক্তার ধীরভাবে পরীক্ষা করলেন, অনেকক্ষণ ধ'রে পরীক্ষা করলেন। প্লুরিসি ধরা পড়ল এবার।

—ডাক্তারবাবু!

ডাক্তার বললেন—প্লুরিসি হয়েছে। ভাল চিকিৎসার প্রয়োজন। ক্যালসিয়াম ইন্‌জেকশন দিতে হবে। ভাল খাদ্যের প্রয়োজন।

—যা দরকার হয় করুন আপনি। বলুন কি পথ্য দিতে হবে। আজ থেকেই আরম্ভ করুন ইন্‌জেকশন।

প্রায় সমারোহ করেই চিকিৎসা সুরু হ'ল।

ডাক্তার যেতেন। মাথার গোড়ায় টেবিলে দেখতেন ফল সাজানো রয়েছে। দামী পেটেণ্ট ওষুধ। মেয়েটি স্তব্ধভাবে শুয়ে থাকত। মুখের খানিকটা দেখা যেত। একটা তিল কাল রঙেব ফুলের মত ফুটে থাকত গালের উপর। দীর্ঘকাল ধরে ডাক্তারের ধারণা ছিল—গালে তিল ওর একটা। নীরবে হাতখানি বাড়িয়ে দিত। ডাক্তার রবারের নলটা টেনে বাঁধতেন বাহুর উপর। ইন্‌জেকশন দিতেন। এতটুকু স্পন্দন কি চাঞ্চল্য দেখা যেত না।

উপকারও হ'ল। জ্বর একেবারে কমে গেল। ব্যথাটাও আর অনুভব করত না। একদিন ছেলেটি বললে—আর কতদিন লাগবে ডাক্তারবাবু?

—চিকিৎসাটা এখন চালাতে হবে অন্ততঃ প্রসবের আগে পর্যন্ত।

ছেলেটি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে।

ডাক্তার বললেন—এটা একটা ট্রেচারাস ব্যাধি। বিশেষ ক'রে—বাধা দিয়ে ছেলেটি বললে—দেখতে তো সেরে গিয়েছে বলেই মনে হয়।

—হ্যাঁ। কিন্তু ক্যালসিয়াম ইন্‌জেকশনের এখনও দরকার আছে।

তার পর, তার পর বোধ হয় দুটো ইন্‌জেকশন দিয়েছিলেন মনে হচ্ছে। এর পর আর ডাকলে না। শেষের দিন বলেছিল—ডেলিভারীর সময় তো

এগিয়ে এসেছে ডাক্তারবাবু। ডেলিভারীটা হাসপাতালে হওয়াই ভাল, কি বলেন? আর কেউ মেয়েছেলে নেই। আমি কাজে যাই।

ডাক্তার বললেন—সব চেয়ে ভাল হবে। আমি বরং হাসপাতালে একখানা চিঠি লিখে দোব।

ছেলেটির সে কি কৃতজ্ঞতা ফুটে উঠেছিল চোখের দৃষ্টিতে—আজ দেবেন? সময়ে নিয়ে রাখাই ভাল, নয়?

—আসুন।

চিঠি নিয়ে গেল। তার পর আর কোন খবর ডাক্তার পান নাই। ইন্‌জেকশন দেবার নির্দিষ্ট দিনে ডাক্তার অপেক্ষা করেছিলেন। প্লুরিসির পিছনে ক্ষয়রোগের কঙ্কালসার তীক্ষ্ন নখর যে হাতখানা মেয়েটির দিকে প্রসারিত হয়ে আসছিল—তাকে তিনি হাত গুটাতে বাধ্য করেছিলেন! তিনি স্পষ্ট চোখে দেখতে পেতেন—হাতখানা সঙ্কুচিত ক'রে সরিয়ে নিচ্ছে সে। দ্বন্দ্বযুদ্ধে জয়ের আনন্দ অনুভব করেন তিনি এমন ক্ষেত্রে। শুধু তাই নয়, যাকে উপলক্ষ ক'রে এ দ্বন্দ্ব বাধে এমন জয়ের ক্ষেত্রে সেই শরণাগত জনটিকে বড় ভাল লাগে। সকল ডাক্তারেরই লাগে। যে রোগীকে বাঁচায় তাকে যেন মনে হয় পরম স্নেহাস্পদ পরম প্রিয়জন। এ মেয়েটিকে আরও ভাল লাগত। শুভ্র পরিচ্ছদ-মহিমায় স্নিগ্ধ সহনশীল মেয়েটি জ্যোৎস্না রাত্রের নিথর নদীর মত নীরব শান্ত; ক্রূর ক্রোধী ক্ষয়ের শোষণ-গণ্ডুষ থেকে তিনিই রক্ষা করেছেন। ক্ষয়ের শোষণ-গণ্ডুষ শিথিল হয়ে গিয়েছে, সে বয়ে চলেছে নিরুদ্বেগে কোমল মৃত্তিকার বুক বেয়ে।

কয়েক দিনই মনে হয়েছিল তার কথা। একবার ভেবেছিলেন খোঁজ করবেন। কিন্তু কর্মব্যস্ত জীবন। অভিশপ্ত পরাধীন দেশের রোগজর্জরিত মানুষের মধ্যে এ অবকাশ ঘটে নাই তাঁর। ডাক্তারের একটা কথা মনে পড়ে লজ্জা হ'ল। যেদিন তিনি খোঁজ করবেন ঠিক করেছিলেন, সে দিন প্রায় সেই সময়েই এসেছিল ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানীর এজেন্ট; চারটে কেস নিয়ে এসেছিল। অর্থলোলুপতা ঠিক নয়; অর্থের প্রয়োজন হয়। ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানীর ডাক্তার তিনি। খোঁজ করা হয়ে ওঠেনি।

ক্রমে ক্রমে ভুলেই গিয়েছিলেন প্রায়। অনুরূপ দুঃখীর রোগক্লিষ্ট জীবনের সঙ্গে নিত্য পরিচয় হয়ে চলেছে। প্রত্যেকের দুঃখ দেখে মনে হয়, এর চেয়ে দুঃখ আর কারও বেশী নয়। নিরাসক্তির বর্মের মধ্যে হৃদয়কে ঢেকে চলেন ডাক্তার।

মাস দুয়েক পর—হঠাৎ একদিন এল সেই অল্পবয়সী ভদ্রলোক। ঠিক প্রথম দিনের মত টেবিলের ওপাশ ধ'রে দাঁড়াল। মনে হ'ল তেমনি উদ্বেগে কাতর। ডাক্তার তাকে দেখবামাত্র চিনলেন। সঙ্গে সঙ্গে মনের চোখে ভেসে উঠল—ধপধপে বিছানায় শুয়ে আছে পরিচ্ছন্ন শুভ্র পরিচ্ছদ-পরিহিত একটি শান্ত স্তব্ধ মেয়ে। ডাক্তার প্রশ্ন করলেন—কি খবর মশাই?

—একবার যেতে হবে ডাক্তারবাবু।

—কেন? মেয়েটি আছে কেমন?

—ভাল নেই। দিন বিশেক হ'ল ডেলিভারী হয়েছে। আবার সেই কমপ্লেন। এবার জ্বরও বেশী, ব্যথাও বেশী।

ডাক্তার একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন। কারণ, কার্য, ফল—সবই তিনি বুঝতে পারলেন। বললেন—দিন বিশেক ডেলিভারী হয়েছে? তা' ডেলিভারীর আগে হঠাৎ চিকিৎসাটা বন্ধ করলেন কেন?

মাথা নিচু ক'রে ছেলেটি টেবিলের কোণটা নখ দিয়ে খুঁটতে আরম্ভ করলে। একটু পরে বললে—বেশ সেরে উঠল। দুটো তিনটে ইন্‌জেকশনের দিন চলে গেল—দেখলাম ভালই রয়েছে। ভাবলাম সেরে গেছে। কথাটার মধ্যে অসমাপ্তির রেশ রয়ে গেল, সে চুপ ক'রে গেল। অপরাধ স্বীকারের এটা একটা ভঙ্গি।

ডাক্তার বললেন—বড় অন্যায় করেছেন। আমি তো বলেছিলাম আপনাদের। বার বার ক'রে বলেছিলাম। একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন—আপনার আগ্রহ দেখে আমি খুব আশা করেছিলাম।

ছেলেটি এবার উপরের দিকে মুখ তুলে উপরের দিকে চেয়ে রইল।

ডাক্তার বললেন—চলুন দেখি।

দেখলেন ডাক্তার।

সেই মেয়ে—সেই ভঙ্গিতে শুয়ে আছে। কোলের কাছে একটি শিশু-কন্যা। শীর্ণ কঙ্কালসার শিশু; মরণোন্মুখ গাছের ফুলের মত! ডাক্তার এবার দেখলেন—পারিপার্শ্বিকও পাল্টে গিয়েছে। চারিদিক মালিন্যে আচ্ছন্ন হয়ে এসেছে। বিছানা ময়লা, মেয়েটির কাপড় জীর্ণ, ঘরে একটা গন্ধ হয়েছে।

মেয়েটির জ্বর অনেকটা। বুকের ভিতরটাও জীর্ণ হয়েছে।

ডাক্তার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। একটা ইন্‌জেকশনও দিলেন। তারপর বললেন—চলুন। একটা খাবার ওষুধও নিয়ে আসবেন। ঘর থেকে বার হ'বার সময় একবার ফিরে চেয়ে দেখলেন। পারিপার্শ্বিক পাল্টেছে—

মেয়েটিও যেন ঈষৎ পাল্টেছে। আরও শান্ত হয়ে গিয়েছে মেয়েটি। রাত্রের নদীতে মধ্যে মধ্যে যে একটা-দুটো আবর্তের আভাষ পাওয়া যায়, তেমনি ভাবে এক-আধবারও মেয়েটির দেহে যন্ত্রণার আক্ষেপ আগে দেখা যেত। এখন আর তাও দেখা যায় না।

ছেলেটির নাম ডাক্তার সেইদিন জেনেছিলেন। ছেলেটির নাম রমেন। কায়স্থ। ছেলেটি হঠাৎ পথে ডাক্তারকে বললে—ডাক্তারবাবু, আমি যে বড় বিপদে পড়লাম।

—হ্যাঁ, বিপদ বৈ কি!

একটু চুপ ক'রে থেকে সে অকস্মাৎ বললে—মেয়েটি আমার সত্যিকারের কেউ নয় ডাক্তারবাবু।

চমকে উঠলেন ডাক্তার।—কেউ নয়?

—না।

বস্তী অঞ্চলের পথ। সেই পথে চলতে চলতে সে বললে—ডাক্তার শুনে গেলেন।—একটি ভুলের জন্য আমার এই বিপদ। ও আমার কেউ নয়।

মেয়েটি পনের-ষোল বৎসর বয়সে বিধবা হয়েছিল। ছেলেটির বাপ তাকে দেশ থেকে এনেছিলেন রুগ্না স্ত্রীর সাহায্য করতে। ছেলেটির বাপ মধ্যবিত্ত অবস্থার চাকুরে। ছেলেটি চাকরী করে ফ্যাক্টরীতে, নাম রমেন। সে বিবাহ করেনি। বাড়ীতে রুগ্না মা ছাড়া আর কোন মেয়েছেলে নাই। ওই মেয়েটিই ছিল তাদের সংসারের সব। বড় ভাল মেয়ে। শান্ত-স্বভাবা, মিষ্ট কথা, স্নিগ্ধ দৃষ্টি। বড় ভাল লেগেছিল রমেনের।

তারপর—। রমেন চুপ করলে। ডাক্তার কোন প্রশ্ন করলেন না। রাস্তাটা ছিল প্রায় জনহীন, দু'একজন লোক যারা চলছিল—তাদের খালি পা, ডাক্তার এবং রমেনের জুতোর শব্দ বেজে বেজে চলছিল।

একটু পর রমেন বললে—তার পর যা হবার হ'ল। মেয়েটি সন্তানসম্ভবা হ'ল। উপায়ান্তর না পেয়ে ওকে লুকিয়ে এনে এখানে রাখলাম। আমি অবশ্য বাড়ীতে রইলাম—এখনও আছি। বাড়ীতে জানলে—ওই কোথায় চ'লে গেছে। আমি ওকে এখানে রাখলাম, সন্ধ্যেয় আসতাম, দশটায়-এগারটায় বাড়ী যেতাম। ইচ্ছে ছিল—যখন আমা হতেই ওর এই অবস্থা তখন আজীবন ওকে রাখব আমি। সন্তান হ'লে তাকেও প্রতিপালন করব। না-হয় বিয়ে-থাওয়া করব না আমি।

আবার সে চুপ করলে। আবার শুধু বাজতে লাগল জুতোর শব্দ। কিছুক্ষণ পর রমেন পুনরায় আরম্ভ করলে—কিন্তু এতটা ভাবতে পারিনি। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে—ওভার টাইম খেটেও আর পারছি না।

ডাক্তারখানায় এসে পড়েছিলেন। উজ্জ্বল আলোয় ডাক্তার দেখলেন, রমেনের চোয়াল দুটো উঁচু হ'য়ে উঠেছে। পরগাছা চড়ালে কাঁচা গাছ যেমন আড়ষ্ট হয়ে যায়, তেমনি অবস্থা হয়েছে রমেনের।

এর পর সচরাচর যা হয়ে থাকে তাই।

রমেনের ক্লান্তি ক্রমশঃ পরিস্ফুট হ'য়ে উঠতে লাগল। ডাক্তার বললেন, ফিস্ লাগবে না আপনার। করবারও বিশেষ কিছু নাই। দু' একটা গোল্ড ইনজেকশন দিয়ে দেখব। অনেক সময় এতে উপকার হয়।

কিছুই হ'ল না তাতে। রোগ অব্যাহত গতিতে ছুটতে লাগল। কিন্তু আশ্চর্যের কথা—শান্ত সহনশীল মেয়েটির সহনশীলতা তবুও ভাঙল না।

রমেন যেন ক্রমশঃ অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠল। ডাক্তারও পীড়া বোধ করলেন। সেদিন এসে সে বললে,—ডাক্তারবাবু, একটা সার্টিফিকেট দিতে হবে।

চমকে উঠলেন ডাক্তার।

রমেন বললে—মেয়েটা তো মরবেই। বোধ হয় আজ রাত্রেই মরবে। সে রাত্রে আপনাকে কোথায় পাব?

মেয়েটা—অবশ্য নির্মলা নয়, শিশু-কন্যাটি। শিশুটাও শুকিয়ে আসছিল—তার উপর হয়েছিল জ্বর। বাঁচবে না এ কথা ডাক্তারই বলে এসেছেন। কিন্তু তবু তিনি চমকে উঠলেন। বিরক্ত হয়ে উঠলেন। শঙ্কিত হলেন। সন্দিগ্ধও হলেন। রমেনের চোখে মরিয়া মানুষের দৃষ্টি ফুটে উঠেছে। তিনি রূঢ়স্বরে বললেন—না।

মেয়েটা মরল দু'দিন পরে। দিনেই মরেছিল।

তার পর একদিন রমেন এল—তার নিজের ব্যাধি হয়েছে। যৌন ব্যাধি। নিজে ইন্‌জেকশন নিয়ে বলে গেল—আমি তো কাজে যাব ডাক্তার বাবু। আপনি যদি দয়া ক'রে দেখে আসেন; দু'দিন থেকে আরও বেড়েছে। ছটফট করছে যেন।

ডাক্তার গেলেন।

মেয়েটি আজ কথা কইলো। কিন্তু কন্যাটি যেদিন মরেছিল—সেদিনও

ডাক্তার গিয়েছিলেন। মেয়েটি তেমনি ভাবে পড়েছিল। নিথর নিস্তব্ধ। মজা নদীর মত অবস্থা হয়েছে যেন তার। মালিন্যে সর্বাঙ্গ মলিন, মজা নদীর পঙ্কিল জলের মত। জীর্ণ-শীর্ণ-স্তব্ধস্রোতা শুকিয়ে আসছে।

হঠাৎ মেয়েটি উঠল। ডাক্তার শঙ্কিত হয়ে বললেন—উঠো না, উঠো না। শুনলে না। ডাক্তারের পা দুটো জড়িয়ে ধ'রে কেঁদে বললে—ডাক্তারবাবু, কেন আমাকে বাঁচাবার চেষ্টা করছেন? আমার বেঁচে কি লাভ? আমারই লাভ, না সংসারের কোন লাভ? বুঝতে পারছেন না ওই লোকটা কত কষ্ট পাচ্ছে? তার চেয়ে এমন কোন ইন্‌জেকশন থাকে তো আমায় দিন—যাতে আমি দু-একদিনে আস্তে আস্তে মরে যাই!

ডাক্তার বিচলিত হয়ে উঠেছিলেন। তবু তিনি আত্মসম্বরণ ক'রে বললেন —একথা আমাকে অন্যায় বলছ তুমি। আমি ডাক্তার। রোগীকে বাঁচানো আমার ধর্ম। মারতে তো আমি পারি না। না—না, সে আমি পারি না।

তবু মেয়েটি পা ছাড়ে না।

ডাক্তার বহু কষ্টে মুক্ত করলেন নিজেকে। মেয়েটি বললে—লোকটা কি হ'য়ে গেছে দেখছেন না? ও বড় ভাল ছেলে ছিল ডাক্তারবাবু! আমিই ওর কাল হয়েছিলাম। একটু চুপ ক'রে থেকে বিচিত্র হাসি হেসে বললে—বিয়ে করলে না আমার জন্যে। আমার এই অবস্থা। খারাপ ব্যারাম ধরিয়েছে—

ডাক্তার বেরিয়ে চ'লে এলেন।

সে বারের মত তিনি সেই দেখেছিলেন নির্মলাকে। মুখে না বললেও মনে মনে বলেছিলেন—

আর বেশী দুঃখ তোমায় পেতে হবে না। আর বড় জোর দু'তিনটে মাস। হয়তো তারও কম।

তার পর—আর কেউ ডাকতে আসে নাই। খবর দেয় নাই। রমেনও আসে নাই। তিনি জানতেন মজা নদী শুকিয়ে গিয়েছে।

সেই মেয়ে হঠাৎ ফিরে এল। এসে সে বললে—আমি—। ডাক্তার শিউরে উঠলেন।

ক'দিন পর। ইন্‌জেকশন নেবার নির্দিষ্ট দিনে এল না নির্মলা। ডাক্তার তাকে প্রত্যাশা করেছিলেন। না আসায় ক্ষুব্ধ হলেন। রাত্রে ব'সে বই হাতে সে দিনের মত ওই মেয়েটার কথাই ভাবছিলেন। মোটর এসে দাঁড়াল। ডাক্তার

টেবিলের উপর ঝুঁকে প'ড়ে দেখলে রাস্তার দিকে তাকিয়ে—নির্মলা নামছে। আজ গাড়ীখানা 'প্রাইভেট কার'—ঘরের গাড়ী।

নিপুণ প্রসাধন-মার্জিত রূপে লাবণ্যে বেশভূষায় ঝলমল ক'রে সপ্রতিভ হাসি মুখে এসে দাঁড়াল সে—উজ্জ্বল আলোর সামনে।—সকালবেলায় আসতে পারিনি। উনি আজ শিলং গেলেন—আমাকে জবরদস্তি তোমাকেও যেতে হবে। বেলা দেড়টা পর্যন্ত। তার পর খালাস।

ডাক্তার বললেন—কিন্তু রাত্রে এলে কেন? খালি পেট ভিন্ন তো ইন্‌জেকশন দেব না।

সে ব'সে পড়ল—সেই ঘরেই একটা চেয়ারে।—তাই তো!

—কাল সকালেই এস—কিছু না খেয়ে আসবে। তারপর হেসে তিনি বললেন—তুমি তো জান এ কথা। অন্ততঃ সেদিন তুমি তাই বলেছিলে।

নির্মলা বললে—ওঁর কাছে শুনেছিলাম। এ রোগে ইন্‌জেকশন আমার তো এই প্রথম।

ডাক্তার হঠাৎ অন্যায় প্রশ্ন ক'রে বসলেন। প্রশ্নটা ক'রে ফেলে তাঁর মনে হ'ল অন্যায় হয়ে গেল। বললেন—তুমি তো ইন্‌জেকশন নিচ্ছ; কিন্তু তিনি ইন্‌জেকশন নিচ্ছেন তো? সঙ্গে সঙ্গে অন্যায় বোধ জেগে উঠল। বললেন—প্রশ্নটা আমি অন্যায় করলাম। কিছু মনে ক'র না।

হাসলে নির্মলা। বললে—আমার কাছে অপনার অন্যায় হয়নি।

ডাক্তার চুপ ক'রে রইলেন। মেয়েটির কৃতজ্ঞতা-বোধ তাকে তৃপ্তি দিলে।

নির্মলাই একটু পরে হেসে বললে- তাঁর অবশ্য অনেকবারই এ রোগ হয়েছে। তবে এবার তিনি ভালই আছেন।

ডাক্তার অস্বস্তি বোধ করলেন এবার। কথা কোন্ পথে চলেছে? কিন্তু সেই নির্মলা এত নির্লজ্জ হয়েছে যে, সে কি বলছে বুঝতে পারছে না।

নির্মলা বললে—কণ্ট্রাক্টার মানুষ, যুদ্ধের বাজার, দেশ-দেশান্তরে ঘুরে বেড়ান। মধ্যে মধ্যে আমাকেও লগেজের সামিল ক'রে নেন। গিয়েছিলেন আসাম। সেখানে—। কথাটা অসমাপ্ত রেখে সে বললে—ডাক্তারবাবু, লোকটি শিক্ষিত লোক, অনেক শিখিয়েছে আমাকে, অনেক জানে, কিন্তু দুর্দান্ত মাতাল। সেদিন বলেছি তো আমাকে শুদ্ধ মদ খেতে শিখিয়েছে। আমি না খেলে সে রাগ করে। মদ খেলে আর তার জ্ঞান থাকে না। সেখানে—। একটু হাসলে—তারপর বললে—সেখানে মদ খেয়ে সঙ্গী জুটিয়ে নিয়ে এল দু'জন বিদেশী।

এসে আবার মদ খেলে—আমাকে খাওয়ালে। তারপর মদের নেশার উদারতায় আমাকে সেই দু'জনকে উপহার দিয়ে দিলে রাত্রির মত। কয়েক দিন পর হঠাৎ ব্যাধি দেখা দিলে। বললাম, শুনে হাসলে। বললে—ও কিছু না। ইন্‌জেকশন নিয়ে নাও।

ডাক্তারের ললাটে কুঞ্চন-রেখা ফুটে উঠল। কয়েক মুহূর্ত পরে মসৃণ হয়ে গেল আবার। মৃদু হেসে ডাক্তার বললেন—অদ্ভুত তো!

—অদ্ভুত। ডাক্তারবাবু, প্রথম দিন যেদিন তাকে দেখলাম—। নির্মলা আজও শিউরে উঠল। বললে—সেই দিন রাত্রে, যে দিন আপনার পায়ে ধ'রে কেঁদেছিলাম, সেই দিনই ঘর থেকে বেরিয়ে গেলাম আস্তে আস্তে, রমেন রাত্রেও আসেনি। বেরিয়ে পড়লাম মরব বলে। কোথায় যাব? গলায় দড়ি দিতে ইচ্ছে হ'ল না। ভয়ও হ'ল। অনেক ভেবে ঠিক করেছিলাম—রাত্রি একটু বেশী হ'লে—গঙ্গার জলে ঝাঁপিয়ে পড়ব। মরণও হবে—আর গঙ্গায় মরব। অনেক পাপ করেছি। মরবার সময় কষ্ট যাই হোক—ঠাণ্ডা জলে শরীরের জ্বালাটাও অনেকটা জুড়োবে। নির্মলা থামল। চোখের দৃষ্টি তার শূন্যতায় যেন স্বপ্ন দেখছে।

—উঃ সে কি রাত্রি! আর গঙ্গার তীরের সে কি জায়গা! থম-থম করছে রাত্রি।

কেউ কোথাও নাই, মধ্যে মধ্যে গঙ্গার জল কল-কল ক'রে ঘুলিয়ে উঠছে, পাক খাচ্ছে। মরতে এসে তীরে দাঁড়িয়ে ভয় হ'ল। সে কি ভয়, সর্বাঙ্গ থর-থর ক'রে কেঁপে উঠল। ব'সে পড়লাম। কিছুক্ষণ পর মনে হ'ল আমার হাত-পা সব যেন অসাড় হয়ে আসছে, হয়তো গড়াতে গড়াতে কখন গঙ্গার জলে গিয়ে পড়ব।

দুরন্ত ভয়ে সে ফিরে আসতে চাইলে। উঠে দাঁড়াতে পারলে না, হামাগুড়ি দিয়ে চলতে আরম্ভ করলে। পোর্ট রেলওয়ে লাইনে আঘাত খেয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। কয়েক মুহূর্ত প'ড়েই রইল, তার পরই মনে হ'ল যদি রেলগাড়ী আসে, তাকে টুকরো টুকরো ক'রে দিয়ে যাবে! সে আবার উঠল। তার সর্বশরীর কাঁপছে. সে বুঝতে পারলে তার চামড়ার নিচে স্নায়ু শিরাগুলো থর-থর ক'রে স্পন্দিত হচ্ছে দুরন্ত ভয়ে। প্রাণপণ চেষ্টায় হামাগুড়ি দিয়েই সে রেল-লাইন পার হ'য়ে চিৎপুর রাস্তায় এসে পড়ল। একটু বিশ্রাম ক'রে রাস্তা এবং পোর্ট রেলের সীমানার মধ্যে যে রেলিং দেওয়া আছে তাই ধরে

উঠে দাঁড়াল। ভাবছিল—মরতে হয় রোগেই মরবে সে তিলে তিলে। এমন ভাবে মরতে সে পারবে না। তারপর মনে হ'ল বাড়ী ফেরার কথা। কেমন ক'রে সে বাড়ী ফিরবে? এই জনহীন কলকাতার পথ। রাস্তার বড় বড় বাড়ীগুলো এই নির্জন নিস্তব্ধ গভীর রাত্রে ভয়ঙ্কর হ'য়ে উঠেছে মনে হ'ল তার। আবার মনে হ'ল বাড়ীতেও সদর দরজা বন্ধ এখন. ভিতর থেকে তালা পড়েছে। সে যেন এবার রেলিংয়ে ঠেস দিয়ে এলিয়ে পড়ল। চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়তে আরম্ভ করলে তার অজ্ঞাতসারেই।

একটা মোটর চ'লে গেল। খানিকটা গিয়েই থামল সেখানা। পিছিয়ে এল—এসে থামল তার পাশে। মোটর থেকে নামল একজন ফুলপ্যাণ্ট হাফসার্ট পরা লোক। টর্চের আলো তার মুখের ওপর ফেললে। নির্মলার চোখ বন্ধ হ'য়ে গেল আপনি; কিন্তু মদের গন্ধ পেলে সে; সঙ্গে সঙ্গে কানে এল জড়িত কণ্ঠস্বরের কথা।— হুঁ? বেশ তো! সঙ্গে সঙ্গে হাত ধ'রে একটু ঝাঁকি দিয়ে বললে, কে রে তুই? আবার বললে—কেয়াবাৎ রে! দুই গালে দুটো তিল! আঁকা নয় তো! নির্মলা অনুভব করলে—গালে আঙ্গুল দিয়ে ঘষলে সে। তার পর কানে এল,—না, আঁকা নয় তো।—কে রে তুই? কে তুই? এখানে এত রাত্রে? থাকিস কোথায়?

অনেক কষ্টে নির্মলা বললে—আমি মরব বলে—

হেসে উঠল লোকটা। সেই জন্যই কথা শেষ হ'ল না তার। তারপর সে তাকে টেনে নিয়ে বললে—আয়।

একটু বাধা যতটুকু শক্তি তার ছিল—দিয়েছিল সে। লোকটি ধমক দিয়ে বললে—এ্যাও। ধমক দিয়ে টেনে ঠেলে তুলে দিলে গাড়ীতে। গাড়ীটা আবার ফেরালে। খালের পোল পার হয়ে গাড়ী ছুটল। তাকে এনে তুললে একটা বাগান-বাড়ীতে। সাজান ঘর। একটা সোফার উপর ফেলে দিলে। ঘরের সব কটা আলো জেবলে দিলে। নির্মলা ঘোমটা টেনে দিয়েছিল, সেটা টেনে খুলে ফেললে। কিছুক্ষণ দেখলে। ঘরের আলমারীতেই মদ ছিল—বা'র করলে, নিজে খেলে। নির্মলাকে বললে—খাবি?

নির্মলা কে'দে উঠল। সে হাসলে। তার পর—। সেই দিনের আলোর মত আলোর মধ্যেই—।

শিউরে উঠল নির্মলা। তার পর আবার হাসলে। বললে—মদ খেলে জানোয়ার ছাড়া আর কিছু নয় সে। পশু!

স্তম্ভিত হ'য়ে গেলেন ডাক্তার।

নির্মলা বললে—ওটা তার বাগান-বাড়ী। প্রচুর টাকা করেছে। সেদিন আমাকে দশটাকার একখানা নোট দিয়ে বাগান থেকে বা'র ক'রে দিলে। আমার তখন নিরুপায় অবস্থা। কি করব? কেমন ক'রে ফিরব? কোন্ মুখেই বা ফিরব? শরীরেও তখন অসহ্য যন্ত্রণা। নির্মলা থেমে একটু হাসলে; বললে—যন্ত্রণা আমি সহ্য করতে পারি; কিন্তু হাঁটবার ক্ষমতা তো চাই। বাগানের মালীটাকেই দশ টাকার দুটো টাকা ভাগ দিয়ে বললাম—দু'টাকা তুমি নাও, বাকী টাকা থেকে আমাকে হোটেল থেকে একমুঠো ভাত এনে দাও। আর আমাকে একটু আশ্রয় দিতে হবে, আমার জ্বর, একটু সুস্থ হ'লেই চ'লে যাব। চ'লে আসতে পারিনি। রাত্রে সে আবার এল—আমি শুয়েছিলাম মালীর ঘরের বারান্দায়। হঠাৎ টর্চের আলো এসে পড়ল। সে এসে দাঁড়াল। মদের গন্ধ পেলাম। তার পর—।

হাসতে লাগল নির্মলা। বললে—মদ খেলেই সে জানোয়ার। বাঘে শুনেছি শীকারের মাংস পচিয়ে খায়।

একটু থেমে বললে—পরের দিন আর তাড়িয়ে দিলে না। সকালে ব'সে ব'সে শুনলে আমার কথা। তার পর ডাক্তার ডাকলে। আমি বলেছিলাম আপনার কথা। সে ঠোঁট বেঁকালে। তার পর ডাকলে একজন বড় ডাক্তারকে —টি-বি স্পেশালিষ্টকে। ডাক্তার বললে—হাসপাতালে দিয়ে নিউমোথোরাক্স ক'রে দেখতে পারেন। সেরে যেতে পারে, একটা লাংস্ ঠিক আছে এখনও। চৌদ্দ মাস রইলাম হাসপাতালে। সে কি সমারোহ ডাক্তারবাবু! তার পর এনে রেখেছে একটা খুব ভাল ফ্ল্যাট ভাড়া ক'রে। কিন্তু এখনও সেই বাগান-বাড়ী আছে। সেখানে হৈ হৈ করতে যায় মধ্যে মধ্যে—মদ খেয়ে অনেক সময় আমাকে ভাল লাগে না। তখন খোঁজে কুৎসিত মেয়ে, দরিদ্র মেয়ে, রুগ্ন মেয়ে।

ডাক্তার শিউরে উঠলেন; বললেন—বল কি?

হেসে নির্মলা বললে—দেখুন না মাথার দিকে চেয়ে। চুলে তেল দেবার হুকুম নেই। চক্‌চকে চুল তার ভাল লাগে না। বলে কি জানেন? বলে—ভাল লাগা আর নেশা লাগা দুটো পৃথক্ জিনিষ। চক্‌চকে চুল ভাল লাগে—কিন্তু নেশা লাগে না। এই সে আজ গেল—কাল চুলে তেল মাখব। মদ খেলে চকচকে চুল দেখলে ঠেলে সরিয়ে দেয়।

ডাক্তার হাসলেন। সে হাসি যে কিসের, এবং কেন যে হাসলেন তা তিনিও

বুঝলেন না।

নির্মলা বললে—করুণা হচ্ছে আপনার?

—তোমাকে স্নেহ করি, করুণা একটু হয় বৈকি।

—না, ডাক্তারবাবু। আর একটা দিক আছে তার। সে আমাকে পড়ার সাহায্য করে, একজন মাস্টার রেখে দিয়েছে। গান শেখাবার ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছে। ভাল যখন থাকে তখন আমার গালের তিল দুটো নিয়ে খেলা করে, নাড়ে। বলে—একটা তিলের জন্যে কবি বোখারা সমরখন্দ বিকিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। আমি দুটো তিল পেয়েছি।

ডাক্তার বললেন—এইবার খুসী হ'লাম। তুমি তা' হ'লে তাঁকে ভালবেসেছ?

চুপ ক'রে রইল নির্মলা।

—কি, উত্তর দিচ্ছ না যে?

নির্মলা বললে—ভাল লাগা আর ভালবাসা-বোধ আলাদা জিনিষ ডাক্তার-বাবু। ভাল লাগে কিন্তু।—একটু চুপ ক'রে থেকে বললে—জানি না ঠিক। আবার একটু চুপ ক'রে থেকে বললে—সময় সময় সব তেতো মনে হয়। সব। সব। আবার মনে হয়—বেশ আছি। খুব ভাল আছি। এর চেয়ে ভাল আর ক'জন থাকে! অনেকের বউয়ের স্বামীও তো মদ খায়, চরিত্রহীন হয়।

মনস্তত্ত্ব-বাতিকগ্রস্ত ডাক্তার উৎসুক উদ্‌গ্রীব হ'য়ে উঠেছিলেন। তাঁরও নেশা লেগেছে। একটু ঝুঁকে টেবিলের উপর কনুই রেখে বললেন, একটা কথা জিজ্ঞাসা করব?

—বলুন! হেসেই উত্তর দিলে নির্মলা।

—রমেনকে,—রমেনের কথা মনে হয় এখনও? তাকে—

নির্মলা ডাক্তাবের মুখেব কথাটা নিয়েই বললে—তাকে ভালবাসি কি না জিজ্ঞাসা করছেন? ঠোঁটে তার মৃদু হাসি ফুটে উঠল, বললে—হ্যাঁ বললে খুসী হন বোধ হয়!

ডাক্তার হেসে বললেন—কেন?

নির্মলা যা জবাব দিলে—সে শুনে ডাক্তার অবাক হয়ে গেলেন। সে খিল-খিল ক'রে হেসে বললে—মেয়েদের একনিষ্ঠতায় পুরুষরা সান্ত্বনা পায় ডাক্তারবাবু! মনে হয় আমাকে ভালবাসলে একনিষ্ঠ হয়েই ভালবাসবে।

ডাক্তার তার মুখের দিকে চেয়ে বললেন—একথা তোমায় শেখালে কে?

—এই লোকটি।

অনেকক্ষণ দু'জনেই চুপ ক'রে রইলেন। মেয়েটি হঠাৎ বললে—রমেনের উপর কোন আকর্ষণ সত্যিই আমার নাই। একটু থেমে আবার বললে—তার উপর কোন ঘৃণাও নাই! বরং—। সেও আমার জন্যে অনেক করেছে—অনেক সয়েছে। রমেনের টাকা থাকলে সেও হাসপাতালে খরচ ক'রে আমার এমনি চিকিৎসাই করাতো।

নির্মলা একটু আকস্মিক ভাবেই উঠে চ'লে গেল।

ডাক্তার চুপ ক'রে ব'সে রইলেন। কিছুক্ষণ পর ডাক্তারের মনে হ'ল—মানুষের জীবনটা তরল পদার্থ।

এর পর ক'দিন এল নির্মলা। ইন্‌জেকশন নিলে। তারপর আর সে এল না। ডাক্তার ভেবেছিলেন—নির্মলা এর পর তার নিজের অসুখে তাঁকেই কল দেবে। সেই লোকটিকে দেখবার একটা প্রবল ইচ্ছা ছিল ডাক্তারের। কিন্তু আর তার খবর পেলেন না।

ডাক্তার নিজের ব্যবসায় নিয়ে চলেছেন। টাইফয়েড, কলেরা, টি, বি, ইনফ্লুয়েঞ্জা—এ ছাড়া উদ্ভট অদ্ভুত কত ব্যাধি! রোগীর পর রোগী আসে। কত মনে থাকে, কত ভুলে যান! যাদের কিছু দিন মনে থাকে কিছু দিন পরে তাদের ভোলেন। আবার কতক জন নতুন রোগী, মনে থাকে কিছু দিন। শুধু দু'একজনের কথা কিছুতেই ভোলা যায় না।

প্রভা ব'লে জেলেদের মেয়েটিকে টি-বি থেকে বাঁচিয়েছেন। নরেনবাবুকে কলেরা থেকে বাঁচিয়েছেন। সে বাঁচা আশ্চর্য। তাকে মনে আছে। কালী-ঠাকুরের পূজারীকে মনে আছে। সে বেঁচেছে টাইফয়েড থেকে। নির্মলাকেও মনে হয় মধ্যে মধ্যে।

বৎসর দেড়েক পর আজ—হঠাৎ ডাক্তার একটা টেলিফোন পেলেন। একটি বড় হাসপাতাল থেকে টেলিফোন ক'রে জানালো—আপনাকে একবার আসতে হবে।

—আমাকে? কেন?

—একটি মেয়ে, আমাদের এখানকারই একটি নার্স—বিষ খেয়েছে, বাঁচবে না। আপনাকে, আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়।

বিস্মিত হলেন ডাক্তার। কে? নার্সদের অনেককেই তো জানেন, কিন্তু এ কে? কে বিষ খেলে? বিষ খেয়েই বা কে নার্স তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাইবে? তবুও তিনি গেলেন।

ডাক্তার অবাক হয়ে গেলেন।

ধপধপে বিছানায় শুভ্র পরিচ্ছদ-আবৃত মেয়েটি পড়ে আছে। রাত্রের নদীর মত। মধ্যে মধ্যে আক্ষেপে দেহ সঙ্কুচিত হচ্ছে। যেন রাত্রের নদীতে আবর্ত উঠছে। নির্মলা শুয়ে আছে।

হাসপাতালের ডাক্তার বললেন—মাস কয়েক আগে এসে চাকরী নিয়েছিল। বললেন—অত্যন্ত হাসি-খুসি ছিল। কেন যে—। জানি না। মেয়েদের চরিত্র। কয়েক জন তরুণ ডাক্তার তো যন্ত্রাহত হয়ে গিয়েছিল ওকে নিয়ে। মেয়েটির অভ্যাস ছিল—খেলা করার। আপনি চেনেন?

—চিনি। কিন্তু ও যে নার্স হয়েছিল তা তো জানি না। এক সময় ও আমার পেশেণ্ট ছিল। টি-বি হয়েছিল।

তাই না কি?

—হ্যাঁ।

—দেখুন কি বলতে চায়? অবশ্য—। হাসলেন ডাক্তার। এ ডাক্তারও জানেন জ্ঞান আর হবে না।

জ্ঞান আর হ'ল না। বিচক্ষণ বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টি ভ্রান্ত প্রায়ই হয় না। ডাক্তার পেলেন একখানা চিঠি। তাঁকেই লিখেছিল নির্মলা। সুদীর্ঘ চিঠি। অনেক কথা। অনেক ঘটনা। হঠাৎ নির্মলার মন তিক্ত হয়ে ওঠে। সে নিষ্কৃতিই খুঁজছিল। ঠিক এমনি সময়ে কনট্রাকটার ভদ্রলোককে গভর্ণমেণ্ট এ্যারেষ্ট করলেন—কয়েক লক্ষ টাকা প্রবঞ্চনা করার অভিযোগ। নির্মলা বেঁচে গেল। সে অনেক ভাবলে।

লিখেছে—আপনার সেদিনের কথা মনে হয়েছিল ডাক্তারবাবু। ভেবে দেখেছিলাম রমেনকে ভালবাসি কি না। আমার হাতে তখন অনেক টাকা। সে ভদ্রলোক—গহনায় টাকায় অনেক দিয়েছিলেন আমাকে। আমি স্বচ্ছন্দে রমেনকে নিয়ে সুখে থাকতে পারতাম। কিন্তু ঠিক বুঝেছিলাম—তাকে ভালবেসে আমি সুখী হতে পারব না। একবার ভেবেছিলাম—টাকা নিয়ে তীর্থ-ধর্ম করব। ভাল লাগেনি। একবার ভেবেছিলাম—সিনেমায় নামব। প্রায় ঠিকও ক'রে ফেলেছিলাম। তার পর সেও বাদ দিলাম। তার পর নার্সিং শিখতে ইচ্ছা হ'ল। খুব ভাল লাগল! মনে হ'ল—এই যেন চাইছিলাম। কিছু তো চায় মানুষ জীবনে। মনে হয়েছিল—রমেনকে আশ্রয় ক'রে প্রথম যা পাইনি, এই লোককে আশ্রয় ক'রে টাকায়, গয়নায়, পড়ায়, গানে যা পাইনি,

এইবার এই নার্সিংয়ের মধ্যে তাই পাব। প্রথম প্রথম মনেও তাই হ'ত। পেয়েছি। নিজের পরিশ্রমে উপার্জন ক'রে তাই থেকে দিন চালাতাম। সে ভদ্রলোকের দেওয়া টাকা ব্যাঙ্কে মজুত রেখেছিলাম। হাত দিইনি। দিতে ইচ্ছা হ'ত না। হয়তো বলবেন—নারী চায় পুরুষকে, এ ক্ষেত্রে তুমি সেই ভুল করেছিলে। না। তরুণ ডাক্তারেরা গুঞ্জন করত চারি পাশে। প্রথম বেশ ছিলাম। মনে হয়েছিল—সব পেয়েছি। তার পর ক্রমশঃ এর রঙও ফিকে হয়ে গেল। আর ভাল লাগল না। অত্যন্ত তেতো হ'তে আরম্ভ হ'ল সব। ক'দিন থেকে—রাত্রে ফের মদ খেতে শুরু করেছি। মদের সঙ্গেই বিষ মিশিয়ে খাব। বেঁচে কি লাভ? ভাল লাগছে না। কি চেয়েছিলাম বুঝতে পারলাম না। বোধ হয়, ডাক্তারবাবু মানুষ তা বুঝতে পারে না। হঠাৎ পেয়ে যায়। পেলে বুঝতে পারে—কি চেয়েছিল। বিষ খাবার কল্পনায় বেশ আনন্দ পাচ্ছি ডাক্তারবাবু।

পুনশ্চ—লিখেছে সে—আমার যে টাকাগুলো আছে ব্যাঙ্কে, সেগুলোর ট্রাষ্টি করেছি আপনাকে। উকীল জানাবে আপনাকে যথাসময়ে। মেয়েদের কোন কিছুতে দিয়ে দেবেন।

ডাক্তার স্তব্ধ হয়ে ব'সে রইলেন।

কি চেয়েছিল নির্মলা? সংসার—সন্তান? কিন্তু কোন পুরুষের আশ্রয়ই তো তার ভাল লাগেনি?

কি চেয়েছিল? অন্য কাউকে চেয়েছিল? ডাক্তার হঠাৎ অত্যন্ত বেদনা বোধ করলেন।—হয়তো—তাঁকেই—। ভক্তি থেকে বলে তো বিজ্ঞানে—।

হঠাৎ মনে হ'ল—তাঁর কানের কাছে নির্মলা খিল-খিল ক'রে হাসছে—বলছে—পুরুষদের মনে হয়—আমাকে ভালবাসলেও—তো—।

লজ্জিত হলেন ডাক্তার।

কমলা বলে মেয়েটি—প্লুরিসির রোগী—তাকে নিয়ে এল তার বাপ।

ডাক্তার উঠে বসলেন—বিজয়, ক্যালসিয়াম।

—বাঃ বেশ সারছে মেয়েটি। বাঃ।

বিজয় দেরী করে বড়। ডাক্তারকে ব'সে থাকতে হ'ল নিষ্ক্রিয় হয়ে।

কি চেয়েছিল নির্মলা?

প্র ত্যা ব র্ত ন

পুকুরের মাছ বর্ষায় বাহিরের জলস্রোতের সংযোগে বাহির হইয়া যায়। নালা নদী নদ সমুদ্র ঘুরিয়া সে অবশ্য আর পুকুরে ফিরিয়া আসে না; কিন্তু ফিরিয়া আসিলে যা ঘটে তাই ঘটিল। আত্মীয় জ্ঞাতি বন্ধুবর্গ দূরের কথা—মা পর্যন্ত চিনিতে পারিল না।

পরনে নীল রঙের পাৎলুন, ফুলহাতা কোমরটুকু অবধি খাটো জামা, জামার পিছনে পিঠের উপর আবার একটা চৌকা ফালি মাথায় বিচিত্র টুপি—এই পোষাকপরা লোকটিকে দেখিয়া জেলেপাড়ার সকলে ভাবিয়াছিল কোন অদ্ভুত দেশের মানুষ। লোকটি পরম আরামে সিগারেট টানিতে টানিতে আসিয়া জেলেদের বিপন অর্থাৎ বিপিনের বাড়ীর দুয়ারে দাঁড়াইল। পিছনে একপাল ছেলে জুটিয়াছিল, সে দাঁড়াইতেই ছেলেগুলিও দাঁড়াইয়া গেল। বিচিত্র পোষাকপরা লোকটির দৃষ্টি জীর্ণ পতনোন্মুখ বাড়ীটার দিকে পড়িতেই সে-দৃষ্টি চকিত হইয়া উঠিল- -ভ্রূর কুঞ্চনে জাগিয়া উঠিল নীরব প্রশ্ন। পিছন ফিরিয়া ছেলেদের দিকে চাহিয়া হাতের একটিমাত্র আঙুল নাড়িয়া সে ডাকিল, এই কাম ইয়ার—ইধার আও! শুন্ শুন্—ইখানে শুন্। এ-ই ছো-করা!

যে ছেলেটি সম্মুখে ছিল সে চট করিয়া পিছু হটিয়া চার-পাঁচ জনকে আড়াল রাখিয়া দাঁড়াইল! সে চার-পাঁচ জনও পিছনে যাইবার জন্য একটা ঠেলাঠেলি সুরু করিয়া দিল। লোকটি কৌতুক বোধ করিয়াও ঘৃণার সহিত বলিল—শূয়ার-কি-বাচ্চা!

তারপর সে বাড়ীর ভাঙা দরজাটা ঠেলিয়া বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিয়া উঠানে দাঁড়াইল। চারিদিক ভাঙা-ভগ্ন, উহারই মধ্যে ভাল অবস্থার ঘরখানার দাওয়ার উপর বসিয়াছিল এক প্রৌঢ়া; খাটো ছেঁড়া একখানা কাপড় পরিয়া কতকগুলো গুগলি শামুকের খোলা ভাঙিয়া পরিষ্কার করিতেছিল। সে সন্ত্রস্ত হইয়া রূঢ় শঙ্কিত স্বরে প্রশ্ন করিল—কে, কে গো তুমি?

আগন্তুক একমুখ হাসিয়া বলিল--মা!

বিস্ময়-বিস্ফারিত দৃষ্টিতে প্রৌঢ়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

এবার মাথার টুপিটা খুলিয়া আগন্তুক বলিল—চিনতে পারছিস্ না মা? হামি পশুপতি! কথাগুলিতে অদ্ভুত একটি টান—'শ'-কারগুলি সব কেমন শিষের মত তীক্ষ্ণ, উচ্চারণে শব্দগুলি যেন কেমন বাঁকা।

পশুপতি? পশু? পশো? প্রৌঢ়ার হাত দুইটি নিষ্ক্রিয় স্তব্ধ হইয়া গেল; ঠোঁট দুইটি থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল, আকুল প্রশ্নভরা চোখে আগন্তুকের দিকে প্রৌঢ়া নির্বাক হইয়া চাহিয়া রহিল। তাহার হারানো ছেলে পশো, পশুপতি? লম্বা, রোগা, দুরন্ত পনের বছরের ছেলে দশ বৎসর আগে পলাইয়া গিয়াছিল জগন্নাথের পাণ্ডার সঙ্গে—সেই পশুপতি? পশো?

আগন্তুক আগাইয়া আসিয়া বলিল—চিনতে পারছিস্ না মা?

সত্যই প্রৌঢ়া চিনিতে পারিতেছিল না; পরনে অদ্ভুত পোষাক—সায়েবদের পোষাকও সে দেখিয়াছে—এ পোষাক সেই ধরণের হইলেও ঠিক তেমন নয়; নীলবর্ণ এ এক অদ্ভুত পোষাক। জেলের ছেলে পশুপতি—যে কেবল নেংটির মত এক ফালি কাপড় পরিয়া থাকিত, কালো রং, নির্বোধ বোকা চেহারা, জলে থাকিয়া যাহার সর্বাঙ্গ চুলকানায় ভরিয়া থাকিত, সেই পশুপতি—পশো? মাথার পিছন দিকটা একেবারে কামানো—সামনের বড় বড় চুলগুলো আইবুড় মেয়েদের মত পিছনের দিকে আঁচড়ানো, চোখে-মুখে এমন একটা চালাক-চতুর ভাব—এই কি সেই?

আগন্তুক এবার পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া দাওয়াটা বার দুয়েক ঝাড়িয়া লইয়া বসিল, হাসিয়া বলিল—বহুৎ মুল্লুক ঘুরে এলম, মা। জাপান চীন বিলাত মার্কিন মুল্লুক ঘুরলম। জাহাজে খালাসী হইয়েছিলাম।

সে আবার একটা সিগারেট ধরাইল।

দশ বৎসর আগের কিশোর একখানি মুখের ছবির সহিত এই মুখখানি ক্রমশ মিলিয়া এক হইয়া আসিতেছিল—এক বিচিত্র জ্যামিতি ও পরিমিতির আঙ্কিক নিয়মে বিভিন্ন কালে পরিবর্তিত একখানা জমির মত। নাকের বাঁকা ভাবটি ঠিক তো—সেই তো! ঠোঁটের কোণ দুইটার ঠিক তেমনিই নীচের দিকে টান! ভ্রূ দুইটা তো তেমনি মোটা!

এক মুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া আগন্তুক বলিল—বুঢঢা কাঁহা?—শুয়ার-কি-বাচ্চা?

বুঢঢা—বিপিন জেলে—এই বাড়ির মালিক, প্রৌঢ়ার দ্বিতীয় পক্ষের স্বামী। পশুপতির সৎ-বাপ।

প্রৌঢ়া এবার কাঁদিয়া ফেলিল—বুড়ো মইছে বাবা—আমাকেও মেরে যেইছে। পথে বসিয়ে গেল বাবা, সব দিয়ে যেইছে 'বেটী'দিগে।

বিপিন মরিবার সময় সব দিয়া গিয়াছে তাহার প্রথম পক্ষের স্ত্রীর গর্ভজাত কন্যাদের।

পশুপতি হাসিয়া বলিল—মর গেয়া বুঢ্‌ঢা, শুয়ার-কি-বাচ্চা?

দশ বৎসর পূর্বে পশুপতি নিরুদ্দেশ হইয়াছিল। দুরন্ত নির্বোধ জেলের ছেলে, সৎ-বাপ বিপিনের পোষ্য ছিল। বিপিন ছিল এখানকার মধ্যে অবস্থাপন্ন জেলে—এ অঞ্চলের ভাল ভাল পুকুর সে জমা করিয়া লইত, অদূরবর্তী নদীটার খানিকটা অংশও সে খোদ সরকারের কাছে জমা লইত একা। বিপিন মাছ ধরিতে যাইত, পশুপতিকে সঙ্গে যাইতে হইত; জলের তলায় কোন কিছুতে জাল আটকাইলে বিপিন পশুপতিকে জলে ডুবিতে বাধ্য করিত। জলের তলায় বুক যেন ফাটিয়া যাইত। পশুপতি জলের তলায় হাতড়াইয়া ফিরিত--কোথায় কিসে আটকাইয়াছে জাল। কতবার যে বোয়াল চিতলের কামড় সে খাইয়াছে তাহার হিসাব নাই। মাছ ধরিয়া ফিরিয়া বিপিন পশুকে পাঠাইত কাঠ-সংগ্রহে। সন্ধ্যায় আকণ্ঠ মদ গিলিয়া পশুকে সে নিয়মিত প্রহার দিত। সেবার জগন্নাথের পাণ্ডার লোক আসিয়াছিল রথযাত্রার পূর্বে যাত্রী সংগ্রহে। কেমন করিয়া জানি না এই বিদেশবাসীর সহিত পশুর আলাপ জমিয়া যায়! তাহার এটা ওটা কাজকর্ম করিয়া দিত, এঁটো বিড়ি প্রসাদ পাইত, আর গল্প শুনিত। জগন্নাথের মন্দির, তাঁহার রথ, সে রথ নাকি আকাশ ছোঁয়, রথের উপর জগন্নাথ নাকি হাঁটিয়া আসিয়া চড়েন লক্ষ লক্ষ লোক জমায়েত হয়; মধ্যে মধ্যে সে রথ নাকি আটকাইয়া যায়, লক্ষ লোকে টানিলেও সে রথ চলে না, তখন পাণ্ডারা জগন্নাথকে তিরস্কার করে—তবে সে রথ আবার চলে। সেখানে নাকি সমুদ্র আছে, তালগাছের সমান উঁচু এক একটা ঢেউ—নীল বর্ণ জল, সমুদ্রের নাকি ওপার নাই।

পাণ্ডার লোক যাত্রী লইয়া ট্রেনে চড়িয়া কিছুদূর আসিয়া সন্ধান পাইল ট্রেনের বেঞ্চের তলায় লুকাইয়া শুইয়া আছে—পশুপতি। ট্রেনটা এক্সপ্রেস ট্রেন। বর্ধমান তখন পার হইয়া গিয়াছে। হাওড়ায় পৌঁছিয়া ট্রেন থামিল। নির্বিকার পাণ্ডা হাওড়ায় রেল কর্মচারীর হাতে পশুকে সমর্পণ করিয়া যাত্রীর দল লইয়া চলিয়া গেল। নিঃসম্বল পশু, একখানি মাত্র জীর্ণ কাপড় তাহার পরনে, রেলকর্মচারী তাহাকে সঁপিয়া দিল কনেস্টবলের হাতে। কিল, চড় ও

কয়েকটা গুঁতা দিয়া কনেস্টবলটা তাহাকে আনিয়া পুরিল হাজতে। হাজত হইতে কোর্ট—কোর্টের বিচারে কয়েক দিনের জন্য তাহার জেল হইয়া গেল। প্রকাণ্ড কালো রঙের ঢাকা একখানা গাড়ীতে তুলিয়া তাহাকে আনিয়া জেলে পুরিয়া দিল। আশ্চর্যের কথা, অতিদ্রুত এতগুলি অবস্থান্তরের মধ্যেও পশু কোন দিন কাঁদে নাই। একটা সভয় বিস্ময়ের অতিরিক্ত আর কিছু সে অনুভব করে নাই।

যে কষ্টে মানুষের কান্না আসে তেমন কষ্ট এই অবস্থান্তরের মধ্যে ছিল না। অন্ততঃ তাহার কাছে ছিল না। কষ্ট অনুভব করিল সে বরং জেলখানা হইতে বাহির হইবার পর। বিরাট শহর—বড় বড় বাড়ী—অসংখ্য পথ—যে পথ পিছনে ফেলিয়া আসে সে পথ আর খুঁজিয়া বাহির করা যায় না, গাড়ী—গাড়ী আর গাড়ী, মানুষ আর মানুষ। জেলখানা হইতে বাহির হইয়া কিছুক্ষণ ঘুরিয়া সে যখন অকস্মাৎ অনুভব করিল সে হারাইয়া গিয়াছে, যে পথ ফেলিয়া আসিয়াছে সে পথ আর বাহির করা যাইবে না—তখন তাহার চোখে জল আসিয়াছিল। সমস্ত দিনটা সে কাঁদিয়াছিল। মায়ের জন্য কাঁদিয়াছিল, গাঁয়ের জন্য কাঁদিয়াছিল। তার পর সব সহিয়া গেল। ভিক্ষা করিয়া মোট বহিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে সে আসিয়া উপস্থিত হইল অদ্ভুত একটা স্থানে। চারিদিকে বড় বড় বাড়ী—মধ্যে প্রকাণ্ড বাঁধানো নদী—নদীর উপরও বড় বড় বাড়ী ভাসিতেছে। বাড়ী নয়—জাহাজ। আশপাশের লোকজনের কাছেই সে শুনিল ও-গুলো জাহাজ। বড় বড় মই লাগাইয়া মোট মাথায় লোক উঠিতেছে, নামিতেছে; আকাশের উপরে একটা মই লোহার দড়িতে প্রকাণ্ড বোঝাগুলোকে বাঁধিয়া লইয়া জাহাজের উপর আপনি তুলিয়া লইতেছে। জাহাজের মাথায় বড় বড় চোঙা—মধ্যে মধ্যে চোঙা হইতে কি ভীষণ ধোঁয়ার রাশি! অদ্ভুত লাগিয়া গেল পশুপতির। জায়গাটার নাম শুনিল—খিদিরপুরের ডক। কত মানুষ—কত রকমের সায়েব। সুন্দর নীল পোষাক। খাটো মাথার সায়েবগুলোর ছোট ছোট চোখ, খ্যাঁদা নাক—পশুপতির বেশ লাগিল। পরে শুনিল—উহারা জাপানী সায়েব। পশু ওইখানেই থাকিয়া গেল। কিছু দিনের মধ্যেই সে অনেক শিখিয়া ফেলিল। আকাশে যে মইগুলো জিনিস টানিয়া তোলে ও-গুলো—'কেরেন'। জাহাজের গোল চোঙাগুলো চিম্‌নী! জাহাজের উপরের ঘরগুলি কেবিন। জাহাজের ভিতরে—পাতালের মত গহ্বরটাও ক্রমশ তাহার পরিচিত হইয়া উঠিল। কল-ঘরের ভিতরেও সে

দেখিল; সেদিন সে বিস্ময়ে হতবাক্ হইয়া গিয়াছিল। বাপ রে! চারি পাশে রেলিং-ঘেরা পিছল সিঁড়ি নীচে ওই পাতালে নামিয়া গিয়াছে; মধ্যে ঝকঝকে বিরাট যন্ত্রপাতি। সে কি উত্তাপ—আর সে কি শব্দ!

খিদিরপুরের একটা খোলার পল্লীতে সে থাকিত। সেখানে কত লোক, কত জাতি, চীনাম্যান, মগের মুলুকের লোক, চাটগাঁয়ের খালাসীর দল, গোয়ানী, মধ্যে মধ্যে সায়েব-খালাসীর দু-চারজনও মাতাল হইয়া আসিয়া জুটিত। কত প্রহারই সে প্রথম প্রথম খাইয়াছে। বড় হইয়া অবশ্য সেও কত জনকে প্রহার দিয়াছে। কত গল্প সে শুনিত, দেশ-দেশান্তরের কথা—বার্মা মুলুক, সিঙ্গাপুর, হংকং, চীন, জাপান, মার্কিন, বিলাত, ফেরান্স—কত দেশ কত শহর। কত বিচিত্র অভিজ্ঞতা, সে অভিজ্ঞতার অধিকাংশই নারী-সংক্রান্ত; পশুপতির পায়ের রক্ত মাথার দিকে উঠিত। সমুদ্রের গল্প—কূল নাই, দিক্ নাই, শুধু সমুদ্র আর আকাশ, আকাশে ওড়ে কত পাখী—জাহাজের আশে পাশে ঘোরে হাঙ্গর, করাতের মত সারি সারি দাঁত, মধ্যে মধ্যে নাকি তিমিও দেখা যায়; আর ঝড়—আকাশভরা কালো মেঘের কোল হইতে ঝড় নামিয়া আসে, সমুদ্রে তুফান উঠে, সে তুফানে সমুদ্র যেন জাহাজ লইয়া লুফিতে থাকে। জাহাজের ডেক ভাসাইয়া জল চলিয়া যায়, কত সময় সেই ঢেউয়ের সঙ্গে ভাসিয়া যায় কত জন। 'কালাপানি' আর 'মাডারিনে' (মেডিটেরিনিয়ান) নাকি ঢেউ খুব বেশী। পশুপতি স্তব্ধ হইয়া শুনিত। একদা ঐ খালাসীদের সঙ্গেই জাহাজের আপিসে নাম লেখাইয়া একটা জাহাজে করিয়া সে ভাসিয়া পড়িয়াছিল। তাহার পর কত বার সে কলিকাতায় ফিরিয়াছে, কতবার গিয়াছে; এক জাহাজ হইতে অন্য জাহাজে—এক মুলুক হইতে অন্য মুলুকে।

দীর্ঘ দশ বৎসর পর সহসা কি মনে হইয়াছে—কেমন করিয়া জানি না মনে পড়িয়াছে মাকে, গাঁকে, সে কলিকাতা হইতে গ্রামে আসিয়াছে।

সন্ধ্যায় জেলেপাড়ায় প্রকাণ্ড মদের মজলিস বসিল। পশুপতি কুড়ি টাকা দিয়াছে। মদ নহিলে জেলেদের মজলিস হয় না, বিনা মদে বিচার হয় না, বিনা মদে প্রায়শ্চিত্ত হয় না। অপরাধ যাহাই হউক মদ্যদণ্ডই একমাত্র শাস্তি। আবালবৃদ্ধবনিতা ধর্মরাজতলায় জমিয়াছিল। প্রকাণ্ড জালায় মদ ও একটা মাটির প্রকাণ্ড পাত্রে প্রচুর মাংসের ব্যবস্থা হইয়াছে। সেই মদ ও মাংসের সহিত মজলিস চলিতেছিল।

একটা বড় বাঁশের ঝুড়ি উপুড় করিয়া সেইটার উপর বসিয়াছে পশু, তাহার পরনে সেই পোষাক। সে নিজে এক বোতল পাকিমদ আনিয়া প্রায় অর্ধেকটা ইহারই মধ্যে খাইয়া ফেলিয়াছে। মজলিসে চলিতেছে হুঁকা—সে টানিতেছে সিগারেট। দুই পয়সা দামের সিগারেটের বাক্স অনেকগুলিই সে সঙ্গে আনিয়াছে।

এক ছোকরা উঠিয়া জোড়হাত করিয়া বলিল—জ্ঞাত মশাইরা গো!

সমস্বরে দশ-বারো জনে বলিল—চুপ-চুপ-চুপ! তাহারা মজলিসের গোলমাল থামাইতেছিল।

—নিবেদন পাই।

—বল। বল।

—আজ্ঞে, পশু আমাদের খুব বাহাদুর।

—নিচ্চয়! একশো বার।

—কিন্তুক বেলাত যেয়েছিল।

—হাঁ-হাঁ ঠিক কথা!

—তা বেলাত গেলে আর জাত যায় না। এই আমাদের গেরামের ছোট হুজুরের ছেলে যেয়েছিল বেলাত, দেখেন তার জাত যায় নাই।

—ঠিক। ঠিক। বটে!

—তা পশুর কেনে জাত যাবে?

—নিচ্চয়।

—কুড়ি টাকা জরিমানা দিয়েছে--

এক জন বলিল—আরও দশ টাকা লাগবে। তা না দিলে—যাবে, উয়োর জাত যাবে। আমি বলছি যাবে।

পশু বলিল—দশ রুপেয়াই দিবে হামি।

সঙ্গে সঙ্গে বক্তা বলিল—একবার হরি হরি বল!

সমস্বরে সকলে হরিধ্বনি দিয়া উঠিল। তার পর আরম্ভ হইল গল্প। পশু গল্প আরম্ভ করিল—দেশ-দেশান্তরের লৌকিক-অলৌকিক। একবার একজন আরব দেশের সেখকে তাহারা সমুদ্র হইতে তুলিয়াছিল! বুঝলি—জাহাজের ছামুতে মানুষটা এই ভেসে উঠছে—ব্যস, ফিন্, ডুব যাচ্ছে। তিনবার-চারবার। তখুন সারং বললো--নামাও বোট। নৌকো! নৌকো! বোট হল

নৌকো। বাপরে, সিখানে কি হাঙ্গর—মাছের পোনার ঝাঁকের মতুন কিলবিল করছে হাঙ্গর। তারই অন্দরমে মানুষ। তাজ্জব রে বাবা!

মজলিসসুদ্ধ মেয়েপুরুষ স্তব্ধ হইয়া শুনিতেছিল। পশুপতি বলিয়া গেল বাঁকা বাঁকা উচ্চারণে—লোকটাকে যখন তুললাম রে ভাই তখুন বলব কি, তাজ্জব কি বাত—লোকটাকে ছোঁয় নাই হাঙ্গরে। জাহাজসুদ্ধ লোকের তাজ্জব লেগে গেল। বাপ রে! বাপ রে! মানুষটার জ্ঞান হল—সারং উকে পুছলো—কেয়া নাম, কাঁহাকে আদমী, দরিয়াওমে গিরলে ক্যায়সে। আদমীঠো বললো, আরবী সেখ উ। দুসরা একটা জাহাজমে বম্বই যাচ্ছিলো। নামাজ পড়তে পড়তে গিরে যায় সমুন্দরে। বললো কি জানিস? বললো—পড়লো তো ছুটে আইলো হাঙ্গর দশঠো, বিশঠো। তো, উ বললো—দুহাই আল্লাকে, দুহাই পয়গম্বরকে--মৎ কাটো হামকো। ব্যস, হাঙ্গর ছুতে পারলে না। তার পর তো ভাই, সারং তার করলো—উ লোকটার জাহাজে। তারসে ফিন্ খবর আইলো—বাত ঠিক। উ জাহাজ তখুন একশো মাইল চলা গিয়া।

এমনি কত গল্প।

তারপর আরম্ভ হয় গান—নাচ। পুরুষেরাই নাচে গায়, মেয়েরা দেখে।

পশুপতি নিজে নাচে। পা ছুড়িয়া ছুড়িয়া অদ্ভুত নাচ। বিচিত্র সুরে শিস্ দিয়া গান করে। মত্ত মজলিসে খুব বাহবা পড়িয়া গেল। পশুপতি নাচ শেষ করিয়া বলিল—সবসে ভাল নাচ জোড়া মিলকে নাচ। বড়া বড়া ঘর, শালা, আলো কতো--আসবাব কি, বাজনা কি—আঃ হায়-হায়! সুদূর দেশের আলোকোজ্জ্বল আনন্দোৎসবের স্মৃতি তাহার মনে জাগিয়া উঠিল, সে হায় হায় করিয়া সারা হইল। সহসা উৎসাহিত হইয়া সে প্রশ্ন করিল—দেখবি সি নাচ, দেখবি?

—হাঁ-হাঁ। নিচ্চয়।

পশুপতি বোতল হইতে আর এক চুমুক মদ গিলিয়া রুমালে মুখ মুছিয়া লইল—একটা সিগারেট ধরাইয়া বার কয়েক টানিয়া এক জনকে দিয়া সে করিয়া বসিল একটা কাণ্ড। খানিকটা ব্যবধান রাখিয়া বসিয়াছিল মেয়েদের দল। পশুপতি ব্যবধানের সেইখানি জায়গায় কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া মেয়েদের দেখিয়া নবীন জেলের যুবতী মেয়েটার হাত ধরিয়া টানিয়া বলিল—ই ঠিক পারবে; আয়—উঠে আয়!

মজলিসে একটা হৈ-হৈ পড়িয়া গেল।

পশুপতি মত্ত দৃষ্টিতেও নৃত্যসঙ্গিনী পছন্দ করিতে ভুল করে নাই। নবীনের মেয়েটি সুশ্রী তন্বী তরুণী।

মজলিসে ভীষণ হৈ-চৈ উঠিল; নবীন ক্রোধে ফুলিয়া গর্জন আরম্ভ করিয়া দিল।—মেরেই ফেলাব শালাকে।

নবীনের ছেলেটা অতিরিক্ত মদ খাইয়াছিল। সে এক স্থানে দাঁড়াইয়া টলিতে টলিতে চীৎকার করিতেছিল—না না না, উ হবে না। ছেড়ে দাও, আমাকে ছেড়ে দাও, উকে আমি ছাড়ব না—ছেড়ে দাও বলছি। অবশ্য তাহাকে কেহই ধরিয়া ছিল না, বারণও তাহাকে কেহ করে নাই।

নবীন বলিল—আমার মেয়েকে উকে সাঙা করতে হবে।

পশুপতি ইয়া বড় একটা ছুরি হাতে নির্ভয় কৌতুকে দাঁড়াইয়া হাসিতেছিল। সে বলিল—ব্যস্, মাৎ চিল্লাও, সাঙা করব হামি। ই বাত আছে—কসুর হইছে সাঙা করব হামি।

তন্বী তরুণী মেয়েটি শুধু সুশ্রী নয়, রূপবতী। জেলেদের মেয়েদের মধ্যে শ্রী আছে, কিন্তু নবীনের মেয়েটির মত মেয়ে দেখা যায় না। পর দিন সুস্থ দৃষ্টিতে মেয়েটিকে দেখিয়াও পশু আফশোষ করিল না। জেলের মেয়েরা মাছের পসরা লইয়া বিকিকিনি করিয়া বেড়ায়—তাহারা স্বভাবে একটু উচ্ছলা, কিন্তু এ মেয়েটি শান্ত নিরুচ্ছ্বসিত। কাচ-ঘেরা লণ্ঠনের ভিতরের শিখার মত স্থির ধীর।

পশুর মা কিন্তু আপত্তি তুলিল। উ মেয়ে সর্বনেশে মেয়ে বাবা। বেউলো রাঁড়ী, তিন বার বিয়ে হয়েছে—তিনটে মরদের মাথা উ খেয়েছে; উ হবে না বাবা।

মিথ্যা নয়, এই বয়সে তিন বার বিধবা হইয়াছে নবীনের মেয়ে। প্রথম বিবাহ হইয়াছিল তিন বৎসর বয়সে, বিধবা হইয়াছিল পাঁচ বৎসরে। দ্বিতীয় বার সাঙা হয় এক বৎসর পরে—ছয় বৎসরে, ছয় মাসের মধ্যে সে স্বামী মারা যায়। তার পর ছয় বৎসর তাহার আর বিবাহ হয় নাই। বৎসর দুয়েক আগে তাহার নিষ্কম্প দীপশিখায় আকৃষ্ট হইয়া আসিল এক পতঙ্গ—সতেরো-আঠারো বৎসরের এক কাঁচা জোয়ান। মাসখানেকের মধ্যে সেও পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল। নদীতে মাছ ধরিতে গিয়াছিল; জালখানা ফেলিয়া আর তুলিতে পারিল না। জালের ভিতর কি বজবজ করিয়া বুটবুটি কাটিয়া পাঁকের ভিতর বসিয়া গেল; প্রকাণ্ড মাছ বুঝিয়া সে ডুব মারিল। তারপর একবার সে ভাসিয়া

উঠিয়াছিল—প্রকাণ্ড একটা কুমীরের সঙ্গে আলিঙ্গন-বন্ধ অবস্থায়। পর মুহূর্তে যে ডুবিল আর উঠিল না।

এই কারণে মেয়েটার আসল নাম পর্যন্ত লোকে ভুলিয়া গিয়াছে। নাম তাহার রমাদাসী—লোকে এখন ডাকে তাহাকে 'বেউলো' অর্থাৎ বেহুলা বলিয়া। মেয়েটি অস্বাভাবিক শান্ত—কিন্তু কঠিন; তাহার বড় চোখ দুইটির স্থির দৃষ্টি মেলিয়া সে যখন চায়, তখন মনে হয় সে যেন তিরস্কার করিতেছে। পশুপতির বড় ভাল লাগিল।

পরদিন সকালে উঠিয়া সে নবীনের বাড়ী গেল। নবীন, নবীনের ছেলে মাছ ধরিতে গিয়াছে—নবীনের স্ত্রী, পুত্রবধূ গিয়াছে ভোররাত্রের চুরি-করিয়া ধরা মাছ বেচিতে, বাড়ীতে ছিল কেবল রমা। সে স্থির শান্ত দৃষ্টিতে পশুপতির দিকে চাহিল—ভাবী বধূত্ব স্মরণ করিয়াও সে একবার হাসিল না, চোখ নত করিল না।

পশুপতি বলিল—রাগ করেছিস?

শান্তভাবে মেয়েটি ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—না।

—গোস্ত রাঁধতে জানিস? মান্‌সো?

ঘাড় নাড়িয়া মেয়েটি জানাইল—হ্যাঁ।

—তু মদ খাস? মদ?

এবার মেয়েটি সেই দৃষ্টিতে পশুপতির দিকে চাহিল—ভবঘুরে উচ্ছৃঙ্খল পশুপতিকেও সে দৃষ্টির সম্মুখে মাথা নত করিতে হইল। কিন্তু পশুপতি ইহাতেই বেশী মুগ্ধ হইয়া গেল। শান্ত স্নিগ্ধ মেয়েটি, ছোট একখানি ঘর, ছেলে-মেয়ে—পশুপতি কল্পনা করিল অনেক। পুলকিত প্রবল আকাঙ্ক্ষায় সে বিবাহের দৃঢ় সংকল্প লইয়া ফিরিয়া আসিল।

মা আপত্তি করিল, কিন্তু সে কানেই তুলিল না। শিস্ দিতে দিতে বাহির হইয়া গেল—একখানা ঘর তাহাকে কিনিতে হইবে। মাকে সুদ্ধ লইয়া সংসার করা তাহার পোষাইবে না। সে পাড়ার প্রান্তে খানিকটা জমি জমিদারের গোমস্তার কাছে বন্দোবস্ত লইয়া সেই দিনই ঘর আরম্ভ করিয়া দিল।

ঘর তৈয়ারী হইলে সে নবীনকে বলিল—ঠিক করো দিন।

সাত দিন পর দিন ঠিক হইয়া গেল। পশু বলিল—অল্রাইট, হামি কলকাত্তা যাবে—চিজ-বিজ কিনতে।

পথে নির্জন একটা গলির ভিতর কে ডাকিল—শোন।

রমাদাসী! সে আজ মৃদু হাসিয়া ডাকিতেছিল—শোন!

রমার মুখে হাসি আজ নূতন দেখিল পশুপতি, সে দ্রুত গলির মধ্যে প্রবেশ করিয়া রমাকে বুকে জড়াইয়া ধরিল। রমা আতঙ্কভরে বলিয়া উঠিল—না-না-না।

সে কণ্ঠস্বরে এমন কিছু ছিল যাহাতে পশুও তাহাকে ছাড়িয়া দিল।

রমা বিবর্ণ মুখে বলিল—এই কবচটি তুমি পর। মা-চণ্ডীর কবচ—আমি এনেছি তোমার লেগে। একদিন উপোস করে থেকে কবচ এনেছি। সেই কি অসুখ করেছিল একদিন—অসুখ মিছে কথা, উপোস করেছিলাম।

সে নিজেই পরাইয়া দিল—লাল সুতায় বাঁধা তামার একটি কবচ। হাসিয়া রমা বলিল—আমার কপাল যাই হোক, মা তো মিথ্যে লয়, রণে বনে অরণ্যে মা তোমাকে রক্ষে করবেন!

ইহার পর পশুপতির সন্ধানই নাই। কলিকাতায় বাজার করিতে গিয়া সে আর ফিরিল না।

উপরের কাহিনীটুকু আমার গ্রামের ঘটনা, আমি সংগ্রহ করিয়াছিলাম—জেলেপাড়ার একটি বিচলিত বিহ্বল মুহূর্তে। পশুপতির নিরুদ্দেশের কিছু দিন পরেই পশুপতির ওই নূতন ঘরে রমা গলায় দড়ি দিয়া মরিয়াছিল। দারোগা সুরতহাল রিপোর্ট লিখিতেছিল. আমি পাশে দাঁড়াইয়া শুনিতেছিলাম। দারোগা কি বুঝিয়াছিল, কি লিখিয়াছিল জানি না, আমি যাহা সংগ্রহ করিয়াছিলাম তাহা এই। যাহা বুঝিয়াছিলাম তাহাও মিথ্যা নয়—সে কথা শুনিলাম আরও মাস কয়েক পর, পশুপতির কাছে।

রেডিয়ো অপিসে একটা ছোট নাটিকা দিবার কথা ছিল। সেখানে গিয়া শুনিলাম—এক অভিনব প্রোগ্রামের ব্যবস্থা। জার্মান সাবমেরিনের গুপ্ত আক্রমণে একখানা ধ্বংসপ্রাপ্ত জাহাজের একমাত্র উদ্ধারপ্রাপ্ত ভারতীয় নাবিক আপনার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিবে।

রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা চমৎকার লাগিল।

বন্ধুবর হীরেন থিয়েটারী ঢঙে প্রশ্ন করিল—শুনলে?

দাদা কমলবিলাস গম্ভীর মুখে বলিলেন—শুক্রাচার্য করে দিলে তোমাদের।

—মানে?

—কা-কা-কানা করে দিলে তোমাদের লেখাকে। মধ্যে মধ্যে কমলদাদার কথা ঠেকিয়া যায়।

স্বীকার করিয়া নীচে নামিয়া আসিয়া দেখিলাম—সেলারের পোষাক পরিয়া দাঁড়াইয়া আছে পশুপতি। সেও আমাকে চিনিল—বাবু!

—হ্যাঁ। তোর গল্প শুনলাম। খুব বেঁচেছিস।

সে হাসিল।

রমার সংবাদ দিতে ইচ্ছা হইল না। কিন্তু প্রশ্ন করিলাম—তুই চলে গেলি কেন?

—আজ্ঞে খিদিরপুরে গেলাম বেড়াতে। জাহাজ দেখলাম—বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হল, আমোদ-টামোদ করলাম রেতে; কি হয়ে গেল, মনে হল কি হবে বিয়ে করে? দ্যাশ বিদ্যাশে কত—সে লজ্জায় থামিয়া গেল।

আমি বুঝিলাম—দেশ-বিদেশের বিচিত্রতার মধ্যে বিচিত্র বিলাসিনী-দের আকর্ষণ সেদিন তাহাকে সব ভুলাইয়া দিয়াছিল। আমি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলাম। ছোট একটি নীড়, রমার মধ্যেকার নারীত্বের শান্ত বিকাশ তাহাকে ভুলাইতে পারিবার তো কথা নয়, সুতরাং তাহার দোষ কি? প্রেম তো তাহার মধ্যে সম্ভব নয়। তাহার জন্য প্রয়োজন ছিল অপরিমেয় আনন্দের—

চিন্তায় বাধা দিয়া পশুপতি বলিল—কিন্তু ভুল হইছিল, মতিচ্ছন্ন হইছিল আমার বাবু। আজ মরে গেলে কি হত? রমাদাসীর কবচই আমাকে বাঁচায়া বাবু। নইলে কেউ বাঁচল না—আমি বাঁচলাম! আর—

পশুপতি বলিল—প্রচণ্ড বিস্ফোরণে জাহাজ ফাটিয়া গেল, বিকট শব্দ, দুরন্ত আঘাত, ধোঁয়াচ্ছন্ন অন্ধকার! কোথা দিয়া কি ঘটিয়া গেল সে জানে না। জ্ঞান ছিল না তাহার। যখন জ্ঞান হইল তখন সে দেখিল কে যেন তাহাকে একখানা ভাসমান কাঠের উপর শোয়াইয়া রাখিয়াছে। তাহার মাথা ছিল হাতের উপর—রমার কবচটাই তাহার কপালে ঠেকিয়া ছিল।

কবচটা বাহির করিয়া সে কপালে ঠেকাইল। বলিল—ই কবচ যত দিন রহেগা তত দিন হামারা কিছু হবে না বাবু।

আর থাকিতে পারিলাম না, বলিলাম রমার কথা।

স্তম্ভিত হইয়া গেল পশুপতি। তাহার সে-মূর্তি আমি বর্ণনা করিতে পারিব না।

কয়েক মুহূর্ত পর সিগারেট ধরাইয়া হাসিয়া সে বলিল—চললাম। সেলাম বাবু!

তাহাকে ডাকিলাম—শোন-শোন!

—আজ্ঞে!

—কি করবি এখন?

পিছনে গঙ্গায় স্টীমারের তীব্র সার্চলাইট আকাশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। চাকার জলকাটার আলোড়ন-শব্দ শোনা যাইতেছে, মধ্যে মধ্যে রকমারি আওয়াজের সিটি বাজিতেছে। একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়াই সঙ্গে সঙ্গে পশুপতি হাসিল, তার পর বলিল—লতুন জাহাজমে চলে যায়েগা। আজকাল খালাসীর ভারী আদর। কেউ যেতে চাইছে না। হাম যায়েগা।

সে চলিয়া গেল। যাইবার সময় পথের উপরেই কি একটা ফেলিয়া দিয়া গেল; ছোট শক্ত একটা কিছু। অগ্রসর হইতেই আমার নজরে পড়িল—বিবর্ণ সুতায় বাঁধা সেটা একটা তামার কবচ!

শে ষ ক থা

লাট ভরতপুর, পরগনে পূর্বচক, সম্পত্তিটা খুব বড় সম্পত্তি। সবাই বলে; সোনার সম্পত্তি। গাছের পাতা কুলোর মত, ডাল ঢেঁকির মত; ঘষা হরিচন্দনের মত মোলাম মাটি—গায়ে মাখলে গা জুড়িয়ে যায়, ফসলের বীজ পড়বার অপেক্ষা —দেখতে দেখতে ফসলে ভ'রে যায় মাঠ; তা ছাড়া ভরতপুরে না পাওয়া যায় কি? সোনার সম্পত্তি কথাটাও কথার কথা নয়। আগে লোকে নদীর বালি থেকে সোনার দানা বের করত। মাটির তলায় সত্যিই সোনা আছে। প্রজারা সব বেকুবের দল। চাষ ক'রে খায়, মার খেয়ে হাসে, বলে, তুমি কি আমার পর? তারপর সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করে, হাতে লাগে নাই তো মারতে গিয়ে! পরনে ঠেঁটি কাপড়, কপালে তিলক-ফোঁটা, গলায় তুলসীমালার কণ্ঠী, কালো রঙ। এ থেকেই বেকুবত্ব প্রমাণ হয়ে যায়। চাষ ক'রে খায়—চাষীর দল সব। জমিদার-পক্ষ বলে, চাষা। আগে খেত-দেত, চাষ করত, তামাক টানত, পুজো-অর্চনা করত, ঘুমুত। এখন আর সে কাল নাই, কলি বোধ হয় চার পো পুরো হয়ে উঠছে, তারই ফলে আজকাল আধপেটা খায়, রোগে হাঁপায়, কোন রকমে চাষ করে, ভগবানকে কেউ ডাকে, কেউ ডাকে না, অর্থাৎ কেউ কাঁদে, কেউ ব'সে ব'সে দাঁত খিঁচোয়।

পদ্মাপারের সাউ মশায়েরা এখন ভরতপুরের জমিদার। আগে ছিল মঙ্গলকোটের মিঞাদের জমিদারি। সাউ মশায়েরা তখন এখানে ব্যবসা করতে এসেছিলেন। মিঞাদের ঘরোয়া ঝগড়া বাধলে, এক পক্ষ সাউদের কাছে কিছু টাকা ধার করে নিয়েছিলেন। ধার সহস্র ধারায় যখন বাড়ে, তখন কি আর রক্ষা থাকে? তার উপর এই যে চাষী প্রজাদের মাতব্বর, তারাও সেকালে মামলায় প্রায় সবাই সাক্ষী দিয়েছিল—এই সাউদের তরফে।

যাক ওসব কথা। তবে এখন ওরা নিজের গালে—; ও কথাও যাক, কাসুন্দি ঘেঁটে লাভ নাই। বিস্তারিত বলতে গেলে পুঁথি বেড়ে যাবে। একেবারে হালের কথাই ভাল। পদ্মাপারের সাউ মশায়েরা এখন জমিদার। গাঁয়ে গাঁয়ে কাছারি, কাছারিতে কাছারিতে নায়েব; এ ছাড়া পদ্মাপার নিজের দেশ থেকে

আমদানি করা পাইকের দল এনে পাকাপোক্ত বন্দোবস্ত ক'রে ফেলেছেন সাউ মহাশয়েরা। এছাড়াও সাউ মশায়দের জ্ঞাতিগোষ্ঠীর অনেকে এসে বহু দোকান-দানি খুলে ফলাও ব্যবসা ফেঁদে বসেছেন। অনেক কলকারখানাও বসিয়েছেন, এখানকার অনেক লোক আজকাল কলেও খাটে। এই সব লোকরাও কেউ বা দাঁত খিঁচোয়—কেউ বা কাঁদে। তা কাঁদুক আর দাঁত খিঁচোক—দিন চলছিল ভালয় মন্দতে। জমিদারের কর্মচারীদের সঙ্গে গাছের মালিকানি নিয়ে ঝগড়া ক'রে, জমির স্বত্ব নিয়ে আপত্তি জানিয়ে, পাইকদের খোরাকী রোজ প্রভৃতি নিয়ে 'না না' ক'রে. সাউ দোকানদারদের সঙ্গে নুনের দর, তেলের দর, কাপড়ের দর নিয়ে বাক্‌চাতুরি ক'রে, কলকারখানার মজুরি নিয়ে বিসম্বাদ ক'রে নানা টক-ঝকের মধ্যে দিয়ে দিন চলছিল এক রকম ক'রে। ঘানির চারপাশে চোখ-ঢাকা বলদের শিঙ নেড়ে পাক খাওয়ার মত সবই চলছিল। তেলও বের হচ্ছিল—সে নিচ্ছিল কলু, আর খোলও হচ্ছিল—তা খাচ্ছিল বলদে।

হঠাৎ ভূমিকম্পে ন'ড়ে ওঠার মত সব ন'ড়ে উঠল। ভয়ানক কাণ্ড বেধে গেল। জমিদার মশায়দের সঙ্গে হলদীবাড়ির সাঁই জমিদারদের সীমানা নিয়ে ফৌজদারী বেধে গেল। বেমক্কা ফৌজদারি, বলা নাই কওয়া নাই, নোটিশ নাই পত্র নাই, সাঁইবাবুদের পাইকদের দল হঠাৎ বন-বাদাড় ভেঙে লাঠি সোঁটা সড়কি বল্লম নিয়ে ভরতপুরের পাশের লাট—লাট ধর্মপুরে চড়াও হ'ল। কাছারিতে ঢুকে—মারধর খুনজখম ক'রে দখল ক'রে নিলে সব। সাউবাবুদের দল এসে ভরতপুরের কাছারিতে ঢুকল। শুধু তাই নয়, সাঁইদের লোকজনদের ব্যাপার দেখে ভরতপুর সম্বন্ধেও চিন্তার কারণ ঘ'টে গেল। লাঠি-সোঁটায় তেল মাখিয়ে তলোয়ারে শান দিয়ে এমন তোড়জোড় আরম্ভ করলে যে, ভরতপুরে ঢুকেও যে তারা শেষ পর্যন্ত একটা হাঙ্গামা বাধাতে পারে, এতে আর কারও সন্দেহ রইল না। চারিদিকে হৈ-চৈ প'ড়ে গেল। ভরতপুরের কাছারিতে কাছারিতে সাজ সাজ রব উঠল।

চাষীর দল সব চমকে উঠল। দুই লড়ায়ে ষাঁড়ের পায়ের তলায় উলুঘাসের মত দশা তাদের। তারা সব চঞ্চল হয়ে উঠল।

বুড়া লালমোহন পাণ্ডে ভরতপুরের চাষীদের চাঁই। খাটো ক'রে চুল ছাঁটা. দাঁতগুলি সব প'ড়ে গেছে, আস্তে আস্তে কথা বলে, মিষ্টি মিষ্টি হাসে, বুড়া ভাবনায় মাথায় হাত বুলাতে লাগল।

দলে দলে ভরতপুর লাটের লোকেরা এসে বুড়াকে ঘিরে বসল।

সসম্মানে হাত জোড় ক'রে বুড়া ফোকলা দাঁতে, মায়ের কোলের শিশুরা যে হাসি হাসে আপনার বাপ খুড়া ভাই বোনদের দেখে, সেই হাসি হেসে বললে, আসুন পঞ্চ।

সকলে ব'সে গেল। তারপর বললে শুধু একটি কথা, কর্তা! ওই একটি কথাতেই সব ওদেব বলা হয়ে গেল। কর্তাও সব বুঝে নিলে।

বুড়ার সুখেও হাসি, দুঃখেও হাসি, ভাবনাতেও হাসি, বুড়া ভাবতে ভাবতে হাসতে লাগল।

গোঁরপুরের একজনা বললে, সাউবাবুরা আমাদের জমির মালিকানি মানছে নাই। আমরা কেনে ছাড়ব সুবিধে? সাউয়েরাও জমিদার, সাঁইয়েরাও জমিদার—তা সাঁইয়েরা যদি আমাদের জমির মালিকানি মানে, তবে উয়াদের হয়েই সাক্ষী দাও না কত্তা।

বুড়া ঘাড় নাড়তে লাগল, উঁ-হু। পাপ হবে।

একজনা বললে, তবে আমরাও জুটে পুটে লাগাই ফৌজদারি, এস।

বুড়া ঘাড় নাড়লে, উঁ-হু।

কেনে, ভয় লাগছে নাকি?—ছোকরা রুখে উঠল।

বুড়া হাসলে। সে হাসির সামনে ছোকরা এতটুকু হয়ে গেল। বুড়া হেসে বললে, ভয় নয় রে ভাই, পাপ হবে।

তবে? তবে কি করবে বল? কিসে পাপ হয় না তাই বল?

হুঁ। দাঁড়া রে ভাই। মনকে শুধাই। মন শুধাক ভগবানকে। তবে তো!

রতনলাল বললে, যা হয়, চটপট ঠিক ক'রে ফেল কত্তা। তুমি যা বলবে, তাই করব আমি।

বুড়া হাসলে; রতনের উপর তার অনেক ভরসা। ভারি ভাল ছোকরা। আর তেমনই কি সাহস!

ঠুকঠুক ক'রে বুড়া কাছারিতে এসে উঠল, রাম রাম গো নায়েব মশয়!

কে, লালমোহন? এস এস।

হ্যাঁ, এলম একবার।

এলম-টেলম নয়। লেগে যাও, সব কোমর বেঁধে লেগে যাও একবার।

সাঁই-বেটাদের একবার মেরে বেচপাট ক'রে দিতে হবে, একধার থেকে কেটে ফেলতে হবে।

বুড়া হাসলে। কি যে বলেন লায়েব মশয়!

কেন?

ওই! কেটে ফেলালে রক্ত পড়বে যে গো! ম'রে যাবে যে লোকগুলান! পাপ হবে যে! বুড়ার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল।

নায়েবের পা থেকে মাথা পর্যন্ত জ্ব'লে গেল বুড়ার এই ভণ্ডামি দেখে। তবু ও লোকটা খাতিরের লোক, তাই রাগ ক'রেও ভদ্রভাবে বললে, হুঁ, বুঝেছি। ওদের রক্ত দেখে তোমাদের চোখে জল আসছে! বুঝতে পারছি সব! ব'লে খসখস ক'রে কয়েক ছত্র লিখে আবার বললে, আর আমাদের পাইকদের যে খুন-জখম করেছে, রক্তে রক্তগঙ্গা বইয়ে দিয়েছে, তার বেলায়—

বুড়ার ঠোঁট থরথর ক'রে কাঁপতে লাগল, চোখের জল দ্বিগুণ হয়ে গেল, হে ভগবান! সে কথা শুনে ইস্তক কাঁদছি লায়েববাবু, আঃ—হায় হায় হায়! কত লাগল তাদের, ভাবেন দেখি? চোটগুলান, মনে হয়, আমারই বুকে পড়ল গো।

নায়েব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে রইল। লোকটা ভণ্ড পাষণ্ড, না সত্যই সাধু? ভেড়ার শিঙে ধাক্কা লাগলে নাকি হীরের ধারও ভেঙে যায়, ঠিক তেমনই নায়েবের ইস্পাতের ভ্রমরের পাক দেওয়া শক্ত ধারালো বুদ্ধিও বুড়ার ভোঁতা বুদ্ধির ঘরের দরজায় ঠিক গর্ত করতে পারছে না। অনেকক্ষণ তার মুখের দিকে চেয়ে থেকে নায়েব বললে, তা হ'লে? তা হ'লে কি করতে হবে শুনি?

তাই তো বুলছি গো আপনকাকে। চোখের জলের মধ্যেই আবার বুড়ার হাসি ফুটে উঠল।

কি বলছ?

বুলছি, আমাদের জমির মালিকানিটি মেনে লাও তুমরা, সব পাইক বরকন্দাজ নিয়ে তফাত হয়ে থাক. সেখ সাঁইদের আমরা রুখে দি।

রুখে দেবে? ফৌজদারির কি বোঝ তোমরা? চাষ কর, খাও। লাঠি ধরতে জান? সড়কি চালাতে জান?

বুড়া হাসলে।

হাসছ যে?

আপনকার কথা শুনে হাসছি গো। আমরা লাঠি সড়কি ধরবই নাই যে।

তা হ'লে কি ক'রে রুখবে?

উয়ারা আসবে, আমরা পিঠ পেতে দাঁড়াব, লাও, মার লাঠি। বুক পেতে দিব, চালাও সড়কি। আমাদের রক্ত পড়বে, মাটি লাল হয়ে যাবে, আমরা মরব। তখন উয়াদের আক্কেল হবে, বুকগুলান টনটন করবে, চোখে জল আসবে। ভগবান জ্ঞান দিবে। উয়ারা লাজ মেনে ফিরে যাবে।

নায়েব হা-হা ক'রে হেসে উঠল, এই তোমার বুদ্ধি!

বুড়া কিন্তু আশ্চর্য। সে এতটুকু অপ্রতিভ হ'ল না। তারও দন্তহীন মুখে সেই আশ্চর্য ছেলেমানুষী হাসি ফুটে উঠল। হয় গো, হয়। আমার মন শুধালে যে ভগবানকে! ভগবান যে বুললে গো! আপনকাদের মন যে ভগবানকে কিছু শুধায় না গো! না হলি বুঝতি পারতে আমার কথা।

যেমন দেবা, তেমনই দেবী; বুড়ার বুড়ীটি ঠিক ক্ষ্যাপার ক্ষেপীর মত।

সমস্ত শুনে সে ভয়ানক চিন্তিত হয়ে পড়ল। চিন্তাটা তার বুড়ার মতই সাউ নায়েবের জন্য চিন্তা। এ তো সহজ কথা, সোজা কথা। উয়ারা কেনে বুঝতে লারছে? হ্যাঁ গো বুড়া?

সেই তো গো বুড়ী।

তবে কি হবে? কি করবে তুমি?

আমি? অনেক ভেবে বুড়া হাসলে, হাঁ, হয়েছে। ঠিক হয়েছে।

কি?

আমি মরব।

মরবে?

হ্যাঁ, আমি মরব। আমি যদি মরি. তবে তখন উয়ারা মনে দুখ পাবে। ভগবান জ্ঞান দিবে। তখন আমাদের কথা ঠিক উয়াদের সমঝে আসবে।

বুড়ী কিছুক্ষণ ভাবলে। ভেবে সে খুশি হয়ে উঠল। হেসে বার বার ঘাড় নেড়ে বললে, হাঁ, ঠিক বুলেছ তুমি।

বুলি নাই? হেসে বুড়া বুড়ীর দিকে তাকালে।

হাঁ। তাই কর তুমি। মর। ম'রে উয়াদিগে বুঝায়ে দাও।

বাইরে থেকে ডাকলে রতনলাল, কত্তা!

বেটা! আয় রে বেটা, আয়। লালমোহনের মুখ হাসিতে ভ'রে উঠল।

রতনলাল এসে দাঁড়াল হাসিমুখে। বললে, সব এসে দাঁড়িয়ে আছে কত্তা। কি হ'ল, কি করব তাই বল। রতন যেন আগুনের শিখার মত জ্বলছে।

বুড়া বাইরে এসে জোড়হাত ক'রে বললে, নমো পঞ্চ।

তার আগেই কিন্তু একটা গন্ডগোল ঘ'টে গেল। সাউবাবুদের পাইক বরকন্দাজ এসে সব ঘিরে দাঁড়াল। সাউবাবুদের সদর-নায়েব চারু শীল, জাঁদরেল নায়েব। সে কারও তোয়াক্কা রাখে না, সে এখানকার নায়েবকে হুকুম পাঠিয়েছে, পাগলাটাকে পাকড়ে' আটকে' রাখ। শুধু পাগলা নয়, রতনলাল-টতনলাল চেলাচামুণ্ডা তামাম আদমি আটক কর—বিলকুল।

বুড়া হেসে বললে, চলো। রতনলাল প্রভৃতি চেলাদের দিকেও চেয়ে বললে, চলো বেটালোক।

বুড়ী একগাল হেসে এগিয়ে এসে বললে, আমি?

সাউবাবুদের লোক বললে, হাঁ হাঁ, সে হুকুমও আছে।

বুড়ী বললে, দাঁড়া বাবা, জেরাসে সবুর করো বেটা; বুড়াব কৌপীন, আমার কাপড় আর সেই লোটাটা নিয়ে নিই। ওই লোটাটাতে জল না খেলে আমার তিয়াস মেটে না।

বুড়া হেসে ঘাড় নাড়ে, হাজার হ'লেও মেয়েলোক কিনা! লোটার মায়া ছাড়তে পারে না।

সাউবাবুরা বুড়াকে আটক করলেও খুব যত্ন ক'রেই রাখলে। সেদিক দিয়ে তারা এতটুকু কসুর রাখলে না। বুড়া কিন্তু সেই বুড়া, আটকের মধ্যে থেকেও হাসে; ভগবানকে ডাকে, আর ভাবে। মনে মনে বলে, ভগবান, আমার মনকে বুলে দাও, কি করব! মরব? আমি মবলে উয়ারা দুখ পাবে? তুমি উয়াদিকে জ্ঞান দিবে?

বুড়ী আটকেব মধ্যেই ঘুরঘুর ক'রে ঘুরে বেড়ায়, বুড়ার খাবারটি করে, বিছানা মানে কম্বলটি ঝাড়ে, লোটাটি ঝকঝকে ক'রে রাখে। তার যেন এ অবস্থাটা খানিকটা ভালই লাগে। বুড়াকে অনেকটা কাছে পেয়েছে। বাইরে তো বুড়ার হাজাব কাজ, এক লহমার ফুরসৎ হয় না দুটা কথা বলবার, ঘরোয়া কথা বলবার। সব কথাই তার ভরতপুরের কথা, নয়তো মানুষের কথা। আজ এখানে কাল সেখানে, এ আসছে সে আসছে, লোকজনেই বুড়াকে ঘিরে

রেখে দেয়। এখানে বুড়ার অনেকটা কাছে আসতে পেয়েছে সে। কিন্তু কয়েক দিন পরেই বুড়ীর ভুল ভেঙে গেল। বুড়া সেই বুড়া। লোকের ভিড় নাই, কিন্তু বুড়ার মাথায় ভাবনার ভিড় এতটুকু কমে নাই। লোকে বাইরে বলত, বুড়াটি পাথর। বুড়ীর মনে হয়, কথাটি মিথ্যে নয়।

সে বলে, বুড়া!

উঁ? বুড়া তার দিকে তাকায়, বুড়ীর মনে হয়, বুড়া তার দিকে চেয়ে নাই, চেয়ে আছে ওই—ওই কোন্ দিক্‌দিগন্তরে, অনেক দূরে, সেই পাহাড়ের মাথায় আছে যে ঠাকুরের মন্দির, সেই মন্দিরের চূড়ার দিকে।

কি ভাবছ?

ভাবছি? বুড়া হাসে।

হেসো না বুড়া, এ হাসিটি তোমার ভাল লাগছে নাই আমার।

হুঁ। ছোট্ট একটি হুঁ ব'লে বুড়া চুপ ক'রে যায়।

ভয়ে বিস্ময়ে অবাক হয়ে যায় বুড়ী; সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে বলে, ভগবান, বুড়াকে বাঁচিয়ে রাখ! না হ'লে এত ভাবনা ভাববে কে?

হঠাৎ একদিন বুড়া বললে, আমি মরব।

বুড়ীর বুকটা যেন ফেটে যাবার উপক্রম হ'ল, কিন্তু সে কথা তো মুখ ফুটে বলবার উপায় নাই। বুড়া তা হ'লে এমন হাসি হেসে শুধু বলবে, ছি! তাতেই বুড়ী মরমে ম'রে যাবে। সে শুধু বললে, কেনে বুড়া? মরবে কেনে?

মরব। সাহাবাবুরা বুলছে, আমি বাইরের লোকগুলিকে বুলে এসেছিলাম ফৌজদারী দাঙ্গা করতে! বাইরের লোকগুলির সঙ্গে বাবুদের পাইকের মারপিট হয়ে গিয়েছে। আমাদের লোকগুলি উয়াদিকে মেরেছে, অনেক ক্ষেতি করেছে। বাবুরা বুলেছে, ই সব আমার শিক্ষা।

রতনলাল বললে, তার লেগে তো কত্তা, বাবুদের পাইকরা লোকেদেরও খুব মার দিয়েছে।

বুড়া ঘাড় নেড়ে হাসলে। বললে, শুধু তাই লয় রতন। আমাদের লোকেরা মারলে যখন, তখন লোকেদের পাপ হ'ল। আমি মরি, ম'রে ভগবানকে বুলব, ভগবান, পাপটি ক্ষমা কর, শুধু আমাদের পাপ লয়, ওই পাইকদের পাপও ক্ষমা কর। আর—

আর কি কত্তা?

বুড়া হাসলে: তবে তো উয়ারা বুঝবে, আমি পাপী লই।

বুড়া মরণ-পণ ক'রে বসে। খায় না দায় না, চুপ ক'রে প'ড়ে থাকে।

বুড়ীর কথাবার্তা সব ফুরিয়ে গিয়েছে যেন, সে চুপ ক'রে ব'সে চেয়ে থাকে। হায়, বুড়া তার হারিয়ে গেল। তার দিকে একবার ফিরে চাইবারও ফুরসৎ নাই! কান্না লজ্জা বুড়ীর কাঁদবারও উপায় নাই।

আটকখানার বাইরে হৈ-চৈ উঠে, ভগবান, আমাদের কর্তাকে বাঁচিয়ে দাও।

রতনলাল আর সব চেলারা যেন উদাস হয়ে গিয়েছে।

বুড়ী আর থাকতে পারে না। সে বুড়াকে কিছু বলতে সাহস করে না। সে ভগবানকে মনে মনে ডাকে. বলে বুড়াকে বাঁচাও দেবতা। এতগুলি লোকের মুখের দিকে চাও। আমার মুখের দিকে চাও। বুড়ীর মনে হয় বুড়ার চেয়ে ভগবানেরও মন নরম।

বুড়ীর মনে হয়, ভগবান যেন হাসছেন।

বুড়া সত্যিই মরে না। মরণের সব লক্ষণই হয়েছিল, সাউবাবুরা বড় বদ্যিও পাঠিয়েছিল; তারাও বলেছিল, আমাদের অসাধ্য। না খেলে মানুষ বাঁচে না, বাঁচতে পারে না। তবু বুড়া বাঁচে। আশ্চর্য বুড়া, সব সময়ের মধ্যে একটিবারও তার মুখের সেই খোকার ঠোঁটের হাসির মত হাসি মিলিয়ে যায় নাই! ধীরে ধীরে সব মরণ-লক্ষণ মিলিয়ে গেল, চোখের ঘোলা রঙ ঘুচে গিয়ে সাদা পদ্মের পাপড়ির আভা ফুটে উঠল, মুখের রঙে ফুটে উঠল মায়ের কোলের ছেলের মুখের মত ঝকমকে রেশ। বুড়া বললে, আমি বাঁচলম। ভগবান আমার মনকে বুললে, তোর পাপ নাই।

বুড়ীর মুখে হাসি ফুটে উঠল।

সে বললে, বুড়া, আমি এইবার মরব।

কেনে?

আমার শরীর খারাপ লাগছে। আব—

আর কি?

বুড়ী কিন্তু কিছুতেই সে কথা বললে না। শুধু হাসলে।

বুড়ী সত্যই মারা গেল। জ্বর হ'ল সামান্য। সেই জ্বরেই মারা গেল। মরবার সময় একদৃষ্টে সে চেয়ে ছিল বুড়ার মুখের দিকে।

পাথরের বুড়া। লোকে মিথ্যে বলে না।

হঠাৎ বুড়ীর মনে হ'ল, লোকের কথা মিথ্যে; সত্যি নয় সত্যি নয়। বুড়ার চোখে জল। হাঁ হাঁ, বুড়ার চোখে জল।

সে বললে, বুড়া! .

চোখে জল টলমল করছিল. তবুও বুড়ার মুখে হাসি ফুটে উঠল, বুড়া বললে, বল বুড়ী. কি বলছ, বল?

মরণ ভারি সুন্দর গো বুড়া, মরণ ভারি সুন্দর।

বুড়া হাসতে লাগল, চোখের জল টপটপ ক'রে ঝ'রে পড়ল, ঝ'রে পড়ল বুড়ীর কপালের উপর। বুড়া মুছিয়ে দিতে গেল সে জল। বুড়ী বললে, না, থাক।

